বনবিবি উপাখ্যান

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮

ডিসেম্বর ১৯৭৮

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

৮এ, টেমার লেন

কলকাতা ৯

মুদ্রাকর

শ্রীদিলীপকুমার চৌধুরী

সরস্বতী প্রেস

১২ পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা ৯

প্রচ্ছদশিল্পী

সুব্রত চৌধুরী

বিমল কর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

নদীর সঙ্গে দেখা

ঘাতক

সন্ন্যাসী বাওয়ালী

অসতী

হিমশীতল

কলকাতা কলকাতা

নিশীথফেরি

একালের বাংলা গল্প

বজরা

পিণ্ডার হিমালয়ে

তুষার স্বর্গ মিলাম

বহুপতির দেশে (যন্ত্রস্থ)

দ্বীপগুলি যেন শ্রীচরণের ঘুঙুর, আর নদীগুলো সেই ঘুঙুর বাঁধার সুতো। একটু নড়ে উঠলেই শব্দ ওঠে ঝুমঝুম ঝুমঝুম। সুতোর সুতোয় জট পাকিয়ে যাওয়ার মতো নদীতে নদীতে জট। যেন গোলকধাঁধা। কোথায় তার শুরু আর কোথায় তার শেষ, কে জানে! একটা ধরে এগিয়ে যাও, বেশ যাচ্ছ, যেতে যেতে যেতে…এল এক তিন মোহনা, কী চার মোহনা। দিশেহারা না হয়ে কী উপায় থাকে তখন। কোন দিকটা বাছবে, তিন দিক ছেড়ে দক্ষিণ যাবে? যাও…পাবে সেই প্রকাণ্ড নীল আকাশের নিচে আরো গভীর নীল একখানা সমুদ্র। নাম তার বঙ্গোপসাগর। উত্তরে যাবে? ধানভাঙা সিঁড়ির দেশ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার। আর পুবেই যাও কি পশ্চিমেই যাও, ছোট ছোট দ্বীপ, বুকে তার গহীন অরণ্য।

হ্যাঁ, ছোট ছোট দ্বীপ; কোনটা আঙুরের মতো গোল, কোনটা সিমের মতো বাঁকা, আবার কোনটা গোলও নয়, বাঁকাও নয়, কাঁকড়ার মতো চারপাশে দাঁড়া ছড়ানো। এমনিধারা আরো কত। ছোট, বড়, হাজার হাজার, অসংখ্য।

সত্যি সত্যি ঝুমঝুম করে শব্দ হয় দ্বীপগুলির মধ্যে। বাতাস যখন নিথর হয়ে জমে থাকে, শব্দ বন্ধ হয়। আবার যখন সুঁদরি, গরান, গেঁও, গর্জনের ডালে পাতায় মাখামাখি করে বাতাস…আহা কী মধুর! কী মধুর! শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যাবে, দেখতে দেখতে চোখ হাবে জুড়িয়ে। এমন রূপ বর্ণনা করবে সাধ্য কার।

তাই বলে চন্দনের মতো মোলাম মাটিতে পা দাও, দিলেই বুঝবে, বাস্তব বড় কঠিন হে। কাদায় পা চেপে চেপে হাঁটতে হবে তোমাকে। সাবধান ভাঙা শামুককুচিতে পা পড়ে না যেন। আর সামনে একবার তাকিয়ে দেখ, কী দুর্গম ঝোপঝাড়, শূলো আর শেকড়ের কয়েদখানা। সর্বাঙ্গ তোমার ছড়ে যাবে। হয়তো দেখবে, ওঁৎ পেতে আছে কোন বীভৎস সাপ-শ্বাপদ। নয়তো কোন অপরূপ মনোহর প্রকৃতি।

আর দেখ, হেঁতাল, গোল, বেত, বেনোর ঝোপে ঝোপে সারাক্ষণই অন্ধকার ঠাসা। যেন সূর্যকে ফাঁকি দিয়ে ওটুকু অন্ধকার ওরা লুকিয়ে রেখেছে। তুমি কি ভরদুপুরে এসেছ, তাই বল; এখন যা দেখছ, রাতে দেখবে ঠিক এর বিপরীত। সকালে যা দেখবে, সন্ধ্যায় আবার অন্যরকম। বহুরূপীর মতো, এখন এক সাজে, আবার একটু পরেই অন্য।

একেবারে সমুদ্রঘেঁষা যেগুলো, সেগুলো এখনো অনেক কাঁচা। জোয়ারে তলিয়ে যায় জলের নিচে, আবার ভাঁটায় ভেসে ওঠে কাছিমের পিঠের মতো। যেন এক জলজ প্রাণী। খানিক পরে নিশ্বাস নেয় বাতাসে নাক উঁচিয়ে।

আর সমুদ্র থেকে দূরে দূরে যেগুলো, সেগুলোর কথা আলাদা। বেশ মজবুত, বেশ পোক্ত। হ্যাঁ, এই মজবুত দ্বীপগুলোর দিকেই প্রথম নজর পড়েছিল ইংরেজ সরকারের। প্রথমে তারা মাপজোক সেরে নিল দ্বীপগুলির। পরে লট-নম্বর দিয়ে জমা-খরচের খাতা বানাল। লোকে বলে, লাট। অমুকের লাট তমুকের লাট। তা, লটই বল, আর লাটই বল, ভেড়ি দিয়ে বেঁধে নদীর দাপট থেকে আলাদা করে রাখা হল দ্বীপগুলিকে। যেন প্রকারান্তরে নদীগুলোকে বুঝিয়ে দেওয়া হল, তোমার সর্বনাশা নোনা জল দিয়ে আর সোহাগ করতে হবে না গো, খুব হয়েছে, এবার থামো। এবার থেকে এই বনভূমির মালিকানা আমাদের।

মানুষ এল, নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠল। একদিকে অরণ্যের ঠাসা বুনোট, অন্য দিকে সাপ, বাঘ, কুমীর কামটের তাণ্ডব। সে কী প্রচণ্ড লড়াই। মানুষকে যেন নেশায় পেয়ে বসল। হয় আমরা, না হয় অরণ্য।

তা বাপু, মানুষের সঙ্গে পেয়ে ওঠা কী চাট্টিখানি কথা। দ্বীপে দ্বীপে বনভূমি তছনছ করে ফেলল মানুষ। দুর্বর্ষ পরিবেশকে পুরে ফেলল হাতের মুঠোয়।

এ কাহিনী সেই প্রাণান্তকর শ্রমেরই কিছু অংশ। তা শুরু হয়েছিল অনেক, অনেক বছর আগে। এক কথায় অত দিনকার ইতিহাস বলে ফুরুবে কে। বরং কিছু ভাঁটা কিছু জোয়ারের মাপ তুলে নেই। বনমাতা বনবিবির বন্দনা গেয়ে শুরু করা যাক সেই উপাখ্যান :

বনের মধ্যে বনবিবির কতরে ভাই খেলা
চতুর্দিকে গাঙের পানি, মধ্যে গোলের মেলা।

এক

বাংলা তেরশ বাইশ। কার্তিক মাস। শুক্লপক্ষ। সেদিন রাত্রি শেষ হতে বিশেষ বাকি ছিল না। প্রচণ্ড কুয়াশা পড়েছে। হাত কয়েক দূরের জিনিসও স্পষ্ট চোখে পড়ে না। নদী বুড়ো-বাসুকির বুকের ওপর তখন ভাঁটা। জল নেমে এসেছে পাতাল অবধি। ঢালু পাড়ের কাদায় লাল কাঁকড়া আর নোনা কুঁচে মাছ ছুটোছুটি করছে। দুপারেই বনভূমি। নদী, কুয়াশা আর অরণ্য সব কিছু মিলেমিশে একাকার। এমন রহস্যময় পরিবেশে বুড়ো-বাসুকির বুকের উপর একটা ডিঙি আপন খেয়ালে স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে।

দেখা গেল, গলুইদুটো ঢেঁকির মতো পাড় দিচ্ছে জলে। দাঁড়ি নেই, মাঝি নেই; অদ্ভুত এক খেয়ালি ভঙ্গি। কে এমন উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে আসছে, কে জানে!

কান পেতে থাকলে শোনা যায় করুণ কাতরানির শব্দ। যন্ত্রণাতে কেউ যেন গোঙাচ্ছে ঐ নৌকোয়। কেউ যেন কান্নায় ভাসিয়ে আকৃতি জানাচ্ছে ঈশ্বরকে, হে ঈশ্বর, আমাকে মুক্তি দাও। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না গো; এবার আমাকে অব্যাহতি দাও।

ডিঙির ভেতর উঁকি দিলে দেখা যাবে সেই হতভাগা মেয়েটিকে। নাম তার গৌরী। দেখা যাবে সারা গায়ে তার মুসুর ডালের মতো ছড়ানো অসংখ্য গুটি দানা। সন্দেহ নেই, মায়ের দয়াতেই আক্রান্ত হয়েছে ও। বিষ ব্যথায় জর্জর হয়ে এখন কাতরাচ্ছে। একা।

বেচারির এক মাথা চুল, রুক্ষ, অযত্নে জট ধরে গেছে। সারা গায়ের কাপড় বড় এলোমেলো। চোখের মণি কড়ির মতো সাদা, সজল। আহা রে, হতভাগী না হলে কী এমন হয়!

ছইয়ের ভেতর নিভু-নিভু একখানা হারিকেন জ্বলছে। তলানির তেলটুকু এখনো শেষ হয় নি বোধহয়। ডিঙিখানা দোলার তালে তালে হারিকেনখানাও দুলছে। এক একবার আলো এসে ঝাপটে ধরছে মুখ, পরক্ষণেই আবার আঁৎকে উঠে লাফিয়ে সরে যাচ্ছে। পাটাতনের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বেশ জল জমে আছে নিচে। দিন কয়েক ধরে নৌকার উপর দৃষ্টি দেয় নি কেউ। জল ছেঁচবে কে! তলানির জলটা ছলকে ছলকে শব্দ করছে। শব্দ করছে একটা শূন্য কুঁজো। পায়ের কাছে ওটা গড়াগড়ি খাচ্ছে নৌকার দোলায়।

গৌরী, হ্যাঁ এই মেয়েটারই নাম গৌরী। এইভাবেই মানুষের আশ্রয় থেকে পরিত্যক্ত হয়ে একা ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে লোপ পেয়ে যাচ্ছে চেতনা। মাঝে মাঝে আবার চেতনা ফিরে পেয়ে ভয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ও। চেতনা ফিরে পেলেই বুঝতে পারছে, মাথার কাছে কাপড়ের পুঁটলিটা খোয়া যায় নি। হাতা-কড়াই ইস্তক মাটির কাঁচা উনোনটা অবধি যথাস্থানেই রয়ে গেছে, দুলছে, সমস্ত কিছুই দুলছে। আকাশ বাতাস, নদী অরণ্য, সমুদ্র, সমস্ত কিছুই দুলছে।

এ দুলুনি বুঝি থামবে না আর। বুঝি আর দেশের বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারবে না ও। দিন দুয়েক আগে যখন ধরা পড়ল অসুখটা, তখনই ওকে ত্যাগ করেছে নিমাই। ওঝা ডাকার নাম করে সেই যে ও ডিঙি থেকে ডাঙায় নামল সেই ওর শেষ নামা। গৌরী কি জানত না, এই সুন্দরবনের নদী-পথে কোথায় পাবে ও ওঝা! জানত, কিন্তু বিপদ মানুষকে দিশেহারা করে। বাড়ি থেকে পালাবার মুখেই অল্প অল্প জর শুরু হয়েছিল ওর। তখনো ও বুঝতে পারে নি, নদীর বাতাসে একটা রাত পেরতে না পেরতেই সারা গায়ে ফুটে বেরুবে কাল বসন্ত। হয়তো এমন বুঝলে নিমাইও ওকে কলকাতা দেখাবার প্রলোভন দিত না। কত পরামর্শ, কত উত্তেজনা। মানুষ যে এত স্বার্থপর হতে পারে কিশোরী গৌরীর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। কতটুকুই বা নিমাইকে ও চেনে! অথচ গোপনে গোপনে সেই নিমাইয়ের সঙ্গেই ও নৌকোয় উঠেছিল। কাকপক্ষীও টের পেল না। বেচারি, মায়ের চোখে ধুলো দিতে এতটুকু কষ্ট হয় নি তখন।

—মা। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল গৌরী, মা গো। না জানি একা ঘরে গৌরীর জন্য কাঁদতে কাঁদতে ওর মাও অন্ধ হয়ে গেছে। আর কী ফিরে যাওয়া যাবে না। মায়ের কাছে, মা গো!

নিমাইকে দেখে অমনভাবে কেন ভুলে গেল গৌরী। নিমাই ওদের গ্রামেরই ছেলে। না হয় ছেলেবেলা থেকে শহরে শহরেই কাটিয়েছে ও। গ্রামে এলে কলকাতা শহরের গল্প, কলকাতা যেন স্বপ্নের দেশ। স্বপ্নের দেশ কী সত্যি সত্যি তখন হাতছানি দিয়ে ডাকত গৌরীকে। হ্যাঁ, গৌরী মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকত। রহস্যময় নিমাই-ই ওকে আচ্ছন্ন করে রাখত সব সময়।

আজ থেকে মাসখানেক আগের কথা। পদ্মপুকুরের ধারে সাপলা তুলতে গিয়েছিল গৌরী, অমনভাবে একা একা যে নিমাইয়ের মুখোমুখি পড়ে যাবে

ও ভাবতে পারে নি। ছুটে পালিয়ে আসতে গিয়েছিল, খপ করে নিমাই ওর হাত চেপে ধরেছিল, কোথায় পালাচ্ছিস শুনি?

—বারে পালাব কেন! চোখ নিচু করে উত্তর দিয়েছিল গৌরী। নিমাইয়ের চোখের দিকে তাকাতে ওর সাহসে কুলোয় নি তখন।

—পালাচ্ছিস না বুঝি? ফের মিথ্যে কথা?

—হাত ছাড় নিমাইদা। কেউ দেখবে। ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল গৌরী।

নিমাই ফিসফিস করে বলেছিল, এই, একটা কথা বলব, শুনবি?

—কি কথা?

তুই যদি কোনোদিন কলকাতা যাস, আমার সঙ্গে দেখা করবি?

গৌরী কোনো উত্তর দিতে পারে নি। বুকের ভিতর ভুরুভুরু করে কাঁপুনি শুরু হয়েছিল ওর।

—আমি তোর জন্য একটা ফিটন গাড়ি ভাড়া করব। ফিটন গাড়ি চড়ে আমরা কালীঘাটের কালী দেখতে যাব। কালী মন্দিরের কাছেই শ্মশান। ও-শ্মশান দেখা ভাগ্যের।

—ছাই। গৌরী ঠোঁট বাঁকা করে বলেছিল। শ্মশান বুঝি কেউ দেখতে যায়?

—দেখিস নি তো, তাই বলছিস। ওকি আর যে-সে শ্মশান, মহাশ্মশান। ওখানে কখনো আগুন নেভে না। যাক গে, শ্মশানে না যেতে চাস, তোকে খিদিরপুর জাহাজঘাটায় নিয়ে যাব। এক একটা জাহাজ দেখে তোর মাথা ঘুরে যাবে। তাছাড়া তুই চিড়িয়াখানা দেখেছিস?

গৌরী বুঝতে পারে না চিড়িয়াখানা কি। সেটা কি আবার?

—বাঘ, সিংহ, হাতি, জিরাফ, জলহস্তী, ক্যাঙারু···নামই শুনিস নি।

সত্যি সত্যি নাম শোনে নি গৌরী। চোখে ওর সে কী বিস্ময়।

—কলকাতার মনুমেণ্ট দেখলে তুই হাঁ হয়ে যাবি। ধর্মতলায় যে হোটেলে আমি চাকরি করি সেখান থেকে রাতদিন আমি মনুমেণ্ট দেখি। গড়ের মাঠে রোজ তোকে বেড়াতে নিয়ে যাব, দেখিস, কী ভালো যে লাগবে তোর।

—আমি যাচ্ছি বড়।

—কেন, যাবি না?

—কে আমায় নিয়ে যাবে শুনি? আমার বাবা নেই, ভাইও নেই।

কিছুক্ষণ নীরব থেকেছিল নিমাই। তারপর আবেগ মিশিয়ে বলেছিল, তুই যদি রাজি থাকিস গৌরী, আমি তোকে নিয়ে যাব।

গৌরীর বুকভরা উত্তেজনা। কলকাতা দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়। কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গে ও কলকাতা যাবে শুনলেই মা ওকে বঁটি দিয়ে কেটে দু'টুকরো করবে। গৌরীকে বিয়ে দিতে পারছে না বলেই মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ নেই, তারপর নিমাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় যাবে শুনলে কী আর রক্ষা রাখবে।

নিমাই বলেছিল, তোর যদি ইচ্ছে থাকে তো বল, উপায় করে নিতে পারি।

—কি রকম?

—কাল এ-সময় আবার এখানে আসিস, বলব। যা এখন।

গৌরী সেদিনকার মতো সরে এসেছিল। কিন্তু রাতে ঘুমুতে পারে নি, কলকাতায় ওকে নিয়ে যেতে পারে নিমাই, এ কী কম ভাগ্যের। নিজেকে ভাগ্যবতী ভেবে গর্বে ফুলে ফুলে উঠেছিল গৌরী।

কিন্তু সেই নিমাই-ই যে ওকে এমনভাবে একা ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে কী করে ভাববে ও। এই নিমাই-ই ওকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে কথা দিয়েছিল। তবে কী সারাক্ষণ মিথ্যে কথা বলেছিল নিমাই! না, হতেই পারে না।

এমনও তো হতে পারে, নিমাই পথ ভুল করে বসেছে। হয়তো ওঝাকে সঙ্গে করে পথে-বিপথে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনও হতে পারে, জঙ্গলের মধ্যে বিপদে পড়েছে নিমাই। বেচারি হয়তো গৌরীর জন্য জীবনটাই দিয়ে বসল। এখন ও একা। কেমন করে ও পরিত্রাণ পাবে এই বিপদ থেকে।

বেহালায় ছড় টানার মতো শব্দ ভেসে আসছিল নৌকো থেকে। কী কুক্ষণেই যে নৌকোযাত্রা শুরু করেছিল ওরা। একটা দিন একটা রাত শেষ করে এখন দ্বিতীয় আর একটা রাত শেষ হয়ে আসছে। এখনি আবার একটা ভোর হবে। আর কিছুক্ষণ বাদেই অজস্র পাখির ডাক শুনতে পাবে গৌরী। ছইয়ের ফাঁক গলিয়ে তিরতির করে রোদ ঢুকবে ভেতরে।

গৌরী বুঝতে পারল, গলুইদুটো ঢেউয়ের তালে এখনো একটু একটু দুলছে। কিন্তু দুলুনিটা আগের মতো অত প্রবল নয়, তবে কী ধারেকাছে ডাঙা মিলবে এখন। সর্বাঙ্গে ব্যথা, একটু উঠে ছইয়ের ফাঁক গলিয়ে বাইরেটা যে দেখবে, সে ক্ষমতাও যে নেই।

নৌকোর কাছেই কী যেন একটা জলে আছড়ে পড়ল। হয়তো কুমীর কিংবা কামট। তবে কী নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জীবগুলিও ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে কী ওরা অপেক্ষায় আছে গৌরীর। গা হাত পা আবার কেমন হিম হয়ে এল ওর। মাথার ভিতরে লক্ষ ঝিঁঝি পোকার শব্দ। শরীরে টনটন করে উঠল যন্ত্রণা।

গৌরী বুঝতে পারল না, ডিঙিটা নদীর কিনারে এসে বাঁধের পাশে আটকে গেছে। এখন ভাঁটা নামছে হুহু করে। আর খানিক বাদেই নৌকোর নিচ থেকে সব জল সরে যাবে। কাদায় কাত হয়ে বসবে নৌকোটা। আবার একটা জোয়ার না এলে এখানেই আটকে থাকবে গৌরী। ছ'ঘণ্টা এ-ভাবে আটকে থাকার পালা। ছ'ঘণ্টা জোয়ার, ছ'ঘণ্টা ভাঁটা। সুন্দরবনের নদীর এই এক রুটিন বাঁধা খেলা। কখনোবা নদী জোয়ারে ফেঁপে ফুলে প্রকাণ্ড, কখনো আবার পেটেপিঠে একাকার হয়ে কঙ্কাল।

নৌকোটা যে স্থির হয়ে পড়েছে কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল গৌরী। হুমড়ি খেয়ে ছইয়ের ফাঁক গলিয়ে ও তাকাল। প্রচণ্ড কুয়াশায় চোখে ঘোলা লেগে যায়। কিন্তু দূরে ওটা কী! আগুন না! হ্যাঁ, ওই তো দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে জঙ্গলের পাশে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছড়িয়ে তাকাল গৌরী। হ্যাঁ, গলগল করে ধোঁয়া উঠছে আকাশে। কিন্তু এই জঙ্গলের ভিতর কে জ্বালাল আগুন! তবে কী ধারে-কাছে বসতি আছে কোথাও! না কী ভুল দেখছে গৌরী। না, অসম্ভব, জ্বলন্ত আগুনের শিখাগুলি স্পষ্ট ও দেখতে পাচ্ছে। পাক খেয়ে খেয়ে বৃত্তাকারে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে, দেখতে পাচ্ছে ও। কে জ্বালাল আগুন! নিমাই নয় তো? নিমাই! অসম্ভব, তবে? কোনো গাজীর দরগা নয় তো! আশায় আশায় বুকের ভিতর কাঁপুনি শুরু হল আবার। সর্বাঙ্গে যেন আবার একটু একটু করে বল ফিরে পেতে শুরু করল গৌরী। দেহ এত দুর্বল, তবু মনে হচ্ছে এখনি যেন ও উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটাচলা করতে পারবে।

আবার পলকেই গৌরী চমকে উঠল, তবে কী ওটা শ্মশান! শ্মশানের চিতা জ্বলছে কি ওখানে! চিতা, কার চিতা!

কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে মনে হয়েছিল নীরোগ, সুস্থ। কিন্তু এখন আবার স্নায়ুগ্রন্থি শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল ওর।

এমনও তো হতে পারে, বোম্বেটে দস্যুদের আস্তানা ওটা। কিংবা পথিকরা হয়তো আগুন জ্বালিয়ে রেখে আশেপাশে কোথাও অপেক্ষা করছে। জঙ্গলের পাশে রাত্রিবাস করতে হলে এ ছাড়া আর গতি নেই ওদের। গৌরীকে দেখতে পেলে এখনি হয়তো সাহায্য করার জন্য ছুটে আসবে ওরা।

আসবে কী! গৌরী নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল আগুনের দিকে। আগুনের কী সম্মোহন শক্তি। পাক খেয়ে ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠছে ধোঁয়া। হিংস্র কোনো বিষধর জীবের মতো কুয়াশায় জিভ মেলে ধরে যেন শীতল করে নিতে চাইছে নিজেকে। জ্বালা, প্রচণ্ড জ্বালা ওর দেহে।

গৌরীর মাথাটা আবার ধীরে ধীরে ঝুঁকে এল নিচে। চোখ বুজল গৌরী। ডিঙিটা ভাঁটার চড়ায় আটকে যাওয়ায় আর দুলছিল না। চারপাশ ক্রমশ ফরসা হয়ে আসছিল। নাম-না-জানা অজস্র বুনো পাখি তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল।

দুই

কিন্তু ভোর হওয়ার অনেক পরে ফরসা হল চারদিক। কুয়াশার দানা সূর্যের আলোয় উবে গিয়ে ঝকমকে হয়ে উঠল নদী আর বনভূমি। যে আগুনটা দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল গৌরী সেই আগুনের পাশে তখন কেউ ছিল না। যে লোকগুলি গত সন্ধ্যায় তাণ্ডব করে আগুন ধরিয়ে গিয়েছিল ওখানে, তারা সারা রাত নেশা করে অকাতরে ঘুমিয়েছে নিজেদের ডেরায়। এখন তারা শয্যা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করেছে। আর যে দুর্ধর্ষ জন্তুগুলি সুন্দর-বনের জঙ্গলের দাপটে সারারাত ঘুরে বেড়ায় তারাও আগুনের ত্রিসীমা থেকে দূরে অন্য কোথাও পালিয়ে থেকেছে। আগুনে তাদের ভীষণ ভয় ভয়ানক আতঙ্ক।

বাতাস ছিল না। তবু সারাটা রাত লকলক করে নেচেছে আগুন। ভাবখানা যেন গোটা অরণ্যটাকেই পুড়িয়ে খাক করে দেবে। অরণ্যের আদিম বীভৎসতার বিরুদ্ধে যেন সে শক্তি পরীক্ষা করতে চায়। এসো এসো, তোমার সাহস দেখি এসো। হাঁ হাঁ, হিঁ হিঁ, এসো।

গাছের সবুজ সতেজ পাতা মুহূর্তে মুহূর্তে রং পালটে পাঁশুটে হয়ে ঝলসে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুঁড়ি দুমড়ে যাচ্ছে কুঁকড়ে যাচ্ছে, ফটফট শব্দ করে বেরিয়ে পড়ছে তার জলজ নির্যাস।

আগুনের আভায় সারা রাত বেশ কিছু দূর ফরসা হয়ে থাকে। সেই আলোতে লক্ষ্য করলে বোঝা যেত, খানিকটা জায়গা জুড়ে জঙ্গল নির্মূল হয়ে গেছে। আর সেই ফাঁকা জায়গাটুকু পার হলেই বুনো ঝোপ। কিছু কিছু জঙ্গল আধ-কাটা। কিছু কিছু জঙ্গল পুরোপুরি কাটা হলেও পরিষ্কার করে ফেলা হয়নি এখনো।

আগুনের তাপে পোড়া ইটের মতো শক্ত চোয়াড়ে হয়ে উঠেছে মাটি। এই মাটির দিকে তাকিয়ে দয়াল ঘোষ চমকে চমকে ওঠেন, মাটি কোথায়, এ যে

নুনের স্তূপ। এর উপর কি করে যে লোকে ফসল ফলাবে, কে জানে! চৌধুরীদের আবাদ করার খেয়ালের কোনো যুক্তিই খুঁজে পান না দয়াল। তবু আবাদ করার দায়ভার যখন ওঁরই, তখন আর ওসব নিয়ে ভাবলে চলে না। দয়াল ঘোষ পুরোদমেই উৎসাহ দেন সবাইকে, শাবাশ শাবাশ। যত তাড়াতাড়ি কাজটুকু সমাধা করা যায় ততই যেন মঙ্গল।

চল্লিশ জন কাঠুরে, চল্লিশটা ধারালো কুড়ুল নিয়ে কী কাণ্ডই না বাধিয়ে রাখে সারাদিন। সারাটা জঙ্গল যেন চিৎকার করে কাঁদে। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে বিরাট বিরাট গাছগুলি উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। শাবাশ শাবাশ···এরপর শুরু হয় কাঠ-বাছাই কাঠ-ঝাড়াই। ফেলে ছেড়েও দামি দামি কাঠের স্তূপ জমে থাকে। নৌকাতে বোঝাই করে কতটুকুই বা টানা যায়! জঙ্গল যা জমে তাতেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, বুনো পশুপাখিকে ভয় দেখাতে আগুনই যথেষ্ট।

দয়াল ঘোষ ক্যাম্পখাটে শুয়ে এখনো শয্যার শেষ আমেজটুকু পুষিয়ে নিচ্ছিলেন। সারা দেহে কম্বল জড়ানো। বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন দয়াল ঘোষ। আশ্চর্য এই অরণ্য। সকালে সন্ধ্যায় দুপুরে এর বৈচিত্র্যের যেন শেষ নেই।

আর ও-পাশে বুড়ো বাসুকির চোখে-মুখে আক্রোশ নিয়ে সারাক্ষণ যেন ফুঁসছে। যেন টের পেয়ে গেছে নদী, এখানে নতুন একটা জনপদ বসাবার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। জঙ্গল উৎখাত করে মানুষ এখানে নিজের প্রতিপত্তি ছড়াতে চায়। নদীর অট্টহাসিতে ব্যঙ্গ। চমকে চমকে ওঠেন দয়াল ঘোষ।

কিন্তু নদীর সমস্ত আস্ফালন আজ ভেড়ির শেকলে বাঁধা। ভেড়ি উপচিয়ে নদীর জল যে এগিয়ে আসবে সাধ্য কি। তবু ভয় কাটে না দয়াল ঘোষের। ভেড়ির মাটি কাদা কাদা হয়ে গলে পড়তে আর কতক্ষণ। যদি সত্যি সত্যি এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে?

সুন্দরবনের পাকা অভিজ্ঞ লোক রজনী। রজনীই একমাত্র সহায় দয়াল ঘোষের। বয়স পঞ্চাশের বেশি বই কম নয়। লোকটার বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে বনে-জঙ্গলে। ফলে বন-জঙ্গলে প্রতিটি অন্ধি-সন্ধিই ওর জানা। পাকা শিকারী হিসাবেও রজনীর এককালে বেশ নামডাক ছিল। এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা স্তিমিত। কাছারিবাড়ির আশেপাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখার যুক্তি প্রধানত ওরই।

মাত্র মাসখানেক হল এখানকার জীবন শুরু হয়েছে ওদের। এরই ইতিহাস কত। ঈশান একদিন সামান্য একটা লাঠি সম্বল করে বাঘের মুখ থেকে বেঁচে এল। ঈশান চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপের মানুষ। একরোখা, বাড়ি-ঘরের

ভোয়াক্কা ছেড়ে এখানে এসে জঙ্গলে ভিড়েছে। একা একা জঙ্গলে ঢুকেছিল মধুর লোভে, প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে, এই ঢের। ঝোপের আড়ালে বড়ে মিয়াঁ সম্পর্কে যখন নিশ্চিন্ত হল, তখন ও গাছের ডালে মৌচাক তোলায় ব্যস্ত। মধুর কথা ও ভুলে গেল। মধু নিংড়ে নিয়ে মোমটুকু ও লাঠিতে জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে নিল, তারপর গদার মতো আগুন ঘোরাতে ঘোরাতে ও সে যাত্রা রেহাই পেল।

দয়াল ঘোষ ঈশানের ওই চেহারা দেখে চিৎকার করে উঠেছিলেন, এই শুয়ার, জানটা বুঝি খোয়াতে চাস? একা ঢুকেছিলি কেন জঙ্গলে?

দয়াল ঘোষ আরো দেখেছেন, আধপোড়া বিরাট একটা সাপকে একদিন গজল শেখ তুলে এনে হাজির। তারপর তাকে নিয়ে কী নারকীয় নৃত্য তার। মদের নেশায় চুর হয়েছিল গজল। সাপটাকে মেরেই কেবল শান্তি পায় নি, আগুনে পুড়িয়ে গায়ের ঝাল মিটিয়েছে। বিশ্রী চামড়া-পোড়া গন্ধে নাক মুখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল দয়াল ঘোষের। তবু গজলকে গালমন্দ করতে সাহস পান নি উনি।

এই একমাসের মধ্যেই একদিন বুড়ো বাসুকির বুকের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া মানুষের মৃতদেহ দেখে আঁৎকে উঠেছিলেন দয়াল ঘোষ। মৃতদেহের ভাসমান দেহের উপর বসে ঢেউ খেতে খেতে এগিয়ে চলেছিল কয়েকটা শকুন। রজনীর হাত থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে দয়াল ঘোষ শকুনগুলিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলেন; গুলির শব্দ ভেঙে তছনছ হয়ে গেল ঢেউয়ের আঘাতে। টুকরো টুকরো শব্দ নদীর ওপর আছড়াতে শুরু করেছিল। সমস্ত অরণ্য যেন চমকে কিলবিল করে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। আকাশের গভীর নীল এক নিমেষে পেঁজা মেঘের মতো পাখির ডানায় ডানায় ছেয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহটা একবার ঢেউয়ের ভাঁজে ডুবে গেল, আবার ভেসে উঠল। আর গুলিবেঁধা একটা শকুন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। যেন টাটকা রক্ত ছড়িয়ে জলে বিচিত্র একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করল। বাকিগুলো দিশেহারা হয়ে আকাশে উঠে পাক খেতে শুরু করল।

এক মাসের এই অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে ভাবতে দয়াল ঘোষ তন্ময় হয়ে যান। কী বিচিত্র এই অরণ্যভূমির অভিজ্ঞতা! আশ্চর্য!

দয়াল ঘোষ বুঝতে পারলেন, প্রতিদিনের মতো আজও একটা সকাল হয়েছে এখন। তবু আলসেমি করে শীতের আমেজটুকু চুইয়ে চুইয়ে উপভোগ করতে থাকেন। ঘরের মেঝেতে আরো একটা বিছানা পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ অনেক আগেই রজনী শয্যা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে বাইরে। অসংখ্য পাখির

শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন দয়াল ঘোষ। মশারির ভেতর থেকে সমস্ত ঘরটাকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন। গরান ডালের বেড়া, উপরে গোল পাতার ছাউনি। কাঁচা মাটির সোঁদা গন্ধে সব সময়ই একটা অদ্ভুত আমেজ ছড়িয়ে থাকে। দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালে কাঠুরেদের ডেরাগুলি চোখে পড়ে। মাঝখানে তকতকে পরিষ্কার একটা উঠোন। কুলি ডেরা আর কাছারি বাড়ির চারপাশে রয়েছে উঁচু গাছগাছালির বেড়া। বেড়ার ও-পাশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা পরিখা কাটা। বুনো জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এসব আয়োজন। কিন্তু পোকামাকড় আর সাপ। এদের গতিবিধি অবাধ। চিরন্তনী যা নিয়ম, প্রতিদিন ঘরে ধোঁয়া দেওয়া হচ্ছে, কখনো সখনো নৌকো বোঝাই করে গোবর আনা হচ্ছে। গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবু যেন নিস্তার নেই কারো।

চৌধুরীদের আশার অন্ত নেই। ছোট কর্তা, তার স্বপ্ন এই সুন্দরবনের জমিটুকু। এখানে জনপদ বসুক, হাট হোক, বাজার হোক। এই বুড়ো বাসুকির উপর দিয়ে হাজারে হাজারে নৌকো চলুক। ব্যাপারী আসুক, ঘাটে, ভিড়ুক। হোক স্কুলবাড়ি, পাঠশালা, মক্তব। আর সবার উপরে এর নাম হোক চৌধুরীর আবাদ।

কিন্তু দয়াল ঘোষ জানেন, সে হতে এখনো অনেক বাকি। লোক কোথায়! মাত্র চল্লিশ জন কাঠুরে নিয়ে পুরো দ্বীপটাকে আবাদ করা কয়েক পুরুষের কাজ। এই চল্লিশ জন লোককে যোগাড় করতেও কম হিমসিম খেতে হয় নি ওদের। কত প্রলোভন, কত তোষামোদ। বাবাবাছা করে কাজটুকু হাসিল করা ছাড়া উপায় নেই। দয়াল ঘোষ অলস চোখে তাকিয়ে থাকেন। অলস চিন্তা করতে করতেই একবার পাশমোড়া দেন। আর ঠিক এই সময়ই উনি চমকে ওঠেন। কান পেতে লক্ষ করেন, বাইরে কি যেন একটা উত্তেজক ঘটনা ঘটেছে। কী হতে পারে, কী ঘটেছে বাইরে! হিংস্র সাপ আর বাঘের কথাই প্রথমে মনে এল ওঁর। সঙ্গে সঙ্গে উনি লাফিয়ে মশারি থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

বেরিয়ে এসে বুঝতে পারলেন, নতুন পরিবেশে যা ঘটে সবই নতুন। শুনতে পেলেন, বনবিবির নাও এসে ঘাটে ভিড়েছে। নাওখানা ভেড়ির গায়ে কাত হয়ে পড়ে আছে।

—বনবিবির নাও! অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন দয়াল ঘোষ।

—হ্যাঁ দয়ালবাবু, দেখবেন চলুন। আমরা হাঁকডাক করলাম, কোন রা

এল না। ছইঢাকা একটা ডিঙি নাও দয়ালবাবু। ভাটার টানে চরায় এসে আটকে রয়েছে।

রজনী যথেষ্ট উত্তেজিত। দয়াল ঘোষ চাদরটাকে গায়ে পিঠে জড়িয়ে নিলেন, চল তো দেখে আসি।

দলবল নিয়ে ভেড়ির উপর উঠে আসতে যেটুকু সময়, অনেকেই আগেভাগে এগিয়ে এসে ভিড় জমিয়েছে। দয়াল ঘোষ পলকে একবার বুনো মানুষগুলিকে দেখে নিলেন। তারপর নদীর ঢালে তাকালেন, আশ্চর্য! কার ডিঙি ওটা! কাল সন্ধ্যায়ও এমন কোনো ডিঙি ওখানে দেখা যায় নি!

রজনী ফিসফিস করে বলল, শুনতে পাচ্ছেন, কে যেন নৌকোর ভেতরে খিনখিনে গলায় শব্দ করছে।

হ্যাঁ, বেশ শোনা যাচ্ছে। কে যেন নৌকোর ভেতর কাতরাচ্ছে। কে রে বাবা! ডাকাতে ধরা কোনো ডিঙি নয়তো ওটা! কী জানি, অসম্ভব নয়। ডিঙিতে একবার ঢুকে দেখে আসতেই বা ক্ষতি কি! একবার দেখে এলে হত না?

রজনীর হাতে বন্দুক। বন্দুকের নল শক্ত করে ধরা। চারপাশে একবার তাকাল। কুয়াশা-ভেজা বাতাসের ভেতর দিয়ে রোদ এসে পড়ছে চোখেমুখে। অন্যদিন হলে এই রোদটুকু আরাম করে উপভোগ করা যেত, আজ যেন মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে।

রজনীর পাশেই দাঁড়িয়েছিল ঈশান। ঈশানের দিকে তাকাল রজনী, ঢুকবি নাকি নৌকায়? চল না একবার দেখে আসি।

গোঙানিটা নারীকণ্ঠের যে সন্দেহ নেই। তবে কেমন নারী সে। কি রূপ ধরে সে রয়েছে, সেটাই এখন প্রশ্ন। না, একা ঢোকার সাহস নেই রজনীর। এর চে বোধহয় বাঘের মুখোমুখি লড়াও সহজ।

দয়াল ঘোষ আবার অনুরোধ করলেন, যা না বাবা, একবারটি ঢুকে দেখে আয়।

এরপর পুরুষ হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে হলে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। নদীর কাদায় নেমে পড়ল রজনী আর ঈশান। পা টিপে টিপে শেষপর্যন্ত ডিঙির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

ভেড়ির উপর থেকেই দয়াল ঘোষ অভয় দিলেন, যা, উঠে পড়। আমরা তো আছিই, ভয় কি!

রজনী চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে ডিঙির ওপর উঠে পড়ল। ঈশানও।

কাদার উপর একপাশে হেলে কাত হয়ে পড়ল ডিঙিটা। নদীর জল এখন অনেক নিচে। লাল কাঁকড়াগুলিকে ভুড়ভুড়ি কাটতে দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু নোনা মাছ কাদার ওপর সাঁতার কেটে চলেছে আপন খেয়ালে।

রজনী এক হাঁটু কাদাসমেত ডিঙির ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। ভিতরে ভ্যাপসা একটা গন্ধ।

চমকে উঠল রজনী, আশ্চর্য! কে এই মেয়ে! বয়স চোদ্দ পনেরর বেশি নয়। সন্ত হয়তো কিশোরীত্ব ঘুচিয়ে শাড়ি পরতে শিখেছে। লালচে কটা চুলের ঢল মুখের খানিকটা অংশ ঢেকে রেখেছে। উন্মুক্ত দেহ। শাড়িখানা এলোমেলো ছড়ান। কিন্তু সারা দেহ জুড়ে কী ওগুলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রজনী, মায়ের দয়া হয়েছে রে! দেখছিস?

ঈশানও চোখ ফেরাতে পারছিল না। স্তব্ধ। মেয়েটার কোনো সাড় আছে বলে মনে হল না ওর।

—কোথ্‌ থেকে এল বল দেখি? আচ্ছা জ্বালাল তো! রজনী বিড়বিড় শুরু করল। নাকি কেউ তুকতাক করে ফেলে রেখে চলে গেল। তাই বা কি করে সম্ভব! এত রাজ্য থাকতে এই জঙ্গলে কেন রে বাবা! নাকি বেহুলার মতো ভাসিয়ে দিয়ে গেল কেউ।

রজনী যুক্তিগ্রাহ্য কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। মেয়েটা সজাগ আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য ডাকল, ও মেয়ে, শুনছ? শুনতে পাচ্ছ? নৌকোটাকে দোলাবার চেষ্টা করল পায়ের ধাক্কায়।

আর ঠিক এই মুহূর্তেই মনে হল রজনীর, কার সঙ্গে কথা বলছে ও। যদি কোনো ছদ্মবেশী অপদেবতা হয়ে থাকে, বিশ্বাস কী! আঁতকে সারা গায়ে শিহরণ খেলে গেল ওর।

ঈশানকে একটা খোঁচা দিল রজনী, কি রে? কি মনে হচ্ছে তোর, বলবি তো?

ঈশান সত্যি সত্যি কথা হারিয়ে ফেলেছিল।

রজনী বলল, চল তাহলে বেরিয়ে পড়ি। জোয়ার এলে না হয় ডিঙিটাকে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে। কি বলিস তুই?

ঈশান ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল রজনীও।

বাইরে ভেড়ির উপরে উৎসুক কিছু মানুষ। সবাই স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে ডিঙির দিকে। দয়াল ঘোষ রজনীকে দেখতে পেয়ে উৎসাহে এগিয়ে এলেন, কি, কি দেখলি রজনী? কে ভেতরে?

রজনী ততক্ষণে বিড়বিড় করে রামনাম জপা শুরু করেছে। জপতে জপতে দয়াল ঘোষের কাছাকাছি এগিয়ে এল।

—ওরে বাপ! মেয়েমানুষ দয়ালবাবু। রজনী কথা বলতে বলতে হাঁপাতে শুরু করল। মায়ের দয়ার রূপ ধরে এয়েছেন গো, ছলনাময়ী।

—এই বুঝি দেখা হল? দয়াল ঘোষ ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

—হ্যাঁ বাবু, স্বচক্ষে দেখলাম। আসলে এসব ডাইনীকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না আমাদের। ফের জোয়ার এলে না হয় ডিঙিটাকে আবার ভাসিয়ে দেওয়া যাবে।

দয়াল ঘোষের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বনবিবি, ডাইনী, তুকতাকের ওপর রজনীর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু এই প্রকাশ্য দিনের আলোয় সাক্ষাৎ বনবিবির আবির্ভাব, আর যাই হোক দয়াল ঘোষ কি করে বিশ্বাস করবেন। ফলে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কি দেখেছিস আগে সেটা বল? কি করতে হবে না হবে সেটা আমি বুঝব।

রজনী ঘোলাটে চোখে দয়াল ঘোষের দিকে তাকাল। পরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েটার বর্ণনা দিল। ঈশানকে কাছে ডেকে মাঝে মাঝে সাক্ষী মানল। পরে আবার রামনাম জপতে শুরু করল।

এখন কি করা উচিত! সত্যি কি জোয়ারের জলে নৌকোটাকে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত। না, অসম্ভব। দয়াল ঘোষ খানিকটা প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, হাঁ করে দেখছিস কি তোরা? যা শক্ত করে নোঙরটাকে গেঁথে দে মাটিতে। পরে যা হয় ভাবা যাবে।

রজনীর মনে হল ওর গায়ে যেন দয়াল ঘোষ চাবুক চালালেন। ঘুরে দাঁড়াল, কি পাগলের মতো কথা বলছেন দয়ালবাবু? এসব অপদেবতা নিয়ে খেলা করার বিপদ জানেন?

—জানি। সব দায়িত্ব আমার।

দয়াল ঘোষ আর অপেক্ষা করলেন না। ভিড়ের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে কাছারিবাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

নিঃশব্দে ঘটে গেল ঘটনাটা। রজনী থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, দেখলে তো? ব্যাপারটা দেখলে তো? বনবিবিকে নিয়ে ছেলেখেলা!

—বনবিবিই যে প্রমাণ আছে? কে একজন প্রশ্ন করল।

—আছে, আলবাত আছে। নিজের হাতের চেটোয় নিজেই একটা ঘুষি বসাল রজনী, আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তা মিথ্যে হতে পারে না।

—তুমিই তো বলছ মায়ের দয়া হয়েছে! চোদ্দ পনের বছরের ফুটফুটে একটা মেয়ে।

—ওটা ছদ্মবেশ। ঐ রকম বেশ ধরেই এসেছে গো।

ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে তো আমাদের মৃত্যু।

—মৃত্যু ছাড়া কি? আমরা কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারব ভেবেছিস? বনবিবি যদি আমাদের উপর সদয় না হন, তাহলে আমাদের রক্ষা আছে বলতে চাস?

রজনী কিছুতেই উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারছিল না। ঈশানকে জিজ্ঞেস কর না। ঈশান কি দেখেছে, জিজ্ঞেস কর।

আশ্চর্য, ভিড়ের মধ্য থেকে ততক্ষণে ঈশান সরে পড়েছে। গেল কোথায় হারামজাদা!

জগন্নাথ বলল, ঈশানের কথার দাম নেই। তুমি যখন বলছ তখন নৌকোটাকে এখানে আর না রাখাই ভালো।

মকবুল বলল, চল তা হলে দয়ালবাবুকেই গিয়ে বলি আমরা। একজনের খামখেয়ালিতে আমরা সবাই মরব এ হতে পারে না।

সমস্বরে সবাই বলে উঠল, তাই চল। দয়ালবাবুর কাছেই চল। দয়ালবাবুকে গিয়ে বোঝাই চল।

ভেড়ি থেকে গোটা ভিড়টা টলতে টলতে নেমে এল। তকতকে উঠোনটুকু পার হয়ে কাছারিঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সবাই।

রজনী যেমন হন্তদন্ত ভঙ্গিতে এসেছিল, তেমনি ভঙ্গিতেই কাছারিঘরে ঢুকে পড়ল, দয়ালবাবু, মকবুলরা এসেছে, একটা কথা আছে।

দয়াল ঘোষ ঘুরে দাঁড়ালেন, রজনীর গলার স্বর কেমন অপরিচিত লাগল।

—বোস ওখানে। একটা টুলের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন দয়াল ঘোষ। কি বলতে এসেছিস আমি জানি। তার আগে আমার একটা কথার জবাব দে?

রজনী গলা নামিয়ে শুধাল, বলুন?

—মেয়েটাকে দেখে কি মনে হল? ভদ্র ঘরের? নাকি অন্য কিছু?

রজনী আবার চোখ তুলল, ভদ্র অভদ্র পরের কথা, কাজটা কিন্তু সত্যি সত্যি ভালো করলেন না দয়ালবাবু। নৌকোটাকে ভাসিয়ে দেওয়াই উচিত আমাদের।

—বটে! দয়াল ঘোষ এক মুহূর্ত কি ভাবলেন, ভাসিয়ে দিতে আর কতক্ষণ লাগে, তবে একটু সবুর করতে এত অধৈর্য কেন তোদের? বলছিলুম মেয়েটার জ্ঞান ফিরলে অবস্থা বুঝে যা হোক একটা কিছু করা যাবে।

রজনী গজগজ করে কি বলল বোঝা গেল না।

দয়াল ঘোষ স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করলেন, এক মুঠো ওকে খেতে দিবি তো আজ? না খেতে পেলে কিন্তু ওখানেই মরে পড়ে থাকবে। আর এই অপঘাতে মৃত্যুর দোষ কিন্তু আমাদের ঘাড়ে চাপবে।

—আমি পারব না। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল রজনী।

—পারবি না। একটু থমকে গেলেন দয়াল ঘোষ। বেশ, তবে রান্না করে দিস, আমিই না হয় দিয়ে আসব।

রজনী উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। প্রতিবাদ জানাতে এটাই যেন সহজ ভঙ্গি।

আর এ সময় দয়াল ঘোষের নজরে পড়ল, দরজার বাইরে সত্যি সত্যি একটা জটলা। ভেড়ি থেকে সবাই নেমে এসে কাছারিবাড়িটা ঘিরে ধরেছে। তবে কি ওদের মুখপাত্র হয়ে রজনী এসে কথা বলে গেল। চারপাশে কি ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল নাকি! কার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র? দয়ালের বিরুদ্ধে? ভাবতেও অবাক লাগে।

এসময় আরো কিছু অশুভ কথা মনে এল ওঁর। লোকগুলি যদি দা কাটারি নিয়ে একসঙ্গে চড়াও হয় ওর ওপরে, কে বাঁচাবে ওকে। বুকের ভিতর দ্রুততালে রক্ত চলাচল শুরু হল। দয়াল ঘোষ অস্থিরভাবেই ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

—কি ব্যাপার? কাজকম্ম নেই? সব যে আজ হাত-পা গুটিয়ে ঘুরঘুর করছিস?

কোনো উত্তর এল না। দু' দশজন বাদার লোক ছাড়া সবাই প্রায় সাঁওতাল। জঙ্গলের আদিবাসী, জংলী। বুদ্ধিতে কিছু খাটো। কিন্তু দেহের জোরে অসম্ভবকেও সম্ভব করে বসতে পারে। সারা গা নুন আর শুকনো মাটিতে খসখসে, চোখের মণিগুলো ভোঁতা করমচার মতো কঠিন আর লাল। সারা রাত ফুর্তিফার্তা করে পচাই গিলেছে। নেশাটুকু এখনো যেন পুরোপুরিভাবে কেটে ওঠে নি। লোকগুলি জটলা পাকিয়ে বাড়িটাকেই ঘিরে আছে। যেভাবেই হোক লোকগুলির মধ্যে আবার প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। দয়াল ঘোষ গলায় কাঠিন্য মিশিয়ে বললেন, কি হল, সবাই বসে কাটাবি নাকি আজ?

এবারও কোনো উত্তর এল না।

শেষ চেষ্টা করার জন্য দয়াল ঘোষ গলাটা নামালেন, কি হয়েছে বলবি তো? ওরকম বোবা হয়ে থাকলে চলে কি করে? এদেশে বাপু তোরাও যা, আমিও তা।

মকবুল মুখ খুলল, বনবিবিকে কি বেঁধে রাখাটা উচিত হল আমাদের ?

দয়াল ঘোষ হাসলেন। রজনীর অনুকরণেই যেন মকবুল কথা বলল।

—বুঝেছি, এই সামান্য কারণের জন্য এত অভিমান ? বেশ তো, তোরা দশজনে যা চাইবি, তাই হবে। চল, ভাসিয়ে দিয়ে আসি ডিঙিটাকে। ওঠ।

ভিড়ের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল রজনী। এগিয়ে এল, চলুন দয়ালবাবু, এসব দেবী-অপদেবী নিয়ে ছেলেখেলা না করাই ভাল।

দয়াল ঘোষের ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটার পেটে দড়াম করে একটা লাথি কসিয়ে দেন, কিন্তু সময় বিশেষে সবই সহ্য করতে হয়। সহ্য করে নিয়ে বললেন, চল।

আবার ভিড়টা টলতে টলতে এগিয়ে এল ভেড়ির দিকে। বেলা প্রায় মধ্যপ্রহর গড়াতে বসেছে। মাথার উপর সূর্য ঝলসাচ্ছে এখন। নদীতে জোয়ারের টান। প্রায় তিনপো মাপের জোয়ার ধরেছে নদীতে।

ভেড়ির উপর থেকে নৌকোর দিকে তাকালেন দয়াল ঘোষ। কে জানে, কোন্ হতভাগী সামান্য একটু আশ্রয়ের আশায় এখানে এসে আটকে পড়েছে। মানুষের কাছে মানুষ আশ্রয় চায়। কিন্তু আমরা কি মানুষ ! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন উনি।

মকবুলই প্রথম কাদায় নামল। এসো দেখি, এক হ্যাঁচকায় নামিয়ে দেই ডিঙিটাকে।

কয়েকজন এগিয়ে এসে দুড়দাড় করে নৌকোয় হাত লাগাল। রজনী তখনো ভেড়ির উপরেই দাঁড়িয়ে। খবরদারি শুরু করল রজনী, বাঁয়ের দিকে ঝুঁকটা বেশি দিও হে। বাঁয়ে ঝুঁক না থাকলে ছুঁচের ফলার মতো নদীর মধ্যেই ঢুকে যাবে গলুইটা। আর তাহলে কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকবে না।

সবেমাত্র একটা ঝাঁকি দিয়েছে সবাই, দয়াল ঘোষ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, এই থাম থাম।

থমকে দাঁড়াল সবাই, কি হল আবার !

—দাঁড়া, একবার আমি নিজের চোখে দেখে নি। দয়াল ঘোষ তড়িঘড়ি কাদায় নেমে ডিঙির কাছে এগিয়ে এলেন।

কাদায় হাঁটু অবধি ডুবে গেল দয়াল ঘোষের। পা টিপে টিপ কসরত করে নৌকোর উপরে উঠে পড়লেন। তারপর চারপাশে একবার তাকালেন, লোকগুলো স্তব্ধ, ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আছে। গ্রাহ্য না করে ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়লেন দয়াল ঘোষ।

—একি! চমকে পাথরের মতো নিরেট হয়ে গেলেন দয়াল ঘোষ। ঈশান! তুই এখানে?

ঈশান যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। ঘুরে তাকাল, ডিঙি ভাসিয়ে দেন দয়ালবাবু, কিন্তু চোখের সামনে মেয়েটাকে এভাবে মরতে দেব না। দরকার হয় নিজে মরব তবু ওকে বাঁচাব।

দয়াল ঘোষ দেখলেন, মেয়েটার কোনো ভাবান্তর নেই। ইস্, কী অবস্থা হয়েছে বেচারির। কোথাকার লোক জেনে নিয়েছিস তো ঈশান? কিছু বলেছে তোকে?

—জ্ঞানই হচ্ছে না যে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

—বেঁচে আছে তো? দয়াল ঘোষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। নাহ্, বুকের ওঠানামায় বুঝতে পারলেন, মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু রোগটা বড় ছোঁয়াচে রে। এভাবে তোর বসে বসে পাহারা দেওয়া কি ভাল হবে?

ঈশান পাল্টা কিছু বলতে গিয়েও বলল না। যেন মরতে হয় মরবে, তবু ডিঙি ছেড়ে ও নিচে নামবে না।

দয়াল ঘোষ যেন নাটক দেখছেন একটা। বাইরে মারমুখী জনাচল্লিশেক লোক। রজনী, মকবুল, বিশু···আর ভেতরে একা একটা মানুষ ঈশান। আর এই নাটকের মাঝখানে উনি দাঁড়িয়ে। একটা কিছু সিদ্ধান্ত ওঁকে এই মুহূর্তেই নিতে হবে। হয় ঈশানকে জোর করে ধরে ডিঙি থেকে নামিয়ে আনতে হবে, অথবা বাইরের মানুষগুলোকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

দয়াল ঘোষ ছইয়ের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, ডিঙিটাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখিস মকবুল, ডিঙির ভেতরটা শুধু একবার দেখে নিস।

দয়াল ঘোষ এরপর আবার ডিঙি থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন। তারপর আর অপেক্ষা করলেন না। কাছারিবাড়ির দিকে হনহন করে এগিয়ে গেলেন।

আর এতেই যেন কাজ হল। যারা নৌকো ঠেলবার জন্য এগিয়েছিল, তারা পলকেই হাত গুটিয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাইয়ি শুরু করল। আর ঠিক এই উত্তেজনার মুহূর্তেই ডিঙির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ঈশান। সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—হারামজাদা, তুই? চেঁচিয়ে উঠল রজনী।

পাল্টা চেঁচিয়ে উঠল ঈশান, খবরদার মুখ সামলে কথা বল। ঈশান কারো সঙ্গে হারামি করে নি। ঈশান যা ভাল বুঝেছে, তাই করেছে। যা ভাল বুঝবে, তাই করবে।

—তাই বলে—

আবার চেঁচিয়ে উঠল ঈশান, একটা মেয়েমানুষের ভয়েই তোমরা মরে যাচ্ছ, তোমাদের মুরোদ বোঝা আছে।

—তুই শেষপর্যন্ত মরবি হারামজাদা। নিজে তো মরবিই, আমাদেরও মারবি।

—মরি মরব। একটা মেয়ে মানুষকেই পারছ তোমরা ভাসিয়ে দিতে। এসো দেখি লড়বে আমার সঙ্গে। গলুইয়ের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়ে বুনো জন্তুর মতো থাবা পেতে গজরাতে শুরু করে ঈশান। অনেকটা যেন বাঘের মতো দৃষ্টি হয়েছে ওর। কারো উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যেটুকু সময়।

রজনীর গলার স্বর এতক্ষণ পর মিইয়ে এল, তুই তাহলে নামবি না বলছিস?

—না, নামব না।

ঠিক আছে, তাহলে রইল তোর নৌকো। দেখিস রজনীর কথা একদিন ফলে কি ফলে না। আগুন নিয়ে খেলছিস ঈশান, একদিন পুড়ে খাক হয়ে যাবি।

রজনী ভেড়ি থেকে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ গড়িয়ে এল আবার ভিড়ের মধ্যে। এক এক করে সবাই সরে গেল। জোয়ারের জল এখন তলা ছুঁয়েছে নৌকোর। ঈশান ধীরে ধীরে আবার ছইয়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। কিছুটা যেন ও নিশ্চিন্ত হল এতক্ষণে।

তিন

চৌধুরীদের লাটের একটা বিশেষত্ব আছে। একটাই দ্বীপ নিয়ে একখানা লাট। কাগজপত্রে যা পাওয়া যায় তাতে এর পরিমাণ প্রায় পঁচিশ হাজার একর। উত্তরে নদী, দক্ষিণে নদী, পুবেও, পশ্চিমেও। চতুর্দিকেই নদীর বেষ্টনী। আকৃতিতে অবশ্য শুয়োরের মুখের মতো, একদিকে অনেকটা ছুঁচলো, আর একদিকে চওড়া হতে হতে পাঁচ-সাত মাইলেরও বেশি ছড়িয়ে গেছে। এত বড় একটা দ্বীপ একসঙ্গে পাওয়া চৌধুরীদের সৌভাগ্য। চারপাশে নদীর বেষ্টনী থাকায় সীমারেখা নিয়ে ঝামেলা হওয়ার কারণ নেই। নদী যদি হেজেমজে দূরে সরে যায়, ডাঙা যদি বাড়ে, চৌধুরীদেরই লাভ। আবার নদী যদি কূল ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে ক্ষতি বৈকি। তবে ক্ষতির সম্ভাবনাটা কম। নদীর চারপাশে আট-দশ হাত উঁচু ভেড়ি। ভেড়ির একদিকে নদী থাকে নদীর মতো, অন্যদিকে অরণ্য থাকে অরণ্যের মতো। প্রধান নদী বলতে বুড়ো বাসুকি। এরই পলি জমে জমে সৃষ্টি হয়েছে দ্বীপখানা। নদী হয়তো একদিন মরে যাবে কিন্তু বেঁচে

থাকবে এই ডাঙা, যেমনভাবে গোটা দেশটাই আজ ভাঙা হয়ে আছে । মরে গেছে কত নদী, বাঁক বদলেছে কত নদী, কে অত হিসেব রাখে তার। ডাঙা আছে এই তো যথেষ্ট।

দ্বীপটার তিনপাশ দিয়ে মোচড় খেয়ে বুড়ো বাসুকি বয়ে গেছে। কেবল এক দিকে পড়েছে ধুলাই নদী। শীর্ণকায়া, অথচ জলের রং অবিকল চন্দনের মতো ঘোলা। ধুলাই নদীর চড়ার উপর কুমীর উঠে রোদ পোহায়। জনমানবের সাড়া পেলে সুড়ুৎ করে নেমে পড়ে জলে। কুমীর ছাড়া বিজবিজ করে কামট, ভুলেও তাই এ জলে কেউ হাত-পা ছোঁয়ায় না।

আরো আছে গোটাকয়েক ক্ষীণকায়া জলের রেখা, দ্বীপের ভেতরেই। এরা সবাই খালের মতো ছোট, জোয়ার খেলে, ভাঁটা খেলে। ধুলাই কিংবা বুড়ো বাসুকির উপনদী এরা। এদের মধ্যে তিনকুমারীই বড়। গভীরও বটে। তিন-কুমারী বয়ে এগিয়ে গেলে দু-এক মাইলের মধ্যেই নজরে পড়ে পুরনো কিছু নিদর্শন। হয়তো হার্মাদ কিংবা পর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রাচীন কুঠি ছিল ওগুলো। লোকে বলে ফিরিঙ্গি দেউল। বন সাফ করে অত দূর অবধি পৌঁছতে এখনো কতদিন লাগবে কে জানে। আসলে আবাদ তৈরীর কাজ যত সোজা ভাবা গিয়েছিল, তত সোজা যে নয় কার্যক্ষেত্রে তা বোঝা যাচ্ছে। অন্তত দয়াল ঘোষ তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছেন।

চৌধুরীদের ছোট ছেলে অর্থাৎ ছোটকর্তা বিষয়ী মানুষ। আবাদ করার কথা তাঁর মাথাতেই প্রথম জাগে। তিনিই প্রথম এ-ব্যাপারে নায়েবদের ডেকে খাতাপত্র তৈরি করান। পরে সদলবলে বজরা ভাসিয়ে দ্বীপটার চারদিকে একবার চক্কর দিয়ে দেখে যান। আজ যেখানে বন সাফ করে কাছারিবাড়িটা বসানো হয়েছে ঠিক তার সামনেই ছোটকর্তা একটা কাঠের বোর্ড টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন নিজের হাতে। সাইনবোর্ডে লেখা ছিল কেবল দুটি শব্দ, চৌধুরীর আবাদ। সাধ ছিল দু-এক মাসের মধ্যেই লোক লাগিয়ে বন সাফাইয়ের কাজ শুরু করে দেবেন। কিন্তু একটার পর একটা বাধা। দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর পার হয়ে গেল। পরে যখন সত্যি সত্যি বন কাটার কাজে লোক এল, তখন তারা তন্নতন্ন করে খুঁজেও সাইনবোর্ডটাকে বার করতে পারল না। ফলে, মোটামুটি ধরনের কাজ এগোবার পরই জাঁকজমক করে আবার একদিন নামকরণ করে নেওয়া হবে বলে ঠিক করা হল। দয়াল ঘোষ তাঁর অভিলাষ সে:রকমই জানিয়েছিলেন ছোটকর্তাকে। উত্তর এল, আপনি যা ভাল বুঝবেন সেই রকমই হবে। সব দায়িত্ব এখন আপনার। জানি, ওখানে

আপনাদের কষ্টের সীমা নেই, তবু মনে রাখবেন, চৌধুরী নগরের নায়েব হবেন আপনি। লোকে আপনাকেই চিনবে প্রথমে।

দয়াল ঘোষের সারা দেহে রোমাঞ্চ ধরে গিয়েছিল সেই চিঠি পেয়ে। কি এক গুপ্তধনের চাবিকাঠি যেন ওঁর হাতে তুলে দিয়ে কেউ বলছে, এই নাও, তোমায় দান করলাম এই দৌলত। তুমি এখন থেকে ভোগ কর।

দয়াল ঘোষ অবিবাহিত। ওঁর বাবা গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে ওঁর বাবার জুড়ি ছিল না চৌধুরীদের নায়েবমহলে। কিন্তু বাবার কাছ থেকে কিছুমাত্র সাহায্য পান নি দয়াল। নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রলোভনেই এই জঙ্গলে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন তিনি।

প্রথম যখন এখানে এসে পা দিলেন দয়াল ঘোষ তখনকার উত্তেজনার কথা ভুলবার নয়। জীবনে তখন একমাত্র কামনা খ্যাতি অর্জন আর সেই সঙ্গে কিছু অর্থ। খ্যাতি আর অর্থ একদিন না একদিন হবেই।

কিন্তু একটা মাস যেতে না যেতেই যে এত সব ঘটনা ঘটবে কে ভাবতে পেরেছিল। নৌকোয় যে মেয়েটাকে দেখে এলেন এরকম একটা দৃশ্যও যে দেখতে হবে কল্পনাও করা যায় না। ক্ষমতা থাকলে সর্বস্ব দিয়ে মেয়েটাকে উনি বাঁচাতেন। কিন্তু অবস্থাবিপাকে ইচ্ছাটাকে এখন দমাতে হচ্ছে। রজনীরা যা মারমুখী হয়ে রয়েছে তাতে হিত করতে গিয়ে বিপরীতই হয়ে যেতে পারে। সে দিক থেকে ঈশানের ওপরই ওর সমস্ত কৃতজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। কে বলে মানুষ নেই? এখনো আছে। মানুষের মতো মানুষ এখনো বেঁচে আছে।

উত্তেজনায় অনেকক্ষণ কাছারিঘরের মধ্যেই পায়চারি করলেন দয়াল ঘোষ। মেয়েটার করুণ মুখখানা ঘুরে ঘুরেই কেবল চোখের ওপর ভেসে উঠছে। কে ভাসিয়ে দিল ওকে! কেন! কেনই বা অমন নির্দয় হল ওর পরিজনরা! মায়ের দয়া তো কত মানুষেরই হয়, তাই বলে—

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন দয়াল ঘোষ। বনের দিকে তাকালেন, কাঠুরেদের কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। গাছকাটারও শব্দ আসছে অল্প-স্বল্প। অন্য দিন হলে এ সময় ওদের উল্লাসের অন্ত থাকত না। একদিকে জঙ্গলের চিৎকার অন্য দিকে ওদের উল্লাস।

কিন্তু আজ কেমন যেন বেসুরো।

উদাসীনভাবে একা হাঁটতে হাঁটতে দয়াল ঘোষ জঙ্গলের দিকে এগিয়ে এলেন। চিরসবুজ পাতার অরণ্য। গাছগাছালির জলসা; কোথাও কোথাও বুনো ফুলের রং ছড়িয়েছে। কোথাও বা গাছের কাণ্ডগুলি প্রতিযোগিতায়

আকাশের দিকে সটান উঁচু হয়ে উঠেছে। ভাবখানা এ রকম, যেন, কে বেশি আলো আর আকাশকে ছিনিয়ে নিতে পারবে নিজের মুঠোয়। কে কত বীরপুরুষের মতো সবার উপরে নিজেকে তুলে ধরে বেঁচে থাকতে পারে। অরণ্যের এই প্রকৃতি দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারেন না দয়াল ঘোষ। মনে পড়ে মানুষের অরণ্যেও এই একই প্রতিযোগিতা। কে কতখানি আকাশকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের সম্পত্তি করে রাখতে পারি তারই প্রতিযোগিতা। ভয় পেয়েছ? তবে বুনো লতাপাতার মতো মাটির কাছাকাছি অন্ধকারেই পড়ে থাক। তোমার অস্তিত্ব মাটির সঙ্গেই মিশে যাবে একদিন।

দয়াল ঘোষ আবার ভিন্নভাবেও ভাববার চেষ্টা করেন এই প্রকৃতিকে। কিছুটা যেন নিজেকে দিয়েই বিচার করার চেষ্টা, জন্মগত অধিকারের কথা মনে পড়ে যায় দয়াল ঘোষের। জন্মগত অধিকারই যদি না থাকবে তবে বাঘের পেটে বাঘই জন্মাবে কেন? আর হেলে কেউটের ডিম ফুটে হেলে কেউটেই বা বেরুবে কেন? দয়াল ঘোষের বাপ-ঠাকুর্দা যদি নায়েবি না করে জমিদারি করতেন, দয়াল ঘোষকেও নায়েবি করতে হত না কোনোদিন।

ফলে জন্মগত অধিকারের কথাটা উড়িয়ে দিতে পারেন না উনি। নিজের অক্ষমতাগুলি ওইভাবেই বুঝি ঢেকে রাখতে পারলে উনি খুশি হন।

অসংলগ্নভাবে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের ভিতর অনেক দূর অবধি এগিয়ে এসেছিলেন দয়াল ঘোষ। নিবিড় ছায়া জমে আছে চারপাশে। ছায়ার মাঝখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ডানা-ঝাপটানো পাখির মতো কিছু কিছু রোদ। অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করছে রোদের টুকরোগুলো। আর সেই সঙ্গে শীতল লতাপাতার গন্ধ। মাঝে মাঝে উদাস করে দেওয়া পাখির ডাক। কত নাম না জানা সব পাখি, কে জানে! এই অল্প দিনে সব জেনে ফেলাও সম্ভব নয়।

অথচ মনে পড়ল এখানে পা দিয়ে প্রথম ক'দিন এন্তার পাখি মেরেছিলেন। কত সব বিচিত্র পাখি। রজনীর কাছ থেকে দু-একটা পাখিকে উনি চিনে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। রজনী বুঝিয়েছিল, এই যে পাখিটা দেখছেন দয়ালবাবু, এর নাম কাস্তেচোরা। শুধু ফসলের সময়ই আবাদের মাটিতে এরা দল বেঁধে নেমে আসে। আর সারা বছর এরা বনেজঙ্গলেই ঘুরে বেড়ায়।

কাস্তেচোরা, বাহ্ চমৎকার নাম। চাষী কাস্তে নিয়ে ধানকাটার আগেই এরা ধান চুরি করে নিয়ে পালায়।

তা ঠোঁটদুটো ঠিক কাস্তের মতই দেখতে। হাতখানেক লম্বা, যেমন শক্ত তেমন ধারালো।

রজনী মানিকজোড় পাখিকে চিনিয়ে দিয়েছিল। জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায় পাখিগুলো। জোড় থেকে একটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, অপরটা পাগলের মতো কষ্ট পাবে। দাপাবে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও প্রিয়ার পাশে আকুলি-বিকুলি করে আছড়াবে।

পাখির দেশ সুন্দরবন। বক, শামুকখোল, জলহাঁস, তিতির, বুলবুল, জলকাক বিচিত্র সব পাখি। একটু কান পেতে পাখির ডাক লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন উনি।

পাখি ছাড়া গাছের ডালে পাতায় পোকা-মাকড়, পিঁপড়ে। হাত ছোঁয়াতেও গা শিরশির করে ওঠে। এ ছাড়া সাপ, গাছের ডালে ঝুরির মতো সাপ ঝুলে থাকাটাও অসম্ভব নয়। নিচে নরম নোনা মাটির ভাঁজে ভাঁজেও সাপ লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে! একটু বেসামাল হওয়ার উপায় নেই এই জঙ্গলে।

একদিন একটা হরিণ মেরেছিলেন দয়াল ঘোষ। চামড়াটা এখনো যত্ন করে তুলে রেখেছেন। নুনে ভিজিয়ে রোদে সেঁকে রেখে দিয়েছেন চামড়াটাকে। ছোটকর্তাকে নিজের হাতে উপহার দেওয়ার কথা ভেবে রেখেছেন। নিশ্চয়ই খুশিতে আটখানা হয়ে উঠবেন ছোটকর্তা।

দয়াল ঘোষ যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করেন এ সময়। কিন্তু দু-এক মুহূর্ত বুঝি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ আঁৎকে লাফিয়ে উঠলেন, কি ওগুলো! হৃৎপিণ্ডটাকে সজোরে কেউ যেন এসে চেপে ধরেছিল, চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, হাঁ করে বাতাস টানতে টানতে আবার উনি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন।

যাক বাবা, তেমন কিছু নয়, বানর, গাছের ডালে এক ঝাঁক বানর, কুতকুত করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অনায়াসে এখন ওগুলো তেড়ে আসতে পারে। খালি হাতে যতই শক্তি থাক দয়াল ঘোষের, ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। সারা গায়ে এই শীতের বেলাতেও ঘাম জড়িয়ে এল দয়াল ঘোষের।

বন্দুকটার কথা মনে পড়ল। বন্দুকটা রয়ে গেছে রজনীর হেপাজতে। কাঠুরেদের পাহারা দেবার জন্য রজনীকে সারাক্ষণ বন্দুক হাতে ওদের সঙ্গে থাকতে হয়।

দয়াল ঘোষ শান্তভাবে চোখ নামিয়ে নিলেন। হাতে বন্দুক থাকলে একবার শক্তি পরীক্ষা করে দেখতে পারতেন, কিন্তু এখন সন্ধি ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। এমনভাবে চোখ নামালেন যেন দেখতেই পান নি ওদের! তারপর দু-পা এক-পা করে পিছিয়ে এলেন। কাঠ কাটার শব্দ আসছে যেদিক থেকে সেই দিকেই হাঁটতে শুরু করলেন।

জঙ্গলের ভিতরে বসে দয়াল ঘোষ বেলা বুঝতে পারছিলেন না। নদীতে টইটম্বুর জোয়ার। ডিঙির ভেতরে সতর্ক প্রহরীর মতো তাকিয়ে বসে আছে ঈশান। অচৈতন্য মেয়েটার সংজ্ঞা ফিরেছে কিনা কে জানে!

চার

গৌরীর জ্ঞান ফিরল অনেক বেলায়। যেন গুপ্ত কোনো সমুদ্রের তলায় এতক্ষণ তলিয়ে ছিল, এবার উঠে এল। অসহ্য যন্ত্রণা দেহকোষের ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিটি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিষাক্ত কীটের দংশন। মাথার চারপাশে অসহ্য চাপ, টনটন করা এক অনুভূতি। এটাই কী মৃত্যু-যন্ত্রণা! মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে কী মানুষ এরকম কষ্ট পায়! উহ্, মাগো—

জ্ঞান ফিরলেও জাগতিক স্পষ্টতার মধ্যে তখনো বুঝি নিজেকে স্থাপন করতে পারছিল না ও। কিছু চেতনা কিছু অবচেতনা এরই মাঝে যেন দুলছিল গৌরী। মাঝে মাঝে ক্ষীণভাবে ঢেউয়ের মতো গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসছে ওর জন্মভূমি গ্রামের স্মৃতি। বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বিত্তাপুরী। গ্রামের প্রতিটি ঘরদোর যেন চিনতে পারছিল ও। খড়ের ছাউনি, মাটির দেওয়াল, নিকোন উঠোনের একপাশে সন্ধ্যামালতী ফুটে আছে। পুবে, গ্রামের শেষ প্রান্তে শিবমন্দির। পূজারী ভোলা ভটচায খড়ম-পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হলুদ রঙের মিষ্টি একটা পাখি লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে। সব এখন চিনতে পারছিল গৌরী।

কত শান্ত আর স্নিগ্ধ মনে হচ্ছিল বিত্তাপুরীকে। অথচ এরকম একটা গ্রামে যে ওর জন্ম হয়েছিল ভাবতেও এখন কষ্ট হয়। জন্মক্ষণে কী শাঁখ বাজিয়েছিল কেউ! গ্রামসুদ্ধ লোক কী উজাড় হয়ে ছুটে এসেছিল ওকে দেখতে! যাই ঘটে থাক না কেন, এই গ্রামেই ও জন্মেছিল। মায়ের কোলে ঘুমন্ত একটা শিশুমুখকে যেন ও দেখতে পাচ্ছিস। যেন নিজেরই শৈশবকে এখন চিনতে পারছিল গৌরী।

কিন্তু মায়ের মুখখানা ঝাপসা। বাবার মুখও। গৌরীর বয়স যখন ছ'সাত বছর তখনই ওর পিতৃবিয়োগ হয়। মা ছিলেন বিদুষী মহিলা। সামান্য কিছু যা জমিজমা ছিল, মা-ই তা দেখাশোনা করতেন। গৌরী-অন্ত-প্রাণ ছিল ওর মায়ের। কিন্তু এখন!

চিৎকার করে ক্ষোভে কেঁদে উঠবে এমন শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছিল গৌরী। অনেক কষ্টে ও চোখের পাতাদুটো আবার একটু ফাঁক করল। কিন্তু এ কোথায় ও পড়ে আছে। চারপাশে এসব কী দেখছে গৌরী। ওকে ঘিরে

কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। মুখগুলি কেমন ছায়া ছায়া। চিনবার চেষ্টা করল সবাইকে, পারল না। পরিচিত না অপরিচিত ওরা! মনে হল গ্রামের লোকগুলিই যেন খবর পেয়ে ছুটে এসে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে কেউ কেউ।

অথচ এদের মধ্যে নিমাইকে ও দেখতে পেল না। নিমাই কী সত্যি সত্যি ওকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল! তবে কী এই লোকগুলি সবাই মিলে এখন ওর মৃত্যুর জন্মই অপেক্ষা করছে। কেন, এমন করে ওরা দাঁড়িয়ে আছে কেন?

—মা, মাগো—, শিশুর মতো ডুকরে উঠল গৌরী।

অরণ্যের ডালেপাতায় এক ঝলক বাতাস হুহু করে বয়ে গেল। দানব ভর করেছে চতুর্দিকে। যেন গৌরীর দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে ওরা।

—একটু জল। মাগো—

এমন সময় কে যেন ওর কপালে হাত রাখল।

চমকে উঠল গৌরী। চোখদুটো টানটান করে খুলে একবার দেখবার চেষ্টা করল। সাপের মতো কিলবিল করা যন্ত্রণাগুলো যেন মুহূর্তের জন্ম স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কে হাত রাখল ওর কপালে! কালো পাথরের মতো কে এই লোকটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কে ও!

যেই হোক, শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, মানুষ তো। আজ কতদিন পরে যেন ও মানুষের মুখ দেখছে। আবেগে আর উত্তেজনায় আবার ও চোখ বুজল। তারপর অস্ফুট গলায় ও কঁকিয়ে উঠল, জল, একটু জল—

ঈশানের চোখ চিকচিক করে উঠল। মেয়েটার জ্ঞান ফিরে আসছে। জল চাইছে মেয়েটা। পায়ের কাছে শূন্য কুঁজোটা তখনো কাত হয়ে পড়ে আছে। কুঁজোর দিকে তাকাল ও। এখনি ওর কুঁজো ভরে জল নিয়ে আসা উচিত। আর সেই সঙ্গে খবরটাও সবাইকে জানান দরকার, জ্ঞান ফিরেছে মেয়েটার।

ঈশান উঠে কুঁজোটাকে হাতে নিল। তারপর গৌরীর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে বলল, দাঁড়াও মেয়ে, জল নিয়ে আসছি এখুনি।

ছইয়ের ভেতর থেকে এক নিমেষে বেরিয়ে এল ঈশান। বাইরে রোদ ঝলসাচ্ছে দুপুরের। এদিক ওদিক তাকাল, কাছারিবাড়ির দিকটা নির্জন। দা কুড়োল নিয়ে সবাই এখন জঙ্গলে ঢুকেছে। কিন্তু এখান থেকে জঙ্গলের দিকেও কাউকে নজরে পড়ল না। সব কেমন সামসুম ফাঁকা। দয়ালবাবুও কাছারি ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকেছেন কি না বুঝতে পারল না ঈশান। আপাতত এক কুঁজো জল এনে মেয়েটার মুখে দেওয়া উচিত। আর অপেক্ষা করল

না ও। কাদায় নেমে ছুটতে ছুটতে কাঠুরেদের ঝুপড়িঘরের পেছনে এসে দাঁড়াল।

নিশিকান্তরা কাঠ জালিয়ে রান্না করছিল। ওরা ভূত দেখার মতো ঈশানকে দেখে থমকে গেল।

ঈশান গ্রাহ্য করল না। ভালমন্দ একটা কথাও বলল না। কুঁজোতে জল ভরে নিয়ে যেরকম ব্যস্ততায় ছুটে এসেছিল, ঠিক সেইভাবেই আবার ডেড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল।

আবার ডিঙিতে এসে লাফিয়ে উঠল ঈশান। এই যে, জল নিয়ে এসেছি মেয়ে।

লক্ষ্য করল, মেয়েটা আধবোজা চোখে তাকিয়ে আছে। ঈশান জল তুলে মেয়েটার মুখে গড়িয়ে দিল। তারপর কাপড়ের খুঁট তুলে মুখ মুছিয়ে দিল ওর। গলার স্বরে আবেগ মিশিয়ে শুধাল, খুব কষ্ট হচ্ছে?

গৌরীর দৃষ্টিতে বিস্ময় ছাড়া কিছুই নেই। ঠোঁটজোড়া তিরতির করে কাঁপছিল, অথচ একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না ও।

মেয়েটা কথা বলতে পারছে না, এ দৃশ্য দেখা যায় না। অথচ ঈশানের কিছুই করার নেই। কিভাবে এই রুগীকে সেবাশুশ্রূষা করতে হয় ওর জানা নেই। হাজার মাথা কুটে মরলেও ডাক্তার-বদ্যি বা ওঝা যোগাড় করা যাবে না এখানে। কাঠুরেদের মধ্যে এমন কারো কথাই মনে পড়ল না যে টোটকা-টুটকি জানে।

আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে বসল ঈশান। মানুষ হয়ে আর-একজন মানুষের এই কষ্ট চোখে দেখা যায় না।

আবার শুধাল, কি নাম গো তোমার? কোথা থেকে আসছ?

গৌরীর চোখের তারা কেঁপে উঠল। যেন বোবা হয়ে গেছে ও। চোখের মণি বেয়ে কুলকুল করে জলের স্রোত নেমে এল।

—আচ্ছা, থাক থাক। এখন আর কিছুই বলতে হবে না। পরেই বলো। আবার ওর কপালে হাত রাখল ঈশান। বসন্তের গুটিগুলো নরম দানার মতো ওর হাতে লাগল। আগুনের মতো গরম হয়ে আছে গা। একটু কিছু পথ্যি আর ওষুধ না দিলে বাঁচবে না মেয়েটা। পথ্যি না হয় যোগাড় করে আনা যাবে, কিন্তু ওষুধ জুটবে কি ভাবে।

ঈশান ভুলে গেল, সর্বনাশা এক ছোঁয়াচে রুগীর সংস্পর্শে ও বসে আছে। মেয়েটার নিশ্বাসের কণায় কণায় ঘুরে বেড়াচ্ছে রোগজীবাণু। এই জীবাণুর

সংস্পর্শে এসে তরতাজা ফুলের কুঁড়িও শুকিয়ে যায়। এই ছোঁয়াচে রোগের কবলে পড়লে নিস্তার থাকে না কারো। হয়তো ঈশানেরও থাকবে না। তবু জীবনে বোধহয় এমনি একটা সময় আসে, যখন মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও মানুষ সে দিকেই পা বাড়ায়। কোনো বাধাই তাকে আর দমিয়ে রাখতে পারে না।

ঈশানের পক্ষে তাই নৌকো ছেড়ে এক পা নড়াও সম্ভব হল না। একটা অদ্ভুত আকর্ষণে ডিঙির মধ্যে নিজেকে অবিচল রাখল ঈশান।

জোয়ারে নদী এখন টুবুটুবু। কুচি কুচি জলের ঢেউ এসে ডিঙির গায়ে আঘাত করছে। একটু একটু দুলে উঠছে ডিঙিটা। গরুর বাঁটে বাছুর যেভাবে উৎসাহে চাট দেয়, নদীও যেন তেমনিভাবে হাজার হাজার জিহ্বা মেলে নৌকোর গায়ে চাট দিচ্ছে এখন। ডিঙিটা অল্প অল্প লাফিয়ে উঠছে। কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা গর্ব এই নাচুনির তালে তালে যেন প্রকাশ পাচ্ছে।

ঈশান আবার তাকাল ওর দিকে। মেয়েটা আবার চোখদুটো বন্ধ করেছে। কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিল ঈশান। মেয়েটার সঙ্গে জিনিসপত্র বলতে এমন কিছুই নেই। কাপড়ের পুঁটলিটার দিকে তাকাল ঈশান। খুলে দেখতে ইচ্ছে হল না। ওপাশে একটা উনোন, কিছু বাসনপত্র, হাতা কড়াই বঁটি। আবার চোখ সরিয়ে নিল।

হঠাৎই মনে হল ডিঙিটা যেন ডাঙা ছেড়ে আপন খেয়ালে চলতে শুরু করেছে। তবে কী গতির আনন্দেই ডিঙিটার এই দুলুনি। তবে কী মেয়েটার সঙ্গে ঈশানও অনিশ্চিত পথে ভাসতে শুরু করল! ছইয়ের ফাঁক গলিয়ে ঈশান দেখে নিল, নাহ, গেরাফিটা যথাস্থানেই গাঁথা আছে।

আসলে নকল একটা গতির মধ্যে যেন এগিয়ে চলেছিল ওরা। গতিটা নকল জেনে ঈশান নিশ্চিন্ত হল। মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। বসন্তের গুটিতে মুখের আসল চেহারাটা ঢাকা পড়ে গেলেও ঈশান বুঝতে পারছিল, মেয়েটা যথেষ্ট রূপসী। টানা টানা চোখ, চিবুক। কানে রুপোলি ঝুমকো, উঁচু ধারালো নাক। নাকের পাতায় পাথর-বসানো নোলক।

অথচ সিঁথিতে কোনো সিঁদুর দেখতে পেল না ও। মেয়েটা মুসলমান না হিন্দু তাও বোঝার উপায় নেই। বিবাহিতা না অবিবাহিতা। কেমন করে যে একা একা ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এসে এখানে আটকাল কে জানে! অথচ যতক্ষণ না ওর জ্ঞান হবে পুরোপুরি কোনো রহস্যেরই সমাধান হবে না।

আরো অনেকক্ষণ ও মেয়েটাকে আগলে বসে রইল। হঠাৎ এক সময় ও টের পেল, ওর হাতের মুঠির ওপর মেয়েটা হাত বিছিয়ে দিয়েছে।

ঈশান উত্তেজনায় ছটফট করে উঠল। দেখল, মেয়েটা পুরোপুরি চোখের পাতা খুলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করছে, ভীষণ ক্ষুধার্ত ও। অসম্ভব যন্ত্রণা ওর সর্বদেহে।

—খিদে পেয়েছে? ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল ঈশান। ঠিক আছে, আমি এখুনি খাবার নিয়ে আসছি।

উঠে দাঁড়াল ঈশান। তারপর নিমেষেই ও ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। মেয়েটা যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সন্দেহ নেই। খবরটা এখন চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে না দিতে পারলে ওর স্বস্তি নেই। অন্তত প্রথমেই উচিত ছুটে গিয়ে দয়ালবাবুকে খবরটা ওর জানান, জ্ঞান ফিরেছে দয়ালবাবু, এখনি ও কথা বলবে, দেখে যান, বিশ্বাস না হয় দেখে যান।

উত্তেজনায় ডিঙি থেকে ও লাফিয়ে নামল। তারপর হন্তদন্ত হয়ে কাছারি-বাড়ির দিকে দৌড়তে শুরু করল ঈশান।

পাঁচ

সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও ডিমের, কুসুমের মতো কিছু আলো ছড়িয়ে ছিল চার পাশে। সন্ধ্যা নামছে। পাখিরা সব ফিরে আসছে আশ্রয়ে। জঙ্গলের দিক থেকে ভূতুড়ে এক অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে কাছারির দিকে।

কাছারির বারান্দায় কাঠের একটা চেয়ার। চেয়ারে অলসভাবে বসেছিলেন দয়াল ঘোষ। ভেড়ির দিকে চার-পাঁচজন লোক কাঠের গুঁড়ি জড় করে আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত। কাছারির পেছন দিকে বনের কাছাকাছিও আগুন জ্বালান হয়। ওদিকেও হয়তো কেউ-না-কেউ আগুন জ্বালাত চলে গেছে। আগুন জ্বালিয়ে আসার কথা কাউকে মনে করিয়ে দিতে হয় না। আত্মরক্ষার এত বড় অস্ত্র আর বোধহয় দুটি নেই।

কাঠুরেদের ঝুপড়িঘরগুলোর পাশে কে যেন সারেঙ্গি নিয়ে বসেছে। শব্দটা শুনতে পাচ্ছিলেন দয়াল ঘোষ। আর একটু পরে একটা ঢোলের শব্দও শোনা যাবে। তারপর গভীর রাত অবধি বেতাল বেসুরো গান গাইবার চেষ্টা করবে কেউ কেউ। কয়েকজন তো পাঁড় মাতাল, ওদের গান-ফানের নেশা নেই, মত্তপ হয়ে অনেক রাত অবধি হৈ চৈ করবে এপাশে ওপাশে। প্রতিদিনই রাতে ওদের হুল্লোড় শুনতে পান দয়াল ঘোষ।

সারাদিনে আজ নামমাত্র কাজ হয়েছে। কাজের চেয়ে উত্তেজনা আর কথাই বেশি। প্রশ্নের আর শেষ নেই। একা একা ডিঙি করে যে এল, সে কী

কোনো উদ্দেশ্য না নিয়েই এসেছে! সে কী কেবলমাত্র তার মুখখানা দেখিয়েই চলে যাবে! অসম্ভব, এ রকম যদি ভেবে থাকো, ভুল ভাববে।

—কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে পারে?

—কি উদ্দেশ্য! রজনী এমনভাবে বুঝিয়েছে, যেন বিপদ-আপদ যা হওয়ার তা ত হয়েই গেছে। এখন আর কারো বাঁচার উপায় নেই।

এসব কথা শুনতে কারই বা ভাল লাগে। মুখগুলো কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। এ অবস্থায় জঙ্গল কাটার কথা আর মাথায় থাকে না। একটু খুলেই বল না রজনীভাই? উৎকণ্ঠায় সবাই ছেঁকে ধরেছিল রজনীকে।

রজনী আমতা আমতা করে বলেছিল, বলি কি করে! নুন খাই যার তার গুণ না গেয়ে কী উপায় থাকে? শুধু এইটুকুই বলতে পারি, যে কাজই করি না কেন, তার কতগুলি রীতি আছে। রীতি যে না মানে তার ওরকমই হয়।

—কি রকম?

—একটু খোলাখুলি বলছ না কেন রজনীভাই? আমরা সব মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। প্রাণ খোয়াব শেষটায়।

রজনী বলল, তার আগে তোদের সবাইকে একটা প্রশ্ন করি, আচ্ছা এই যে তোরা কুড়ুল নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বন পরিষ্কার করছিস, বল তো এই বনজঙ্গল কার?

—কার মানে! প্রশ্নটা কেমন রহস্যময়। তবু একজন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, কেন, চৌধুরীদের।

—ওই রকম জানলেই হয়েছে আর কি! ঐজন্যই তোরা আজ এখানে এসে এত কষ্ট সহ্য করছিস।

সবাই কেমন হকচকিয়ে গেল।

রজনী বলল, আমি জানতুম আসলে এ বনজঙ্গল যার তার কথা তোরা বেমালুম ভুলে যাবি। এই বন, জঙ্গল, মাটি, আকাশ, এ সবই হচ্ছে বনবিবির। বনবিবিকে খুশি না করে বনের গায়ে আঘাত চালালে এ রকমই হয়।

বিশু মিঞা বলল, ডিঙিতে যে সত্যি সত্যি বনবিবি এসেছেন, আমরা বুঝছি কি করে?

—মেয়েটার যদি মুখ দেখতিস, তা হলেই বুঝতে পারতিস। আসলে ও ছদ্মবেশী।

—তবে ঈশান ওখানে থাকছে কি করে?

রজনী জ্ঞানবৃদ্ধের মতো তাকায়, বশ করেছে ওকে! বশ করা বুঝিস?

বশ করা না-বোঝার কোনো কারণ নেই। মকবুল মুখ খুলল, আর তোমার ধারণা যদি মিথ্যে হয় রজনীভাই ?

—তা হলে বাদা ছেড়ে নাকে খত দিতে দিতে চলে যাব।

এরপর আর অবিশ্বাস করার কিছুই থাকে না। তবু ঈশানই যেন কিছুটা উল্টো খাতে বয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রাখল ওদের মধ্যে। সন্দেহ নেই, যদি কিছু হয় ঈশানেরই হবে সবার আগে। আর যদি না হয়, ঈশানই প্রমাণ করে দেবে, রজনী ভুল।

সারেঙ্গী বাজাচ্ছিল জগন্নাথ। জগন্নাথকে ঘিরে ছোট্ট একটু জটলা। দয়াল ঘোষ দেখছিলেন, ওপাশে কাঠের ঝুপড়িগুলোর পাশে কাঠের উনোনে রান্না নিয়ে ব্যস্ত নিশিকান্তরা। উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা খুঁটি পোঁতা। মকবুল একটা পেট্রমাকস জ্বালিয়ে সেই খুঁটিতে ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। সকালবেলা ওই আলোর নিচে বিনবিন করবে পোকা, মৃত।

দয়াল ঘোষ ডাকলেন, মকবুল !

মকবুল আলো ঝুলিয়ে দিয়ে সারেঙ্গীর দিকে এগোচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল, আজ্ঞে।

—এদিকে আয় ! রজনী কোথায় রে ?

মকবুল এগিয়ে এল, এদিকেই কোথাও আছে হয়তো।

সারাটি দিন তো আজ মুখ গোমড়া করে কাটালি। কেবল গুজগুজ আর ফুসফুস। কি যে আমি অন্যায় করেছি কে জানে।

মকবুল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

—তা, এই সন্ধ্যেবেলাটাও কি ভূতের মতো কাটাতে চাইছিস ? এই—

মকবুল চোখ তুলে তাকাল।

—আমি বলছিলাম, জগন্নাথকে ডাক না। এই দাওয়ায় বসেই জমিয়ে গানবাজনা হোক। রোজ যেমন হয়।

মকবুল গান-বাজার ব্যাপারে বরাবরই উৎসাহী। সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি ওদের এক্ষুনি ডেকে আনছি আজ্ঞে।

—তাই আন। একা একা আর কতক্ষণ ভাল লাগে বল তো !

মকবুল সাদা-সিধে মানুষ। জগন্নাথকে টানতে টানতে নিয়ে এসে হাজির হল। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি হাজির হল অনেকেই। বেঁটে চৈতন্য আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা গাঁজা টেনে গড়াগড়ি যাচ্ছিল একটা ঘরে, মকবুল এগিয়ে এসে হুমকি ছাড়ল, এই শালারা, ওঠ। গান-বাজনা হবে। আয়।

—কে গাইবে ? হি হি করে হাসল বেঁটে চৈতন্য।

মকবুল বলল, উঠে আয়, দেখতে পাবি।

যতীনরা সূর্য ডোবার আগে থেকেই পচাই গিলতে শুরু করেছিল, টলতে টলতে এগিয়ে এল, গান-ফান করে কি লাভ! তার চে এসে আমাদের সঙ্গে বসে পড় দেখি! এস।

মকবুল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে এল।

দয়াল ঘোষ একপাশে একটু জায়গা দিয়ে সরে বসলেন।

গোলপাতা বিছিয়ে তার উপর বসে পড়েছে জগন্নাথ। সারেঙ্গীটার দুর্দশার আর অন্ত নেই। তবু ওই যন্ত্রটা থেকেই আশ্চর্য সুন্দর একটা শব্দ বেরুচ্ছে। একটা ড্যাপঢেপে ঢোল নিয়ে বসেছে প্রাণকেষ্ট। মকবুল এগিয়ে এল।

দয়াল ঘোষ বললেন, রজনীকে দেখছি না ? রজনী কোথায় ?

রজনীর দেখা পাওয়া গেল আরো কিছুক্ষণ পরে। ভেড়ির কাছে আগুনের ধারে ঘুরঘুর করছিল রজনী। ধীরজ চালে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল।

দয়াল ঘোষ বললেন, একা একা এই সন্ধ্যেবেলা ঘুরে বেড়ানটা কি ভাল হচ্ছে রজনী ?

রজনী চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করল। দয়াল ঘোষ চটলেন না। পরিস্থিতিটা সহজ করার জন্য হেসে বললেন, অত ব্যাজার মুখে থাকার কি হয়েছে ? যদি কিছু অন্যায় করে থাকি সরাসরি বল না। তা ছাড়া নৌকোটাকে আমি আটকে রাখি নি। তোরাই আটকেছিস!

রজনী এবার উত্তর না দিয়ে পারল না, আমরা নই, ঈশান।

—হোক ঈশান। আমি বলি নি ঈশানকে। ঈশানের বিবেক আছে, ও জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে।

নৌকোর প্রসঙ্গ আসায় সারেঙ্গীটা থেমে গেল। সবাই নতুন কিছু শোনার জন্য যেন থমকে গেছে। খানিকক্ষণ শব্দহীন স্তব্ধ অবস্থা।

মকবুলই কথা বলে আবার যেন সচল করল সবাইকে, একটা কথা বলব দয়ালবাবু ?

—আলবাত বলবি! মনের মধ্যে গুমরে না মরে, যা বলতে চাস খোলাখুলি বল।

—আজ্ঞে, আমাদের সবার ইচ্ছে বনবিবির একটা পুজো হোক।

—হ্যাঁ দয়ালবাবু, বনদেবীকে পুজো না করলে আমাদের কারো মঙ্গল হবে না।

দয়াল ঘোষ মুখগুলির দিকে তাকালেন। অন্ধকারে রহস্যময় সব দৃষ্টি। পোড়খাওয়া। হেসে বললেন, বেশ তো, সবাই চাইলে হবে বই কি।

রজনী বলল, সবাই চাক না চাক, বনদেবীর পুজো না করে বনের ভিতর ঢোকাই আমাদের অন্যায় হয়েছে।

—বললাম তো, হবে পুজো। আমি কালই কলকাতায় খবর পাঠাচ্ছি। জবাব এলেই ঘটা করে পুজো হবে।

লোকগুলোর মধ্যে গুনগুন করে রব উঠল। দয়াল ঘোষও যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। এতক্ষণ যেন হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল লোকগুলি, আবার উনি মুঠোর মধ্যে তুলে নিতে পেরেছেন।

সারেঙ্গীতে আবার ছড় বোলাতে শুরু করল জগন্নাথ। কে যেন বেসুরো গলায় গানের একটা কলি টেনে বসল, ও চামেলী, জুঁই শেফালি—

কিন্তু গায়ক নয় বলেই হঠাৎ থেমে গিয়ে হেসে উঠল।

বেঁটে চৈতন্য টলতে টলতে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কোমর দোলা দিয়ে এক পাক নেচে উঠল, চালাও পানসী—

মকবুলের বেশ মজা লাগল। সন্ধ্যাটা একটু একটু করে এবার থেকে জমতে শুরু করবে। বনদেবীর পুজো করলেই যদি মঙ্গল হয়, আর তাতেও যখন আপত্তি নেই দয়াল ঘোষের, তখন আর ভাবনা কি! রজনীর দিকে তাকাল। রজনী একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়েছে।

—তা হলে একটা কাজ কর না। দয়াল ঘোষ রজনীর দিকে তাকালেন।

রজনী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, বলুন।

—বনদেবী সম্পর্কে গানটান জানা থাকে তো তাই হোক।

জগন্নাথ আবার একবার সারেঙ্গী থামাল, কেউ গাইতে জানলে তো গাইবে। সব শালা লবণ-চোর।

মকবুল উঠে দাঁড়াল, ঠিক আছে, আমিই গাইব।

ঢোল নিয়ে বসেছিল যে, সে ডুমডুম করে বার দুয়েক ঢোলে শব্দ করে প্রশ্ন করল, কি গাইবে?

—দেহতত্ত্ব গাইব।

—দেহতত্ত্ব। লোকটা আবার ডুমডুম করে দুবার শব্দ তুলল ঢোলে, দেহতত্ত্ব।

মকবুল ওকে আমল দিল না। চোখ বুজল, তারপর বাঁ হাত কানে চেপে, ডান হাত ঈষৎ সামনে ছড়িয়ে গান ধরল,

প্রভু, তোমার আজব কারখানা

জলের ভেতর আগুন জ্বলে
জাহুই আটখানা।

হয়তো যথাযথ গানটি ওর মনে পড়ছিল না। এমনিভাবে দশজন লোকের সামনে একদিন ওকে গাইতে হবে জানলে পুরো গানটা ও শিখে রাখত। গানটি হঠাৎই যেন ওর মনে পড়ে গিয়েছিল, শুনেছিল এক বাউলের মুখে। একতারা বাজিয়ে লোকটা মনের আনন্দে গেয়ে গেয়ে হাঁটছিল। শুনতে শুনতে উদাস হয়ে গিয়েছিল মকবুল। তেমন করে গাইতে জানলে এই একখানা গানেই ও দয়াল ঘোষকে মাত করে দিতে পারত।

গানটাকে ও হাতড়াতে শুরু করল।

প্রভু তোমার আজব কারখানা
জলের ভিতর আগুন জ্বলে
জাহুই আটখানা।

—কি রকম জাহু, সেটা শোনাও? প্রাণকেষ্ট ঢোলে আবার কাঠির ছড়রা টানল।

কিছুতেই গানের পরের কথাগুলো মনে আনতে পাচ্ছিল না মকবুল। চর্চা না থাকলে যা হয়। হেসে মাঝখানে গান থামিয়ে দয়ালবাবুর দিকে তাকাল।

জগন্নাথ ঘাড় গুঁজে তখনো ছড় টেনে চলেছে সারেঙ্গীতে। অনেকটা ঘাড়-বিহীন শুয়োরের মতো মনে হচ্ছে ওকে। সমঝদার কেউ থাক আর নাই থাক, ওর নিজেরই খুব ভাল লাগছিল। খুব একটা খেমটা গোছের তালের বাজনায় ও মেতে উঠল।

ঢোলটা বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দীননাথ উঠে দাঁড়িয়ে ঢোল-আলাকে ধমকে উঠল, এটা হচ্ছে কি প্রাণকেষ্ট, ঢোল যে তোর চিংড়িমাছের মতো লাফাচ্ছে।

প্রাণকেষ্ট দমবার পাত্র নয়, হেসে ডুমডুম করে হুবার ঢোলে শব্দ তুলে দীননাথের দিকে তাকাল, এখন বুঝি তোমার গান হবে?

দীননাথ মূল গায়েনের মতো ভঙ্গি করল, তা তোর চেয়ে আমি খারাপ গাইব না।

—বটে বটে! প্রাণকেষ্ট উঠে দাঁড়াল ঢোল হাতে। তারপর ঢোলের গায়ে একবার কপাল ছোঁয়াল, দয়াল ঘোষের দিকে মাথা নিচু করে একবার প্রণাম জানাল। তারপর তিরিক্কি কবিয়ালের চুলির মতো সে শুরু করল, বলি ওহে

দীনু ওস্তাদ, ভারি তো গাইতে নেমেছ আসরে। এই অধম একটা প্রস্তাব রাখতে চায়। অনুমতি দাও তো বলি। ডুমডুম।

দীননাথ কেন, সবাই বুঝল, সভার মাঝে একটা প্রশ্ন রাখতে চায় প্রাণকেষ্ট। মকবুল বসে পড়ল। দেহতত্ত্বটার মাথা-মুণ্ডু ছাই আর কিছুই ওর মনে এল না।

দীননাথ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। সভার রীতি-নীতি মূল গায়েনরা যেভাবে মানে, সেইভাবেই ও পাকা ওস্তাদের মতো মুখ দিয়ে কেবল একটা শব্দ উচ্চারণ করল, হ্যাঁ। কি তোমার প্রস্তাব?

—বিচার করে দেখাও দেখি দীনু ওস্তাদ। ডুমডুম।

—হ্যাঁ।

—বিচার করে দেখান দেখি সভাসদ ভক্তবৃন্দ। ডুমডুম।

—হ্যাঁ।

—গণ্যমান্য সভাপতি।

—হ্যাঁ।

—বিচার কর সামান্য একটা প্রশ্ন, আকাশ মাটি চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র স্বর্গ মর্ত। প্রাণকেষ্ট আবার ডুমডুম করে শব্দ তুলে দীননাথের দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ।

সারেঙ্গীটা থেমে নেই। আবহ-সঙ্গীতের কাজ করে চলেছে। চোখে চোখে ফেটে পড়ছে কৌতুক। প্রাণকেষ্ট কি প্রস্তাব রাখতে চাইছে কে জানে! দয়াল ঘোষেরও আগ্রহের শেষ নেই। জায়গা বিশেষে দীননাথ, প্রাণকেষ্টর মতো লোকও যে মুখর হতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।

প্রাণকেষ্ট আবার শুরু করল, তা চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র স্বর্গমর্ত মিলে যে এই বিশ্বসংসার এর কি কোনো তুলনা আছে? ডুমডুম।

—নেই।

—এই যে বনের লতাপাতা ফুলফল এর কি কোনো তুলনা আছে?

—নেই।

—মানুষ, পশু, পাখি, পোকামাকড়, জীবজন্তু এর কি কোনো তুলনা আছে?

—নেই।

—এত সুন্দর এই যে পৃথিবী, এত সুন্দর যে ভুবন, এসব যিনি তৈরি করেছেন তিনি তবে কত সুন্দর? তার রূপ বর্ণনা কর দেখি দীনু ওস্তাদ। বুঝব তোমার ক্ষমতা।

ডুডুম ডুডুম, ডুডুম ডুডুম—বসে পড়ল প্রাণকেষ্ট। হাঁপাতে শুরু করল।

সারেঙ্গীর শব্দটা আবার গাঁকগাঁক করে উঠল। এখন সভার রীতি অনুযায়ী কিছুক্ষণ বাজনা হবে। বাজনার গমকটা থামলে দীননাথকে মহান সৃষ্টি-কর্তার রূপের বর্ণনা শুরু করতে হবে। যুগ যুগ ধরে মুনি-ঋষিরা যাঁর স্তুতি গান গেয়ে শেষ করতে পারেনি, দীননাথের মতো অতি সামান্য একজন লোককে এখন সেই কাজটিই করতে হবে। কিছুটা যেন সমস্যাতেই পড়ে গেল দীননাথ। কিভাবে শুরু করতে হয় জানা নেই, কিন্তু আসরে যখন দাঁড়িয়েছে তখন পালিয়েও যাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কিছু পাঁচালি কথাও আওড়াতে শুরু করল মনে মনে : কি দিয়া পূজিব রাঙা চরণ তোমার।

দয়াল ঘোষ সামনের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। ভেড়ির গায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলি গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। আগুনের ফুলকিগুলো উড়তে উড়তে কাছারিবাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। আগুনটা যেন সম্মোহন করছিল দয়াল ঘোষকে। এমন সময় ক্ষীণ গানের কলি কানে আসতেই দীননাথের দিকে তাকালেন উনি। আগুন থেকে চোখ তুলে আনায় চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেল। বিচিত্র এক রঙিন মানুষের মতো দীননাথকে নেচেকুঁদে গান গাইতে দেখলেন উনি।

কি দিয়ে পূজিব রাঙা চরণ তোমার
গগনেতে জ্বলিতেছে দীপ উপচার।
তুলসী দিয়া পূজিব যে
আছে কি উপায়
কাঠিপোকায় দিবারাত্রি
কুরে কুরে খায়।
পুষ্প দিয়া পূজিব যে
আছে কি উপায়
ভোমরা হেন অবোধ যত
ডংশি দিয়া যায়।

দয়াল ঘোষ আবার চোখ তুলে আনলেন আগুনের দিকে। লকলকে জিহ্বা ছড়িয়ে আগুনের আস্ফালন কত!

দূর্বা দিয়া পূজিব যে
মানুষ হেঁটে যায়
দুগ্ধ দিয়া পূজিব যে
বাছুর আগে খায়।

সারেঙ্গীর শব্দটা সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে গলে গলে পড়ছে। মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে উঠছিলেন দয়াল ঘোষ। প্রাণকেষ্ট ঢোলের কাঠিতে যেন তাল রাখতে পারছে না। কিন্তু দমবার পাত্র নয়, তাল সামলে নিচ্ছে। রজনী তখনো কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে, যেন ঝিমুচ্ছে। মকবুল তাল ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে তালি কষে হাঁহুঁ শব্দ করছে। গানের কথাগুলো জব্বর মনে লাগছিল ওর।

দয়াল ঘোষ আবার চোখ ফেরালেন। প্রথমে দীননাথের দিকে, ঝাপসা। হলুদ ছোপ ছোপ চোখের কিছু ভ্রম।

ভ্রমই কি! নিঃসন্দেহ হবার জন্য জঙ্গলের দিকে তাকালেন। আর আশ্চর্য জঙ্গলের ভিতরে খানিকটা জায়গা জুড়ে বেশ ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। অথচ জ্যোৎস্না থাকার কথা নয়। জ্যোৎস্না কেবলমাত্র ঐটুকু জায়গাতেই গড়িয়ে পড়ার কথা নয়। সারা দেহে কেমন এক শিহরণ খেলে গেল। দৃষ্টি ফেরাতে ভয় হল। ভয় হল, একটু নড়াচড়া করলেই যেন এই জ্যোতিটুকু চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাবে। চোখ ফেরাতে পারলেন না।

সমস্ত ইন্দ্রিয়কে এখন তীক্ষ্ণ করে ঐ জ্যোতির দিকে নিবদ্ধ রাখলেন। আর আশ্চর্য মনে হতে লাগল, যেন বহুদূর থেকে ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে। আরতির কাঁসরঘণ্টা। মনে হতে লাগল, ধূপে ধুনোয় ষোড়শ উপচারের পবিত্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ওকে ঘিরে। আরাধ্য কোনো দেবীর পূজার আয়োজন চলেছে যেন কোথাও।

কোন সে দেবী! শিহরিত হচ্ছিলেন দয়াল ঘোষ। চোখের পলক ফেলতেও ভয়, মুহূর্তেই যেন হারিয়ে যাবেন উনি।

ঢাকের কাঠিতে ধুম উঠছে। ধূপের গন্ধে অনাবিল এক বিশুদ্ধতা।

সহসা মানুষের সমস্ত বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বে এক অনির্বচনীয় ঘটনার সূত্রপাত।

দয়াল ঘোষ দেখলেন, এক শুভ্রবসনা দেবীমূর্তি। জ্যোতির্ময়ী। মাথায় হীরকখচিত টোপর। গলায় গোলাপের মালা। ধীরে ধীরে হেঁটে আবার চন্দ্রালোকের ভিতর দিয়ে মিলিয়ে গেলেন।

স্থির থাকতে পারলেন না দয়াল ঘোষ। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়ালেন। ককিয়ে উঠলেন মা মা করে। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটতে শুরু করলেন জঙ্গলের দিকে।

সারেঙ্গী থেমে গেল। ঢোল সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল প্রাণকেষ্ট। দীননাথ অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে চমকে লাফিয়ে উঠল, কি, কি হয়েছে?

রজনী আরো ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে দৌড়ে এসে দয়াল ঘোষকে জড়িয়ে ধরল, কি, কি হয়েছে? কি ওদিকে?

ধীরে ধীরে হাত-পা কেমন অবশ হয়ে এল। দয়াল ঘোষ আবার স্বাভাবিক হতে হতে রজনীর দিকে তাকালেন।

—কি হয়েছে দয়ালবাবু? মা মা করে কাকে ডাকছিলেন?

দয়াল ঘোষ অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে পারলেন না। সত্যি সত্যি কি এক অপরূপ দৃশ্য দেখলেন উনি কয়েক মুহূর্ত আগে। এখন জঙ্গলের দিকে আবার নিঃসীম অন্ধকার। অথচ ওই অন্ধকারের মাঝেই কি মনোহর জ্যোৎস্না! কেমন আবার গুটিয়ে এলেন উনি।

—না, কিছু না। হঠাৎ কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।

রজনী তবু সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

দয়াল ঘোষ বললেন, চল। আয়। কিছু না।

ছয়

সারাটি রাত্রি ধরে ঈশান নৌকোতেই কাটাল। ঘুম হল না। ঘুমোবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। সারাটা রাত কেবল ছইয়ের ভেতর-বার করল। ছইয়ের বাইরে প্রচণ্ড হিম, ভিতরে নিস্তব্ধ বিভীষিকা। শীত যেন নগ্ন হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঈশানের সর্ব দেহে হিংস্রভাবে দাঁত বসিয়ে দিচ্ছিল এই শীত। তবু মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে সব কিছুই সহ্য করার ক্ষমতা পেয়ে যাচ্ছিল ঈশান। কাঁথা কম্বলে কতটুকুই বা শীত কমত, ভিতরের উত্তেজনাই ওকে ভুলিয়ে রেখেছিল শীতের প্রচণ্ডতা।

এখন কার্তিক মাসের মাঝামাঝি, হিম পড়াটাই স্বাভাবিক। সামনের পৌষ কিংবা মাঘে কি যে অবস্থা হবে কে জানে! পৌষ কিংবা মাঘের কথা ভাববার এখন অবসর নেই। আপাতত হিমের হাত থেকে বাঁচবার জন্ত ছইয়ের ফাঁক ফোকরে শুকনো গোলপাতা গুঁজে দিল ঈশান। ভেড়ির ওপাশে আগুন জ্বালিয়ে রেখে গেছে ওরা, বিড়ি ধরাবার জন্ত বার দুয়েক ঐ আগুনের কাছে যেতে হয়েছিল। গায়ে পিঠে তাপ পোহাতে কি আরাম। আবার ফিরে এসেছিল নৌকায়। এত নির্জনতার মধ্যে নৌকা ছেড়ে একা একা ওর ভেড়িতে ওঠাটা উচিত নয়। দয়াল ঘোষ দেখলে মুখ খিঁচিয়ে খিস্তি করে উঠতেন। তবু ভাল কাছারিবাড়িটা এখন ভূতে-পাওয়া থমথমে। জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। উঠোনের মাঝখানে রোজকার মতো আজও পেট্রম্যাকস্

জলছে। কাঠুরেদের ডেরাগুলো গায়গায় জড়াজড়ি করা। কে বলবে ওগুলোর ভেতরে একগাদা লোক এখন ঘুমুচ্ছে। বাঘ পড়লে কিংবা অন্ত কোন বিপদ হলে লাঠি-সোঁটা নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে আসবে সবাই।

ঈশান লক্ষ্য করেছে, প্রথম রাতে কাছারিবাড়ির বারান্দায় গানের আসর বসেছিল। মাঝে মাঝে উঁচু গলায় হাসাহাসি, চিৎকার কিছু কিছু কানে এসেছিল ওর। অথচ গাইয়ে বলতে একজনও নেই। জগন্নাথের কথা ভাবতে বেশ মজা পায় ও, গান জানে না, অথচ একটা সারেঙ্গী আজীবন সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। সারেঙ্গীতে ছড় ঘষতে সারেঙ্গীআলা হয়ে উঠেছে। ঢোলটা যে কে সঙ্গে করে এনেছিল মনে পড়ে না। যেই এনে থাক, ওটা যে পায় সেই পেটায়। ঢোল পেটানোর মতো সহজ কাজ পৃথিবীতে বোধহয় দ্বিতীয়টি আর নেই। একদিন মনের আনন্দে ঈশানও ঢোলটাকে পিটিয়ে নিয়েছিল খুব। তারপর সুখকর কোনো বোল তৈরি করতে না পারায় হেসে ঢোলটাকে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলেছিল. কি ঢোল রে বাবা, ঢ্যাপঢ্যাপ ছাড়া শব্দই বেরুতে চায় না।

মকবুল রঙ্গ করে বলেছিল, হাঁটতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

ঈশান দমবার পাত্র ছিল না। বলেছিল, তার মানে ঢোলের দোষ দেখতে চাও না, যত দোষ সব নন্দ ঘোষের।

মিছিমিছি গায়ে পড়ে তর্ক শুরু করে দিয়েছিল ঈশান। এখন সে-কথা ভাবতে বেশ মজা পাচ্ছিল। কিন্তু মানুষের ভাবনারও বুঝি একটা শেষ আছে। কেমন অবসাদ এসে ওকে ঘিরে ধরছিল। ছইয়ের তেতর হারিকেন জলছে। হারিকেনে তেল ছিল না। রজনীর চোখে ফাঁকি দিয়ে একটু কেরোসিন ও চেয়ে এনেছিল নিশিকান্তর কাছ থেকে। প্রথম রাতেই ডিঙির ভেতরটা ঝেড়ে-পুঁছে পরিষ্কার করে নিয়েছিল ও। কুঁজোয় মিষ্টি জল ভরে এনেছিল। গৌরীর জন্ত কিছু খাবার আনতেও ঝামেলা হয়নি।

এরপর থেকে আর কিছুই করার ছিল না। গৌরীকে শুধু বসে বসে পাহারা দেওয়া। কখনো কখনো ছইয়ের ভিতরেই বসে কাটাল ও, কখনো আবার বেরিয়ে এসে গলুইয়ে। শুধু আলসেমি। বাইরে গলুইয়ের উপর মাথা রেখে এলিয়ে শুয়ে আকাশের নক্ষত্র দেখল ঈশান।

নক্ষত্রগুলি যেন ইন্দ্রজাল জানে। গভীর স্তব্ধতার মধ্যে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলে হাজারো কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় হাজারো স্মৃতি। স্মৃতির বুদবুদের মধ্যে যেন হারিয়ে যেতে শুরু করেছিল ঈশান।

ঈশানের মনে পড়ল কাকদ্বীপের কথা। যতটুকু ও জানে, কোন এক দুর্ভিক্ষের দিনে জন্ম হয়েছিল ওর। প্রচণ্ড খরার সময় চলছিল সে-বছর। ধান-পান পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে কেবল হা-বৃষ্টি হা-বৃষ্টি কান্না। ভগবান মুখ তুলে চাইলেন না। এমনিতেই নিজেদের এক কানাকড়ি জমি ছিল না, পরের জমি চাষ করে দিন গুজরান করত ওর বাবা। সে-বছর ঘটিবাটি বিক্রি করেও রেহাই পেল না। বাস্তু-জমিটাকে বেণু মাইতির কাছে বন্ধক রেখেও না। মাকে রাখনি রাখল বেণু মাইতি। বাবা বোধকরি মাথার ঘায়ে পাগল হয়ে ঘাসজলা মাঠের কোনো জায়গায় উলটি করতে করতে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

মায়ের মুখেই এসব কাহিনী ওর শোনা। জন্ম হয়েছিল ওর বাবার মৃত্যুর বছর দুয়েক পরে। মা কখনো ভেঙে বলেনি বেণু মাইতিই ওর প্রকৃত জন্মদাতা কিনা। বলেনি, কেমন করে পূর্ব স্বামীকে ছেড়ে এসে বেণু মাইতির আদরের ধন হয়েছিল ওর মা।

ঈশান ঘৃণায় ছোট হয়ে যায়। হায়রে দুর্ভিক্ষ! দুর্ভিক্ষ যদি সজীব কোনো ফসল দিয়ে থাকে তা হলে সে ঈশানই। একটু বোঝবার মতো বয়স হলে মাকে ছেড়ে ও বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

আর আজ পাক্কা এককুড়ি বছর পার হয়ে গেল, মায়ের কোনো খবরই রাখে না ঈশান। কোনো খবরই রাখে না আর কাকদ্বীপের।

অথচ আজ সারাক্ষণ নৌকোয় বসে বসে মায়ের মুখটাই চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর। কি জানি, কেমন আছে ওর মা। কে বলবে, এতদিন পরেও ওর মা বেঁচে আছে কিনা। বেণু মাইতি এখনো কি চোখের মণি করে রেখেছে ওর মাকে! নাকি, ওর বাবার মতোই পরিণতি হয়েছে ওর মায়ের।

বুকের ভেতর কেমন যেন হু-হু করে ওঠে। মাকে একবার কাছে পেলে দু-চোখ ভরে দেখত ঈশান। নিচু জাতের ঘরে অমন সুন্দরী মহিলা যে কিভাবে জন্ম নিল কে জানে! হ্যাঁ, অপরূপ সুন্দরী ছিল ওর মা। যেমন রং, তেমন গড়ন। কে বলবে ঈশান মায়ের ছাপ পেয়েছে কতটুকু। কষ্টিপাথরের মতো কালো গায়ের রং ঈশানের। আর চোখমুখ? কি জানি, মায়ের মতোই হয়েছে কিনা!

ঈশান নিজের মুখের উপর দু-হাতের চেটো বিছিয়ে ছাপ তুলে আনতে চায় মুখের। ছেলের মুখে মায়ের মুখের আদল থাকবে, বেশি কি!

ঈশান যখন কাকদ্বীপ ছেড়ে পালাল তখন ওর বয়স হবে সাত কি আট।

ব্যাপারীদের নৌকোয় উঠে বসেছিল ও। রঘু পানের নেকনজরে পড়ে গিয়েছিল ঈশান।

রঘু নৌকোয় বসে মসলা পিষছিল, শুধাল, এইছোঁড়া কোথায় থাকিস রে?

ঈশান আঙুল চুষতে চুষতে উত্তর দিয়েছিল, কোথাও না। যখন যেখানে থাকার জায়গা মেলে।

—বটে! তোর বাপ নেই? মা নেই?

—না, কিচ্ছু নেই। সবাই মরে গেছে।

—মরে গেছে! কেমন যেন সন্দেহ হয় রঘুর। বাড়ি কোথায় তোর?

—বলেছি তো নেই।

—এখানে কি করছিস?

আবার আঙুল চুষতে চুষতে উত্তর দিয়েছিল ঈশান, আমি ভাল মসলা পিষতে পারি।

রঘু এক পলক দেখলে ঈশানকে। তারপর বলল, আয়, উঠে আয়। খেয়েছিস কিছু?

তিন লাফে নৌকায় উঠে এসেছিল ঈশান। তারপর শুরু হয়েছিল ওর নৌকোয় নৌকোয় ঘোরা।

রঘুর পা দাবিয়ে দিত ও। মাথার কাছে বসে যত্ন করে পাকা চুল বেছে দিত। নৌকোর দাঁড় বাওয়া থেকে শুরু করে, কখনো কখনো রান্না অবধি করতে হত ওকে। আর গায় গতরে বাতাস লাগতে শুরু করল ঈশানের, গোঁফের রেখা পড়ল, কব্জীতে ধরল বল। ইচ্ছে করলে একাই যেন নৌকো ঠেলে তুলতে পারে ডাঙায়। বুড়ো রঘু অবাক না হয়ে পারে না, ছেলেটাকে কুড়িয়ে তুলেছিল নৌকোয়, চোখের সামনে কেমন মদ্দ জোয়ানটি হয়ে উঠল। ঈশানের ওপর কেমন এক ভরসা। নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না, ঈশানকেই ছেলের মতো ভাবতে শুরু করেছিল ও। কিন্তু এমন দিনে ভগবান আবার বিমুখ হলেন।

ক্যানিং বাজারের কাছে নৌকো ভিড়েছিল ওদের। দিন সাতেক থাকার কথা। ঈশানের মনে পড়ল, এই ক্যানিং বাজারেই আলাপ হয়েছিল ওর টুনি মুড়িআলীর সঙ্গে। মুড়ির বস্তা নিয়ে ওদের নৌকায় এসে উঠেছিল। রঘু ছিল না। ঈশান কি দেখেছিল মুড়িআলীর মধ্যে কে জানে। রসে মজল।

টুনি বলল, পিয়ালি চেন? সেই পিয়ালি থেকে এই ভারি বোঝা মাথায় বয়ে এসেছি, একটু মায়া হয় না?

—হবে না কেন? মুড়ি তো কিনলাম। পিয়ালি কতদূর এখান থেকে?

—কত আর, এক বেলার পথ। বাবুর যদি ইচ্ছে হয়, চল না আমার সঙ্গে, গ্রাম দেখিয়ে আনি।

ঈশানের বুকের ভেতর কেমন চনমন-করা উত্তেজনা। মুড়িঅলী ঠোঁট নেড়ে যা বলছে তার চেয়ে বেশি যেন ওর চোখ বলছে। চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। ঈশানের মনে হয়েছিল যেন পুড়ে খাক হয়ে যাবে ও।

—পিয়ালিতে আমাকে নিয়ে যাবে?

—যাব না কেন! এস, ওঠ দেখি!

—কিন্তু সাঁঝ নেমে আসছে। নৌকো এরকম খালি রেখে চলে যাব?

—যাবে! দোষ কি! এখানে চোর-ছ্যাঁচড় নেই যে চুরি করে নিয়ে পালাবে।

ঈশান রাজীই হয়ে গিয়েছিল। টুনির সঙ্গে রাত কাটিয়ে ভোর ভোর আবার পালাল। টুনির সঙ্গে রাত কাটিয়েছে তাতে কারো কিছুর বলার নেই, কিন্তু নৌকোটাকে খালি রেখে চলে এসেছিল, এটা যে অন্যায় করেছে তাতে সন্দেহ নেই। রঘু দা দিয়ে ওর গলায় একটা কোপও বসিয়ে দিতে পারে। ভোরবেলা ওর কি যে হল, আর ক্যানিংয়ের দিকে না এগিয়ে কলকাতার পথে হাঁটা ধরল।

সেই থেকে ওর একমাত্র আশ্রয় রঘুও হারিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে কলকাতাতেই ও ভবঘুরের মতো কাটিয়ে দিল কয়েকটা বছর। এই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে কেমন যেন আনমনা না হয়ে পারে না। নিজের ওপর ঘৃণাও জন্মায়, আবার আক্রোশও।

চৌধুরী রাজাদের সঙ্গে যোগাযোগটাও বড় অদ্ভুত। মনে পড়ল সেদিন সকাল থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টি আর মাঝে মাঝে লাগাম ছাড়া বাতাস। কলকাতার রাস্তায় সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগটা যেন আরো ঘনিয়ে উঠেছিল।

ঈশান একটা গাড়িবারান্দার নিচে স্থির হয়ে বসে বৃষ্টি আর এই আলো-অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখল, দূর থেকে একটা টমটম টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। সহিস তার চাবুক উড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে। কিন্তু কিছু দূর এগিয়েই গাড়ির চাকা কাদার মধ্যে ডুবে গেল। আটকে গেল টমটম। সহিস দুজন কাদায় নেমে হাজার চেষ্টাতেও আর ওঠাতে পারল না গাড়ি।

ঈশান কৌতুকে এগিয়ে এসেছিল। পরে সেও সহিসদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে টমটমের চাকার ওপর চাপ দিয়ে অসাধ্য সাধন করল।

ঘটনাটা সামান্যই। কিন্তু চৌধুরী রাজাদের নজরে পড়ে গেল ঈশান।

টমটমের জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন বড়কর্তা, কি নাম রে তোর ?

ঈশান মাথা নিচু করে উত্তর দিয়েছিল, আজ্ঞে ঈশান।

—কোথায় থাকা হয় ?

ঈশানের নির্দিষ্ট কোনো আস্তানা ছিল না। নীরবে মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়েছিল ও। বড়কর্তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ঈশানকে। অটুট স্বাস্থ্য, কিন্তু পেট পুরে দুবেলা খেতে পায় কিনা কে জানে। সঙ্গে ছিল রজনী। বড়কর্তা রজনীকে ইঙ্গিত করলেন, ঈশানকে সঙ্গে তুলে নিতে।

সেই থেকে ঈশান চৌধুরী রাজাদের দয়ায় চৌধুরীবাড়ির বাইরের মহলের কাজে লেগে গিয়েছিল।

বড়কর্তা আজ বেঁচে নেই। আজ ছোটকর্তার যুগ। ঈশান নির্বাসিত হল এই সুন্দরবনের জঙ্গলে।

সব দিক বিচার করলে সত্যি সত্যি বড় হতভাগ্য ঈশান। স্নেহ মমতায় কোনোদিন কোথাও বাঁধা পড়ল না। সংসারে আপনজন বলতে কাউকেই পায়নি ও।

বোধহয় এইসব সাতপাঁচ কারণেই ঈশানের চেহারায় রুক্ষতা বড় প্রকট। আর এ-রকম ছন্নছাড়া জীবন কাটিয়েছে বলেই বোধহয় এত নির্ভয় আর গোঁয়ার ও। ভয় নেই সাপে কাটায়, ভয় নেই বাঘে খাওয়ায়, কুমীর কামটের সঙ্গেও রোখ চাপলে লড়ে আসতে পারে।

জন্ম থেকেই সাহসী আর নির্ভয় হতে শিখেছে ও। ফলে সবাই যখন ডাইনী বলে মেয়েটাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত তখন সব ঝুঁকি নিজের কাঁধেই তুলে নিল ঈশান।

কিন্তু কী আশ্চর্য, চিরকাল যে বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু পায়নি, তার বুকে এত মমতা জমল কি করে! দশজনের মতো নিষ্ঠুর হয়ে ঈশানও তো বাঁচতে পারত পালিয়ে।

অসংখ্য অর্থহীন ভাবনার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল ঈশান। ক্রমে ক্রমে কুয়াশা এসে গ্রাস করে ফেলল ওকে। ডিঙিটাকেও। বাতাস অরণ্য নদী সব কিছুই গ্রাস করে ফেলল কুয়াশা। সব কিছুই স্থির নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছিল। আবার যতক্ষণ না সূর্য ওঠে, সব কিছু এইরকম যেন আচ্ছন্ন থাকবে। সমস্ত চরাচর এখন স্বপ্নের জগৎ।

ঈশান গলুয়ের ওপর পড়ে রইল স্থির হয়ে। শুয়ে আকাশের দিকে

তাকিয়ে রইল। নক্ষত্রগুলি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল মাঝে মাঝে। কুয়াশাই কেবল ঘুরছে। ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠছে কুয়াশা। ঈশানের যেন স্মৃতির ওপর ধূসর পর্দা বিছিয়ে ঢেকে দিতে চাইছে। ধীরে ধীরে অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ঈশান।

এক সময় ওর মনে হল, আকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি যেন ক্রমশ চারদিক থেকে ফেঁপেফুলে ছড়িয়ে যেতে যেতে প্রকাণ্ড একটা নক্ষত্রের চাঁদোয়া হয়ে ওর চোখের ওপর নেমেএল। চোখ বুজল ঈশান। কিছুক্ষণের মধ্যে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মধ্যে বার কয়েক ভীষণভাবে চমকে চমকে উঠল ও। বুড়োবাস্থকির বুকের ওপর শুশুক আর কামটের বিকট আস্ফালনের শব্দে অরণ্য যেভাবে চমকে চমকে ওঠে ঈশানও সেইভাবেই চমকে চমকে উঠল। হিমের স্পর্শে কুঁকড়ে কিয়ে পোকার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল। রাত্রি ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ভোরের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

আর এটুকু সময়ের মধ্যে নদীতে একবার জোয়ার একবার ভাঁটা খেলে গেল। নৌকোটা একবার জোয়ারের জলে ভাসল, আবার ভাঁটার টানে জল-বিহীন কাদার মধ্যে আটকে কাত হয়ে বসে গেল।

ছইয়ের ভিতরে হারিকেনের আলোটা কখন যে নিভে গেছে, খেয়ালই রইল না কারো। গৌরীর গলায় ঘ্যাসঘ্যাস করে একটা শব্দ হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। ঠাণ্ডায় শ্লেষ্মা জমেছে বুকে। ঘুমের মধ্যেও শব্দটাকে যেন শুনতে পাচ্ছিল ঈশান কিন্তু কিছুই করার ছিল না তখন।

দুঃস্বপ্নের রাতটা গড়াতে গড়াতে, কি আশ্চর্য, একসময় নিঃশেষ হয়ে গেল। একটানা পাখির চিৎকার শুরু হল চারপাশে। আকাশে আলোর কিছুটা আভা। জঙ্গলের গায়ে চিকচিক করছে জলের দানা, যেন বৃষ্টি হয়ে গেছে।

অকস্মাৎ চোখের উপর আলো পড়তেই চমকে লাফিয়ে উঠল ঈশান। উহ্, সর্বদেহে অসম্ভব ব্যথা। চোখে প্রচণ্ড জ্বালা। ঈশান বুঝতে পারল, সারা রাত এইভাবে গায়ের ওপর হিম বইতে দেওয়া উচিত হয়নি ওর। ঘাড় ফেরাতে গিয়ে বুঝল, লোহার মতো নিরেট হয়ে গেছে ঘাড়ের পেশী। বুকের ওপর হাত বুলোতে গিয়ে ভয়ে আতঙ্কে পাংশু হয়ে গেল ঈশান। এ কি! সারা দেহে কি এগুলো!

অনেকক্ষণ সময় লাগল ওর জিনিসগুলো চিনতে। সারা দেহে ঘামাচির মতো অসংখ্য গুটি লাল লাল, কণা কণা। চামড়ার নিচে যেন মুসুরীর ডাল ঢেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

তবে কি—

ঈশান আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার সাহস পেল না। চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর গলুই থেকে এক লাফে নেমে ভেড়ির ওপর উঠে এল।

সামনেই কুয়াশা ভেজা স্তব্ধ কাছারিবাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে। উঠোনে পেট্রম্যাক্সের গায়ে সতেজ এক টুকরো রোদ। কেমন অর্থহীন মনে হচ্ছে সব। এক ছুটে কাছারিবাড়ির দিকে এগিয়ে এল ঈশান।

থরথর করে পা কাঁপছিল ওর। দেহের ভিতর থেকে প্রচণ্ড উত্তাপ বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছিল বাইরে। ঈশান বুঝতে পারল, কেবল মায়ের দয়াতেই আক্রান্ত হয়নি ও, প্রচণ্ড জ্বরও নেমে এসেছে ওর সর্ব দেহে।

সাত

এরপর এক এক করে সাতটা দিন ঝড়ের বেগে বয়ে গেছে এই মুষ্টিমেয় লোকগুলির উপর দিয়ে। একে একে সংক্রামিত হয়েছে বসন্ত। জল হাওয়ার ভাঁজে ভাঁজে বসন্তের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে ছোঁয়া লাগছে, সেখানেই যেন গুটি বসে যাচ্ছে। প্রথমে গুটি, পরে রোগের অন্যান্য লক্ষণ।

ঈশানের কাছ থেকে সেই গুটি সংগ্রহ করল বিশু মিঞা। শয্যা নিতে হল ওকেও। দিন দুয়েকের মধ্যে আরো কয়েকজন ঢলে পড়ল।

এর মধ্যে রজনী বা দয়াল ঘোষের অসাক্ষাতেই আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। দ্বিতীয় দিন রাতে সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে ভেড়ির ওপর উঠে এল ছায়ামূর্তির মতো দুটো লোক। একজন মকবুল অন্যজন জগন্নাথ। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাইয়ি করল কিছুক্ষণ, পরে ভেড়ির উপর থেকে নৌকোর নোঙর টেনে তুলে কাদায় নেমে পড়ল দুজনে। তখনো ডিঙির নিচে অল্প কিছু জল। নৌকোটাকে ধাক্কা দিয়ে ভাসিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না ওদের।

আশ্চর্য। ডিঙির ভেতর থেকে এতটুকু শব্দ পেল না ওরা। কে জানে, মরেই পড়ে আছে কিনা মেয়েটা। কিংবা হয়তো নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে এখন।

সামান্য ধাক্কাতেই ডিঙিটা ভেসে গেল অনেকখানি দূরে। পরে পাক খেতে খেতে জোয়ারের টানে উত্তরমুখো ভেসে চলল।

শীতের বাতাসে রি-রি করে কেঁপে উঠেছিল ওরা। তবু শীতের মধ্যেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নৌকোটার দিকে তাকিয়ে থাকল। অবশেষে শ্লথ পায়ে ফিরে এল ডেরার দিকে।

গৌরী যেন অভিশপ্তা। এসে হাজির হয়েছিল এ উপকূলে। আবার ভেসে চলল অন্য কোথাও।

বিশু মিঞা জ্বরের প্রকোপে ভুল বকতে শুরু করল। কার এমন বুকের পাটা ওর পাশে বসে ওকে সান্ত্বনা দেবে, সেবা করবে। যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত এখন।

দয়াল ঘোষ কলকাতায় ছোটকর্তার কাছে খবর পাঠালেন। চিঠিতে তিনি বিশেষ করে পরিস্থিতির কথা লিখে জানালেন। জানালেন, তিনি এ অবস্থায় ছোটকর্তার নির্দেশের জন্যই অপেক্ষা করবেন। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে তাঁর নিজের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্তেই পৌছন সম্ভব নয়। বন সাফাইয়ের কাজ পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হয়েছে এখন। এই ছোঁয়াচে রোগের দাপট না কমলে কাজের কথা মুখে আনা সম্ভব নয়।

রজনীর বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে শুরু করল। দয়াল ঘোষের বুদ্ধির দৌড়েই আজ এ অবস্থা।

—তখনই বলেছিলাম, ডিঙিটা ভাসিয়ে দেই, শুনলেন না। এখন সামলান আপনি। কেউ যদি মারা যায় দায়িত্ব আপনার।

দয়াল ঘোষের মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া গতি নেই। যা ঘটবার তা ঘটবেই।

রজনী বলল, আমাদের কথা শুনুন দয়ালবাবু এখনো বাঁচার উপায় আছে।

—কি কথা?

রজনী পরিষ্কার গলায় বলল, কাঠ বোঝাই নৌকোদুটো খালি করার হুকুম দিন আগে। তারপর—

—তারপর কি?

—তারপর ওতে করে সটান কলকাতা চলুন যদি বাঁচতে চান।

—পালাব! দয়াল ঘোষ এক পলক ভাবলেন, আবাদের কি হবে?

—চুলোয় যাক আপনার আবাদ। প্রাণে বাঁচলে তবে তো আবাদ।

দয়াল ঘোষের মনে হল, রজনী ওকে অপমান করতে চাইছে। রোগের ভয়ে আবাদ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো মানুষ তিনি নন। গলায় ঝাঁজ মিশিয়ে বললেন, বেশ তো, তোরা যেতে চাস যা। আমি একা থাকব এখানে। পাহারা দেব।

—আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। রজনী দয়াল ঘোষের চোখের ওপর চোখ তুলে কথা বলল।

মকবুল একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, বোঝাবার চেষ্টা করল, আজ না হয় বিশুকে ধরেছে, কাল যখন আপনাকে ধরবে! আমাদের কথা রাখুন দয়ালবাবু, চলুন এক সঙ্গে আমরা ফিরে যাই।

—আমি তো বলেছি, যাব না। যেতে পারি না। এতগুলি রুগী এই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে স্বার্থপর হয়ে পালাতে পারি না। তোরা যেতে চাস, যা। দয়াল ঘোষের কথায় যুক্তি আছে। তবু প্রাণের মায়া বড় মায়া। মকবুল চুপ করে গেল।

চতুর্থ দিন বিশু মিঞা মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দ্বীপটাই যেন চিৎকার করে ককিয়ে উঠল। থরথর করে স্নায়ুর ভিতরে শিহরণ শুরু হল দয়াল ঘোষের; এত সহজেই যে একটা লোক মরে যেতে পারে, কে ভেবেছিল। শেষপর্যন্ত চৌধুরীদের আবাদ করতে এসেই লোকটা মারা গেল। রজনী কোথায়, রজনী?

পজল মাঝি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়াছিল, আঙুল তুলে ভেড়ির দিকটা দেখিয়ে দিল।

দয়াল ঘোষ পাগলের মতো ভেড়ির দিকে এগিয়ে এলেন। জোয়ারের জলে নদী ফেঁপেফুলে একাকার হয়ে আছে। ওকি, ঘাটের দিকে কে ওরা। দয়াল ঘোষ দেখলেন, বারোশ-মনী নৌকো দুটোর উপর কয়েকজন চলাফেরা করছে। এ ক'দিনে নৌকোদুটো কাঠে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। কাঠগুলি কি আবার ওরা নাবাবার চেষ্টা করছে! তবে কি দয়াল ঘোষের অনুমতি না নিয়েই আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে ওরা! একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলেছে যে বুঝতে অসুবিধা হল না দয়াল ঘোষের। মাথায় চড়াৎ করে আবার রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। নৌকোদুটোর কাছাকাছি উনি এগিয়ে এলেন।

—কি হচ্ছে শুনি?

রজনী এগিয়ে এল, দেখতেই তো পাচ্ছেন কি হচ্ছে।

—বটে!

রজনী গলা নামিয়ে বলল, আগে জীবন পরে জমিদারি। ছোটকর্তার কাছে সব বলব আমরা।

—আর রুগীদের কি হবে?

—দরকার হয় আলাদা নৌকোয় ওদেরও তুলে নেব। জঙ্গলের মধ্যে একা ফেলে যাব না।

দয়াল ঘোষের মনে হল, পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

থাকতে কষ্ট হচ্ছিল ওঁর। রজনী যেন অপমানের চাবুক কষিয়ে দিয়েছে ওঁর গায়ে। কিন্তু অবস্থা যা তাতে এখন এটুকু হজম করা ছাড়া উপায় নেই।

বিশু মিঞাকে কবর দিতে দিতে বিকেল গড়িয়ে এল। কাঠুরেরা অত্যন্ত শান্তভাবে বিশুকে কবর দিয়ে এল জঙ্গলের ভিতর। মকবুল ভাঙা ভাঙা গলায় কোরানের বাণী উচ্চারণ করল ওর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে। বিশুর জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করল মকবুল।

রজনীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। দয়াল ঘোষের মুখেও কোনো শব্দ নেই। অসম্ভব চাপ অনুভব করছিলেন উনি বুকের ভেতর। বেশিক্ষণ এই দৃশ্যের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। সরে এলেন।

গোর দেওয়ার কাজটুকু শেষ হওয়ার পর তার জেরটুকু চোখে মুখে অবসাদ হয়ে ছড়িয়ে রইল।

সমস্ত কিছুই এমন দ্রুত গতিতে ঘটে গেল যার পূর্বাপর চিন্তা করার অবসর নেই কারো। না দয়াল ঘোষের, না রজনীর। প্রতিক্ষণেই এখন চামড়ায় হাত বুলিয়ে দেখতে হচ্ছে, গুটি ধরা পড়ছে কিনা।

রজনী আবার ছুটে এল ভেড়ির কাছে। আর সময় নেই বাপু। যদি বাঁচতে চাস তাড়াতাড়ি হাত চালা। নৌকো খালি কর আগে।

ষষ্ঠ দিন সকালে দয়াল ঘোষ জানতে পারলেন, কাঠুরের সংখ্যা দশ-বারোজন কমে গেছে। কি করে কমল! পালাল! কি করে পালাল! কোন পথে পালাল! জঙ্গল ডিঙিয়ে নদী ডিঙিয়ে নির্ঘাত অন্য কোনো আবাদের দিকে পালিয়েছে ওরা। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কি ভয় নেই লোকগুলির! নদীর জলে ভুলেও তো পা ছোঁয়ায় না কেউ, ওরা পার হল কি করে! কোন সাহসে ওরা এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিল। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে মনে হল দয়াল ঘোষের।

কলকাতায় গিয়ে ছোটকর্তার কাছে এর একটা কৈফিয়ত দিতে হবে দয়াল ঘোষকে। কিন্তু উনি কি করবেন, লোকগুলি যদি নিজেদের ভালমন্দ নিজেরাই বুঝে নেয়, ওঁর পক্ষে কি করার থাকে তাহলে।

মকবুল এসে গোপনে খবর দিয়ে গেল, এখনও যদি মত না পাল্টান দয়ালবাবু, একটা লোকও থাকবে না, সব পালাবে।

—পালাবে মানে? কোথায় পালাবে?

—শুনতে পেলাম, আগের লোকগুলি ঘোষবনের দিকে চলে গেছে।

—কি ভাবে গেল? নৌকো পেল কোথায়?

—নদী সাঁতরেই পার হয়ে গেছে দয়ালবাবু।

—নদী সাঁতরে! অসম্ভব! ওপারে আর যেতে হবে না, তার আগেই কুমিরের পেটে যেতে হবে।

—এখানে থাকার চেয়ে নদীকেও ওরা নিরাপদ ভেবেছে দয়ালবাবু।

দয়াল ঘোষ কিছুক্ষণ থমকে রইলেন। তারপর মিয়োনো গলায় শুধোলেন, তা আমাকে কি করতে হবে শুনি?

মকবুল কিছুটা আশার আলো দেখতে পেল। কিছুটা আত্মসমর্পণ করার ভঙ্গিতে বলল, আমাদের বাঁচান দয়ালবাবু। আমরা আপনার ভরসাতেই এসেছি, আমাদের বাঁচান।

—বেশ তো, তোরা যদি মনে করিস দ্বীপ ছেড়ে পালানো ছাড়া আর কোনো আশা নেই, তবে তাই কর।

—সেই ভাল দয়ালবাবু। আপাতত কিছুদিন এখান থেকে সরে থাকাই ভাল।

—বেশ, তাই বন্দোবস্ত কর। তবে রুগীদের এখানে ফেলে রাখা চলবে না। সবাইকে যদি সঙ্গে করে নিতে পারিস তবে আমি তোদের সঙ্গে আছি।

—সবাইকেই সঙ্গে নেব। নিশ্চয়ই নেব। মকবুল উৎসাহে ছুটে বেরিয়ে গেল রজনীর খোঁজে।

তারপর সপ্তম দিন ভোরবেলার ঘটনা। যে ডিঙি নিয়ে সপ্তাহে একদিন করে কাঠ-বোঝাই করে কলকাতার দিকে ছুটে যায় মাঝিরা, সেই ডিঙির ওপর একে একে সবাই উঠে বসল। ছইয়ের ভেতর বিছানা পেতে দেওয়া হল রুগীদের। বৈঠার অভাবে হাতে হাতে গরানের ডাল উঠল। দয়াল ঘোষ উঠলেন, রজনী উঠল, উঠল মকবুল, জগন্নাথ, গজল·· একটা লোকও বাদ রইল না এখানে।

না, বাদ রইল না বললে ভুল হবে। জঙ্গলের ভিতর মাটির নিচে বিশু মিঞা এখন চিরকালের মতো ঘুমে মগ্ন।

দিন দুয়েক আগে হিসেব থেকে যে দশজন কাঠুরে কমে গেছে, তাদেরও আর খোঁজখবর করার কথা মনে পড়ল না এসময়।

অবশেষে নৌকোছুটো জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ছাড়ল। দুলুনি খেয়ে উঠল বেবাক মানুষ।

দয়াল ঘোষ কাছারিবাড়িটার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন। কয়েকদিন ওটা নির্জনে অবহেলায় পড়ে থাকলে জঙ্গল এসে আবার ওকে গ্রাস করবে। আবার সহস্রবাহু মেলে ভেড়ির গা অবধি এগিয়ে আসবে অরণ্য। কে জানে,

আবার এখানে কোনোদিন ফিরে আসতে পারবে কিনা দয়াল ঘোষ। যদি আবার কোনোদিন উনি দলবল নিয়ে ফিরে আসেন, শুরু করতে হবে প্রথম থেকে। এ যেন সত্যি সত্যি পরাজয় হল দয়াল ঘোষের। হ্যাঁ, পরাজয় কথাটাই বারবার মনে আসছিল ওঁর।

আর তখন বনের লতায় পাতায়, ঝোপে ঝাড়ে, খ্যাপা বাতাস যেন সত্যি সত্যি জয়ের উল্লাসে মেতে উঠেছে। যেন বলতে চাইছে, হেরে গেছে, হেরে গেছে···হুয়ো হুয়ো···ঐ যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে, হুয়ো···। সনসন,···হিহি·········সমস্ত বনভূমিই জয়ের দমকে নৃত্য শুরু করেছে বলে মনে হল দয়াল ঘোষের।

বুড়োবাসুকি নদীর বুকেও উল্লাস। বন্য হয়ে উঠেছে নদী। চটাস চটাস করে জিহ্বা মেলে ভেড়ির গা চেটেও যেন স্বস্তি নেই। ভেড়িটাকে ধসিয়ে দিয়ে অরণ্যের সঙ্গে আবার গলায় গলায় মিতালি করতে চায় বুড়োবাসুকি।

আর নৌকোছুটোর অবস্থা তখন করুণ, পালা, পালা। জান বাঁচাতে চাস তো পালা। ঊর্ধ্বশ্বাসে বড় নদীর দিকে পালাতে শুরু করল নৌকো। পালাতে শুরু করল ছোবল-খাওয়া মানুষগুলো।

আট

লোকগুলি পালিয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে আবার একটা রাত্রি নেমে এল, কুয়াশায় সজল একটা রাত্রি। ঝিমিয়ে পড়ল। ঘুঙুর দানার মতো ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপ। দ্বীপের চারপাশ ঘিরে নদীতে তখন থইথই করছে জোয়ার। জঙ্গলের ঝোপঝাড় থেকে তেজী সাপের মতো হিসহিস শব্দ আসছে। এটাই যেন স্বাভাবিক এই সুন্দরবনে। কিন্তু ওই বিশাল আকৃতির নৌকোটা কোথায় যাচ্ছে গো? কার নাও? কে যায়?

কত নৌকোই তো যায় আসে। দিনে রেতে। উত্তরে দক্ষিণে। কে অত হদিস রাখে কার। নৌকোটা আকৃতিতে বিরাট। জল ছুঁইছুঁই করছে কান। যেন যে কোনো মুহূর্তেই ডুবে যেতে পারে।

শুকনো শামুক ঝিনুক কাঁকড়া আর হাড়গোড় ডাঁই হওয়া নৌকোর পাটাতন। কতকালের শুকনো হাড়গোড় ওগুলো কে জানে। হয়তো নদীর চর আর ভাগাড় খুঁজে খুঁজে ওগুলো সংগ্রহ করেছে মাঝিরা। পুড়িয়ে চুন করা হবে বোধহয়। নৌকোটাকে গতিহীন বলে মনে হচ্ছে। মাল বোঝাই ভারি নৌকোর গতি সবসময়ই মন্থর হয়। কিন্তু হালে কোনো মাঝি দেখা যাচ্ছে না।

তবে কি গলুইয়ের কব্জায় হালটাকে স্থিরভাবে গেঁথে রেখে মাঝিরা এখন বিশ্রাম করছে! নাকি ঘুমিয়ে পড়ে রাত্রির জোয়ারটুকু শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে!

হয়তো তাই। এই ঘন কুয়াশায় অপদেবীর অদৃশ্য ডাকে পথে-বিপথে কেই বা আর ঘুরতে চায়।

কিন্তু তাই বলে ঘুমিয়েই বা থাকে কি করে মাঝিরা! সুন্দরবনের নদীপথের নিয়মকানুন কি জানা নেই মাঝিদের! কার এমন বুকের পাটা, নৌকো নোঙর করে রাত্রিযাপন করবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে! কেবল কি জিন, কেবল কি ডাকাত! সাঁতরে ওঠা সাপ, কুমির নেই! কি জানি এ কেমন ধারা নৌকো।

সত্যি সত্যি হালের মাচার ওপর তখন কেউ ছিল না। দুর্লভ তো নয়ই, জলধর, দুর্গা, শরৎ ওরাও না। দুর্লভ ম্যাকডোনাল্ড হাল বায়। মাঝি। আর সবাই দাঁড়ের কাছির ওপর পা আটকিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে দাঁড় টানে। এরা সবাই এখন বিশ্রামে বসেছে। নৌকো নোঙর করা রয়েছে। না করে উপায় নেই। একে কৃষ্ণপক্ষ, তায় কুয়াশা। স্তূপীকৃত শামুক ঝিনুকের মাঝে সামান্য একটু স্থান করে নিয়েছে মাঝিরা। একটা কুপি সেই ফোকরের মধ্যে জ্বলছে। ঝলসানো আলোর রেখা শামুকের গায়ে আঘাত খেয়ে বীভৎস সব ছায়া সৃষ্টি করেছে।

দুর্লভ জেগে থাকবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ঘুমই কেবল জড়িয়ে জড়িয়ে আসছিল চোখে। চোখ টানটান করে একটা হাই কাটল দুর্লভ। জলধর দুর্লভের হাই তোলা দেখে হেসে উঠল। তারপর হাসির কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য বলল, বুঝেছ দাদা, হাড়গোড় নিয়ে বাস করলেই ঘুম পায়।

দুর্লভ উত্তর দেওয়া অবান্তর মনে করল। মনে হল, জলধর যেন বলতে চাইছে শামুক ঝিনুকের শুকনো খোলগুলি বুঝি জাদু করে ঘুমপাড়িয়ে রাখতে চাইছে, সবাইকে। অর্থাৎ মরে ভূত হয়ে গেছে যারা, রাক্তিদুষ্ট লোককে তারা বুঝি মৃত অবস্থাতেই দেখতে চায়। দুর্লভ নিজের অজান্তেই বুকের উপর আঙুল টেনে ক্রশ এঁকে ফেলল একবার।

—এই শালা দুর্গা ফের ঘুমুচ্ছিস?

—কৈ গো! দুর্গা প্রতিবাদ করে, কোথায় আবার ঘুমুতে দেখলে আমাকে?

তবে কি দুর্লভের দৃষ্টিভ্রম ঘটছে! এমন হয়, নদীপথে এরকম হামেশাই হয় মাঝিদের। নদীতে নদীতে পথ ভুল করে কতবার যে ওদের নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছে, কে অত লিখে রাখে। দুর্লভ আর এক ছিলিম তামাক সাজতে বসে গেল।

রাত্রিটা এইভাবেই জেগে বসে কাটাতে হবে ওদের। দিনের আলো ফুটলে

আবার ওরা বদর বদর করে নৌকো বাইবে। যতক্ষণ না ভাঁটার মুখোমুখি পড়ে ততক্ষণ এক নাগাড়ে নৌকো বেয়েই যেতে হবে। এমনি করে কয়েকটা ভাঁটা পেরিয়ে এক সময় ওরা এসে পড়বে হুগলির ঘাটে। তারপর মাল খালি করতে যেটুকু সময়। আবার ফিরে আসবে নদীপথেই খালি নৌকো নিয়ে। পাটাতনের চোরা পাল্লায় লুকিয়ে রাখবে বিক্রিবাটার টাকা।

এমনিভাবে কয়েক মাস পর পরই দুর্লভকে শামুক ঝিনুক নিয়ে নৌকো ছাড়তে হয়। দুর্গা দুর্গা! জলধর, শরৎ, দুর্গা দাঁড়ের পাশে বসে যায়।

দুর্লভ ম্যাকডোনাল্ড হাঁক দেয়, বদর বদর।

জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার। তাই খ্রীষ্টান হয়েও দুর্লভ বদর গাজীর নাম না নিয়ে নৌকো ছাড়ে না। এই নদীপথে বিপদে আপদে একমাত্র বদর গাজীই সহায়। এই নামেই ওরা অনায়াসে ঘোষবন থেকে হুগলি কিংবা কাকদ্বীপ যাতায়াত করতে পারে।

দুর্লভ হুঁকোয় টান দিয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই একরাশ ধোঁয়া ওর মুখটাকে ঢেকে ফেলে। বাঁ হাত দিয়ে ধোঁয়ার জঞ্জাল সরিয়ে কলকেটা এগিয়ে ধরে দুর্লভ। তারপর হাতে হাতে কলকে ঘোরা শুরু হয়।

বুড়োবাসুকি ধরে এগিয়ে গেলে এখন দুধারেই কিছু-না-কিছু আবাদ চোখে পড়ে ওদের। চৌধুরীরাজাদের আবাদের কাজ সবে শুরু, কিন্তু মাইল পাঁচেক এগিয়ে এলেই জমজমাট আবাদ। আবাদের মাটিতে এখন হাল পড়ে। হালের ছোঁয়ায় মাটি ফেঁপেফুলে গর্ভবতী হয়ে ওঠে। তবে শেকড় আর শুলোয় বাধায় হালের মুখ আটকে যায় এখনো। দা কাটারি কোদাল নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ। তবে ফসল কোথায়! আরো দু'দশ খোপ না কাটলে নাকি ফসল হা-ফসল করেই কাটাতে হবে। তাই আরো কয়েক খোপ বর্ষা চাই। নুন কেটে জমি জমির মতো হওয়া চাই।

এই আশাতেই আবাদে আবাদে বসতি বসেছে। দুর্লভ পাকাপাকিভাবে ঘরদোর তৈরি করে ফেলেছে ঘোষবনে।

ঘোষবনের জমিদারী স্বত্ব ছিল বর্ধমানের ঘোষদের। ঘোষবংশের নাম থেকেই ও আবাদের নাম হয়েছে ঘোষবন। বন আর নেই, নির্মূল হয়ে পুরোটাই এখন আবাদ। তবে ঘোষদের হাত থেকেও ইতিমধ্যে বেহাত হয়ে গেছে এই বাদা। স্মৃতিটাই শুধু রয়ে গেছে নামের মধ্য দিয়ে।

ঘোষবন এখন গুমডির রাজাদের সম্পত্তি। গুমডির রাজাদেরও হিস্যার অন্ত নেই। তবে ঘোষবন মাত্র একজনেরই সম্পত্তি। একজন বলতে ছোটকুমার

মহাবীর সিংহরায়। হালে মহাবীরের কাছ থেকে একশ বিঘা পত্তনি নিয়েছে পাদরি সাহেবরা। উদ্দেশ্য দেবা না জানন্তি। চাষ আবাদ করবে? ভাল। স্কুল মক্তব করবে? ভাল। খ্রীস্টান করবে ধরে ধরে? তাও ভাল। মহাবীর মুফতে ছাড়েনি জমি। কাগজপত্র তৈরি করে টাকাকড়ি গুনে নিয়ে তবে সে পাদরিদের জমি দিয়েছে। তার কাজ সে করেছে, এবার পাদরিরা যা ইচ্ছে করুক, মহাবীরের তাতে প্রয়োজন নেই।

মাত্র কয়েক বছর হল এখানে এসেছে পাদরিরা। এরই মধ্যে তারা কয়েক ঘর খ্রীস্টান বানিয়েছে। ম্যাকডোনাল্ড পদবি নিয়েছে দুর্লভ। প্রথমে প্রথমে নানারকম কটূক্তি শুনতে হত দুর্লভকে। কেউ কেউ ডাকে, ও কালাসাহেব, খবর কি? ভাল?

দুর্লভ উত্তর করত না। মনে মনে গজগজ করত। খ্রীস্টের কাহিনী যারা শোনেনি, তারা ওরকমই ব্যঙ্গ করবে। দুর্লভ ছোটখাটো অনেক প্রার্থনার গান মুখস্থ করে ফেলেছে এর মধ্যে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনে মনে সেই গানগুলি আওড়ায় দুর্লভ। ফাদারদের মুখে নানারকম গল্প শুনে দুর্লভ হতবাক হয়ে থাকে। এ বিশ্বাস ওর হয়েছে, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যীশু, আর ধর্মের শ্রেষ্ঠ খ্রীস্টান। যীশু মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনিই ঈশ্বর। যীশু মানুষকে ত্রাণ করার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। এক যীশুই কালে কালে অগণিত যীশুতে পরিণত হবে। তেমন দিন আসতে আর দেরি নেই। তাই সেই হয় পুণ্য ব্যক্তি যে যীশুর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকে।

পাদরিরা সুদৃশ্য চার্চ তৈরি করেছে তাদের জমির উপর। অনেক দূর দেশ থেকেও সেই চার্চের চূড়ো দেখা যায়। পাদরিদের জমির আশেপাশে খ্রীস্টানদের কলোনী গড়ে উঠেছে। অ-খ্রীস্টানরা বলে পাদরিপাড়া। ফাদাররা একটা স্কুলবাড়ি করার কথাও চিন্তা করছেন হালে। শিক্ষাই আলো, অজ্ঞ অশিক্ষিত হয়ে থাকা আর নরকে বাস করা একই কথা। বিনা বেতনে এই স্কুলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষা দেওয়া হবে। এসব কথাই শোনা যাচ্ছে। দুর্লভ পাড়ায় পাড়ায় গেয়ে বেড়ায়, জানো গো, তোমাদের জন্য স্কুল করে দেবেন ফাদাররা। শিক্ষাই আলো, শিক্ষা না পেলে বেঁচে থাকাই বৃথা।

—তাই বুঝি! তবে তো বেশ কল করেছ কালাসাহেব। তোমাদের ওই পাদরি পাড়ায় পড়তে লিখতে ছেলে পাঠাই, আর ধরে ধরে তোমরা সবাইকে খ্রীস্টান করে ছাড়, তাই তো।

—এ তুই কি বলছিস হারাণ। ফাদারদের কখনো ওরকম ভাবিস না। একদিন এসে আলাপ করে দেখ না।

—যাও বাপু, যাও। নিজে যা করছ কর, ভাঙা শিঙে আর গুঁতোতে এস না বলে রাখলুম।

ঘোষবনের জমিদার মহাদেব সিংহরায় তাঁর নায়েব নকুল ভদ্রের মুখে সব খবরই পেয়ে থাকেন। ফাদাররা খ্রীস্টান করা শুরু করেছে আবাদে। করুক গে। মাথা ঘামান না মহাবীর। স্কুলটুল যদি হয় আমাদেরই মঙ্গল হবে। মহাবীর শুধু বারবার স্মরণ করিয়ে দেন নকুলকে, দেখ বাপু, জমিজমা নিয়ে ওরা যেন কখনো বাড়াবাড়ি করতে না আসে, নিজের জমিতে বসে সাহেবরা যা করতে চায় করুক, আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

দুর্লভ বর্ষায় কয়েক মাস জমি নিয়ে লড়াই করে। বাকি সময়টা ওর হাড়গোড় কুড়োনই কাজ। তারপর মালবোঝাই নৌকো নিয়ে ও বাজারের দিকে ছোটে। ঘোষবন থেকে হুগলি অবধি নৌকো বেয়ে এগিয়ে যায় দুর্লভ।

বুড়োবাসুকির জল খলবল করে নাচছিল। শব্দটা জলতরঙ্গের মতো কানে এসে লাগছিল ওদের। রাত্রিটা এইভাবে জেগেবসে তুড়ি মেরেই কাটাতে হবে। ভোরের সঙ্গেসঙ্গে আবার নোঙর তুলে হালের মাচায় উঠতে হবে দুর্লভকে। ফলে তন্দ্রামতোই এসেছিল একটু। সহসা মনে হল, নৌকোটা যেন কেমন একটু টাল খেয়ে নড়ে উঠল। চমকে উঠে সকলেই কেমন হকচকিয়ে গেল।

লক্ষণটা মোটেই ভাল নয়। সঙ্গে সঙ্গে ওরা টাঙি আর রামদা টেনে নিল হাতে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাইয়ি করতে করতে দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষায় রইল।

নাহ্, আর কোনো শব্দ নেই। তবে?

মুখ খুলল দুর্লভ, সাবধান মাঝি···

শব্দটা শামুক-ঝিনুকের গায় ঠোকর খেয়ে আছড়ে পড়ল। কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর এল না। একটু যেন সাহস পেল দুর্লভ। পা টিপে টিপে ছইয়ের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। চারদিকে আঁতিপাতি করে খুঁজতে শুরু করল। কিছু চোখে পড়ছে না তো। মশাল জ্বালাল দুর্লভ। মশালের আলো কুয়াশার স্তর ভেদ করে খানিকটা জায়গা আলোকিত করে রাখল।

এমন সময় চমকে উঠে জলধর দেখাল, ঐ ঐ—ঐদিকে।

হাত কয়েকের ব্যবধানে ছোট্ট একটা ডিঙি দুলে দুলে নাচছে দেখতে পেল ওরা। ডাকাতের ডিঙি নয় তো। ডাকাত দলের এমনিই ছোট ছোট ডিঙি হয়।

ডিঙিতে কোনো আলো নেই। কোনো লোকজনেরও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো এখন ছইয়ের ভিতর ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে ওরা। শক্ত করে টাঙিখানা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল দুর্লভ।

নদীপথের রীতিনীতি সব কিছুই জানা আছে দুর্লভের। সত্যি সত্যি যদি ডাকাতের নৌকো হয়, ও পক্ষের সাড়া না পেলে এদেরও মুখ খোলা উচিত নয়। ও পক্ষ থেকে যেমন গলায় কথা বলবে, এরা তেমন গলাতেই জবাব দেবে। ওরা যদি বলে, একটু আগুন দাও তো মাঝি, এরা বলবে, তা দিতে পারি তবে বাঁ হাতে। অর্থাৎ ডান হাতে থাকবে সড়কি বল্লম। ওরা যদি বলে, মাঝি, অমুক জায়গায় ডাকাত পড়েছে জানো, নৌকো সামলে যেও কিন্তু। এরা বলবে, আরে সে ডাকাত তো আমরাই সাঙাৎ।

এটুকু আলাপেই ওরা বুঝে যাবে, এ পক্ষের তাগদ কত। তাই অবশেষে ওরা গলা নামিয়ে বলবে, কি যে বল মাঝি তার ঠিক-ঠিকানা নাই। তারপর ঝপাৎ ঝপাৎ করে দাঁড় ফেলে ওরা দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাবে।

দুর্লভ ম্যাকডোনাল্ড নদী-পথের এই সব আইনকানুন চুলচেরা হিসেবে জানে। কিন্তু এ কেমন হল! ডাকাত দলের ডিঙি হলে কারো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন! দুর্লভ এবার গলা চড়িয়ে ডাক ছাড়ল, কার ডিঙি গো? বাঁয়ে যাও, বাঁয়ে।

তবু নিঃশব্দ।

দুর্গা বলল, ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না কালাসাহেব। দাঁড়ি-মাঝি নেই, লোকজনেরও কোনো রা পাওয়া যাচ্ছে না, তবে কি আঘাটার নৌকো ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে?

হবে বা।

ডিঙিটা আবার পাক খেতে খেতে এগোচ্ছে। আবার তাই হাঁক ছাড়ল দুর্লভ, নৌকো সামলাও মাঝি, ও মাঝি, কে আছ?

দুর্লভ জানে, ছোট্ট ডিঙিখানা ওদের এই নৌকোর সঙ্গে ধাক্কা খেলে ডিঙিটারই ক্ষতি। চাই কি বেকায়দা মতো ধাক্কা লাগলে বগবগ করে জল ঢুকে ডুবেও যেতে পারে।

অথচ স্রোতের টানে নৌকোটা ঠিক এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ এই দেখ, আবার একটা আঘাত করে বসল। ঠিক এই মুহূর্তেই কাত হয়ে ঝুঁকে ডিঙির গলুইটা চেপে ধরল দুর্লভ। তারপর আবার একটা হাঁক ছাড়ল, আরে ও মাঝি! কালা নাকি রে বাবা! কেউ আছে ডিঙিতে? না নেই?

নিশ্চয়ই কেউ নেই। থাকলে এরপর অন্তত শব্দ পাওয়া যেত। দুর্গা আর শরৎ লাফিয়ে ডিঙির পাটাতনে উঠে পড়ল। তারপর মশাল হাতে ছইয়ের ভেতরেই ঢুকে পড়ল।

এ কি! এ কি দেখছে ওরা!

—ভেতরে লোক রয়েছে গো কালাসাহেব! হ্যাঁ গো, কে তুমি?

—মরে আছে নাকি! দুর্গার ইচ্ছে হল, আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া মূর্তিটার গা থেকে চাদরখানা এক হ্যাঁচকায় টেনে সব রহস্য ভেঙে দেয়। কিন্তু চাদর সরালে যদি মৃত কিছু দেখে ফেলে ও।

মশাল এগিয়ে নিয়ে দুর্গা ধীরে ধীরে মূর্তিটার মুখ থেকে চাদরটা টেনে তুলল।

—এ কি! এ কি বীভৎস মুখ! চমকে খানিকটা সরে এল ওরা! ইস কী কদর্য এই মুখের চেহারা! চারজনেই পলক না পড়া চোখে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে।

আরো অনেক পরে জ্ঞান ফিরল গৌরীর। কান পেতে লক্ষ্য করল, কেউ যেন দাঁড় বাইছে ডিঙির। কে বাইতে পারে! তবে কি নিমাই ফিরে এল! নাকি সেই কালো লোকটা! কি নাম যেন ওর, ঈশান। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে ওর ঈশানের কথাই মনে পড়ল। তবে কি ঈশান ওকে ছেড়ে যায়নি এখনো!

নাহ্, বিশ্বাস করতে পারছে না গৌরী। ওকে তো ভাসিয়েই দেওয়া হয়েছিল। তবে কে ওরা? ঝড়ের বেগে দাঁড় বাইছে লোকগুলি। একজনকেও চিনতে পারল না গৌরী।

যাই হোক। চিৎকার করে ওর বলতে ইচ্ছে হল, আমাকে তোমরা বাঁচিয়ে তোল গো, শুনছ, বড্ড যন্ত্রণা, বড্ড কষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার কুচিন্তা মাথায় ভর করে এল। এরাও যদি গৌরীকে ছেড়ে পালিয়ে যায়! আবার যদি প্রাণের ভয়ে ত্যাগ করে ওকে! এ রোগকে ভয় পায় না, এমন কে আছে পৃথিবীতে। আর্তচোখে কেবল লোকগুলির দিকে তাকিয়ে রইল গৌরী।

চোখাচোখি হয়ে গেল দুর্লভের সঙ্গে। দুর্লভের মনে হল, রুগীর জ্ঞান ফিরেছে। ঝিঙের খোসার মতো অমসৃণ দেহটার দিকে এগিয়ে এল দুর্লভ।

—কোথা থেকে আসছ মা? এমন একা একা তোমায় কে ভাসিয়ে দিল?

গৌরীর চোখে জল। কথা বলতে পারল না গৌরী। অথচ ঠোঁটদুটো ওর নড়ছে, যেন অনেক কথাই ও বলতে চাইছে।

—বল মা, ভয় কি বল! আমি তোমার ছেলের মতো মা, বল!

—ছেলে! কান্নায় আকণ্ঠ ডুবে এল গৌরীর। অবশেষে একটু প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্ম ডুকরে উঠল, জল, একটু জল।

দুর্লভ হাঁড়ি থেকে জল তুলে এনে অল্প অল্প করে মুখে ঢেলে দিল গৌরীর। তারপর দাঁড়িদের লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল, জোরে, আরো জোরে চালা তোরা। তাড়াতাড়ি ফিরে চল। জ্ঞান হয়েছে মেয়েটার।

রাত না ফুরতেই ওরা ফিরে এল ঘোষবনে। এসে খবরটা প্রচার করতেই পালে যেন বাঘ পড়ল।

দুর্লভের স্ত্রীর নাম কুন্তি। কুন্তি মাথায় হাত দিয়ে বলল। ওমা, কোথাকার কোন ঘাটের মড়া নিয়ে এলে গো! কে এ?

মেয়েটা যে কে, দুর্লভও ছাই কি জানে! দুর্লভ বলল, যেই হোক, আগে ওকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করে দেখি, বুঝব! ওকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পার, মানব জন্ম তোমার সার্থক হবে।

—কথা শোন। কোথা থেকে তুলে আনলে বলবে তো? নাড়ীনক্ষত্র জানি না, পরিচয় জানি না, তার উপর এই মহা রোগ, না বাপু, আমার কেমন ভয় করছে।

দুর্লভ যতটুকু জানে খুলে বলল। বলল, ঘাগুলো দেখছ তো, শুকোবার মুখে। চন্দন বেটে বোলাও দেখি। নিম পাতা আন, কাঁচা হলুদ আন। তাছাড়া ওঝা-বদ্যি যা যা দরকার সব তোমার দায়িত্ব। আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই নেই, ওই আমাদের মেয়ের মতো।

—যাদের মেয়ে তারা টের পেলে ঠেঙিয়ে তোমার ভূত ছাড়াবে।

—সে সব তো পরের কথা। আগে আর সময় নষ্ট না করে কি ভাবে ওকে বাঁচানো যায় সে কথা ভাবো। মরতে বসেছিল, জোর গলায় বলতে পারব বাঁচিয়েছি। মেরে ফেলিনি যে দোষ হবে।

কুন্তির তবু প্রশ্নের শেষ নেই। অসংখ্য প্রশ্ন। দুর্লভের নির্বুদ্ধিতার জন্ম নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করতে শুরু করল কুন্তি।

আর ঘটনাটা দেখতে দেখতে পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। দলে দলে লোক এসে ভিড় করে দাঁড়াল। পাদরিপাড়া সরগরম। গত শ্রাবণে বার ফুট লম্বা একটা বাঘ মেরেছিল এই আবাদের মানুষ। সেই বাঘ দেখার জন্ম যেমন ছুটতে ছুটতে লোক এসেছিল, এবারও তেমনি গৌরীকে দেখবার জন্ম লোক

জ্বালতে লাগল। চোখে চোখে সন্দেহ, কে রে বাবা! এই কচি বয়সের একটা মেয়ে, হোক না রুগ্নী, কিন্তু কোথা থেকে ওকে তুলে আনল দুর্লভ! তবে কি গোপনে গোপনে অন্য কোনো সম্পর্ক আছে ওর সঙ্গে!

কেউ কেউ গৌরীকে দেখে উহ্ আহ্ করল। কেউ আবার যত রাজ্যের রহস্যময় অলৌকিক সব ঘটনা শোনাতে বসল। যেমন একজন শুরু করল এক মউলির গল্প। তখন অঘ্রান মাস। মধু কুড়োবার জন্য মৌমাছির পিছন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দলছাড়া হয়ে পড়েছিল এক মউলি। ফেরার পথে হঠাৎ সে দেখে, এক পরমা-সুন্দরী কন্যা। আকুল হয়ে কাঁদছে।

—কাঁদ কেন কন্যা? মউলি শুধাল।

—কাঁদি কেন? কাঁদি দুঃখে। কন্যা বলল।

—কিসের দুঃখ?

কন্যা এবার তার আসল রূপ ধরল। তার সর্বাঙ্গ উদোম করে দেখাতে শুরু করল। এই দেখ, দেখ। যে স্বামীকে আমি পুজো করতাম গো, সেই স্বামীই আমায় বাঘের হাতে ফেলে রেখে পালিয়েছে। বনের বাঘ কেমন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে দেখ।

দেখতে দেখতে মউলি বেচারা মূর্ছা যায় আর কি। এ কি দেখল সে! এ কোন অপদেবী রাতদিন বনে বনে ঘুরে বেড়ায়! আর পথ হারানো পথিককে ডেকে নিজের দেহটা দেখায়!

মউলি সেবার কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরেছিল।

আর একজন শুরু করল এক ব্রাহ্মণীর গল্প। এক নিচু-জাতের মেয়ের প্রেমে পড়ল এক ব্রাহ্মণ। ভাললাগা, ভালবাসায় কোনো নিয়ম নেই, ব্রাহ্মণের দোষ কি!

কিন্তু সমাজ মানবে কেন। সমাজ ওকে একঘরে করল। আর সেই শোকে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করল ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করেছে, ব্যাপারটা এইখানেই মিটে যেতে পারে না। মেয়ের ঘাড়ে ব্রহ্মদৈত্য চাপল। ওঝা এল, ঝাড়ফুঁক হল। দৈত্য আর টলে না। টলবে কি করে, এ কি আর যে সে ব্যাপার, ব্রহ্মদৈত্যের ভর।

সাত গাঁয়ের লোক বলল, প্রায়শ্চিত্ত কর। একশ এক বামুন ডেকে খাওয়া। খাইয়ে দাইয়ে দক্ষিণা দে। একশ এক বামুনের পাদোদক খা, তবে যদি কিছু হয়।

মেয়ের মস্তক মুণ্ডন করা হল। তারপর যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা শুরু করা হবে, লোকে ছাখে, সাত জোয়ানের বল ধরেছে কন্যা। অসুরের বল। কে পেরে উঠবে

ওর সঙ্গে। কে ওকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম-বিধি পালন করাবে। কন্যা পাগলিনী হয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। তারপর যে নদীতে বামুনঠাকুর আত্মহত্যা করেছিল, সেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। এরপর থেকে প্রায়ই নাকি দেখা যায় ওকে নদীর জলে ভেসে উঠতে। মেয়ে মাঝিদের পথ ভুল করিয়ে দেয় সেই মেয়ে।

ফলে আজ দুর্লভ যে এই পথে কুড়ানো মেয়েকে নিয়ে এল, এই মেয়ে যে আবার ওরকম কিছু করবে না কে বলতে পারে! এতবড় মেয়েকে কুড়িয়ে আনা যায়, বিশ্বাসই হয় না। তাও আবার একা একা একটা ডিঙি করে ভেসে আসছিল, কে বিশ্বাস করবে! বলিহারী বেটি তুই।

কেউ কেউ দুষতে শুরু করল দুর্লভকে। কেউ আবার দুর্লভের সাহসের প্রশংসা না করে পারল না। হ্যাঁ, সাহস আছে দুর্লভের। শতকে কতজন পারে এরকম কাজ করতে, বল দেখি।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও থিতিয়ে এল। ভিড় হালকা হতে শুরু করল। গৌরী বিহ্বল চোখে দেখল, ওর সারা গায়ে চন্দনের প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে কেউ। ভাঙা নিমের ডাল দিয়ে কে যেন বাতাস করে মাছি তাড়াচ্ছে ওর চারপাশ থেকে। মায়ের কাছে মেয়ের কোনো-ভয় থাকার কথা নয়, কুড়িকে গৌরী মা ডাকল।

নয়

চৌধুরীদের দ্বীপের আকৃতি অনেকটা শুয়োরের মুখের মতো। সামান্য হলেও এই দ্বীপের একটা ইতিহাস আছে। উড সাহেব নামে কোনো এক দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইংরেজের হাত থেকে সুবেদার মলমল সিং এই জমিটুকু লাভ করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। নামেই কেবল জমিটুকু পেয়েছিলেন। কিন্তু এক কানাকড়িও আয় ছিল না জমি থেকে। ভবিষ্যতে কবে কখন জমিতে বসতি বসবে ততদিন অপেক্ষা করার ধৈর্য বোধহয় ছিল না মলমলের। নগদ আয়ের লোভে ঘটা করে লোক ডেকে দ্বীপটাকে নীলামে ডেকেছিলেন উনি। চৌধুরীরাজাদের খেয়াল, তাঁরা নিলামে কিনে নিজেদের প্রতাপ দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই থেকে এই দ্বীপ চৌধুরীরাজাদেরই সম্পত্তি। কাগজপত্র ঘাঁটলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বোঝা যায়নি চৌধুরীরা এত উপযুক্ত জমি থাকতে এই জমিটার দিকে নজর দিয়েছিলেন কেন। এ ঘটনা কয়েক পুরুষ আগের। ফলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই রহস্যে ঢাকা।

অবশ্য একথা ঠিক, চৌধুরীরাজাদের সম্পর্কে গল্পেরও শেষ নেই। শোনা যায়, নরেন্দ্রনারায়ণের প্রপিতামহ সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর শ্বশুরের কাছ থেকে বিবাহের যৌতুক হিসেবে এই দ্বীপটাকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শোনা কথাই মাত্র। আসল সত্যটা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না আজকাল।

জমিটা যেভাবেই পাওয়া যাক, রংয়ের কাঁদুলের মতো নাগালের বাইরেই পড়েছিল দীর্ঘকাল। আর জমির চারদিকে ভেড়ি টিকিয়ে রাখার খরচ চৌধুরী রাজাদেরই যোগাতে হয়েছে। কিন্তু অবস্থা মানুষের চিরকাল একরকম থাকে না। চৌধুরীদের অবস্থাও পড়তে শুরু করেছিল সুরেন্দ্রনারায়ণের শেষ দিকে। হাতিশালে যাঁর হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, শেষপর্যন্ত তাঁকেও এই সুন্দরবনের জমিটুকু বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল। বাতি-ঘরে বাতি আর ঘন্টি-ঘরে ঘন্টি বাজাবার খরচ অবধি কমিয়ে ফেলতে হয়েছিল। পুজো-পার্বণের জাঁকজমকও কমিয়ে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনারায়ণ। শিকারে বেরুনো বন্ধ করেছিলেন। এমন কি নাচমহলের চেহারাও অবহেলায় ভূতে পাওয়া বাড়ির মতো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বন্ধকী জমিটা কিছুতেই উনি উদ্ধার করে উঠতে পারেননি। সুরেন্দ্রনারায়ণ ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। সুরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণের আমলে জমিটুকু আবার বন্ধন মুক্ত হয়। এখন সেই ধীরেন্দ্রনারায়ণও গত, এখন তাঁর সুযোগ্য পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণের যুগ। নরেন্দ্রনারায়ণই জমিটাকে জঙ্গলমুক্ত করার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছেন।

সুরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর একটা রহস্যময় গল্প প্রচলিত আছে চৌধুরী মহলে। নায়েব গোমস্তাদের মুখে এখনো শোনা যায় সেই কাহিনী। সত্য মিথ্যা বিচারের বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না কেউ।

ঘটনাটা এই রকম: সুরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর মৃত্যুর দিন কয়েক আগে সমস্ত আত্মীয়স্বজন কুটুম্ব ইত্যাদিদের নামে নামে নিমন্ত্রণ চিঠি পাঠান। চিঠিতে লেখা হয়েছিল এই রকম—আগামী অমুক দিবসে কুলাঙ্গার সুরেন্দ্রনারায়ণ আপন বাসভবনে দেহরক্ষা করিতে চায়। এই উপলক্ষে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ ভিন্ন অন্ত কোনো গত্যন্তর নাই। অপরাধ মার্জনীয়। ইতি ভবদীয়—সুরেন্দ্রনারায়ণ।

রানীমা এই অশুভ আমন্ত্রণের বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। যখন জানলেন তখন ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। সুরেন্দ্রনারায়ণ কি পাগল হয়ে গেলেন! পাগল না হলে এমন চিঠি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক লিখতে পারে!

যাই হোক, চিঠি যাঁরা পান, তাঁরা বিচলিত হয়ে সুরেন্দ্রনারায়ণকে দেখতে

আসেন। কিন্তু অন্দর মহলে পা দেওয়া দূরের কথা, বড় সড়কের মোড় পর্যন্তই কেউ কেউ এগোতে পারলেন না। রানীমার আদেশে আগে থেকেই লোকজন মোতায়েন করা ছিল ওখানে। অভ্যাগতদের তারাই ফিরিয়ে দেয়।

রানীমা একাই সুরেন্দ্রনারায়ণকে ঘিরে রাত্রি-দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, যে দিনটিতে সুরেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছামৃত্যু কামনা করেছিলেন, সেই দিনটিতেই কান্নার রোল উঠল চৌধুরীবাড়ির অন্দরমহলে। সুরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর মৃত্যুর সময়ে একজন নিমন্ত্রিতকেও নাকি কাছে পাননি।

যাই হোক, সুরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ধীরেন্দ্রনারায়ণের আমলে আবার ধীরে ধীরে অশুভ গ্রহ কেটে যেতে শুরু করেছিল। ধীরেন্দ্রনারায়ণ পিতার বন্ধকী জমিটুকু আবার নিজের প্রচেষ্টায় উদ্ধার করলেন। পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনারায়ণ জমিটুকুর সৎগতির জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

ততদিনে আবার বাতি-ঘরে নতুন করে তেল পোড়া শুরু হয়েছে। হাতিশালে হাতি আনা হল আসাম থেকে। ঘোড়াশালে মধ্যপ্রদেশের ঘোড়া। দরোয়ান, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা, খানসামা, সকলের গায়ে আবার নতুন চোগা-চাপকান উঠল। রাঁধুনি, চাখুনি, ধুনুনি, মুছুনি সকলেরই মুখে হাসি ফুটল। আইন হয়ে গেল, বছরে দু' জোড়া করে পোশাক পাবে চৌধুরীবাড়ির কর্মচারীরা। একবার পুজোয়, একবার দোলযাত্রায়। রাতারাতিই বলা চলে নরেন্দ্রনারায়ণ নিজের দক্ষতায় চৌধুরীবাড়ির আগের পরিবেশ ফিরিয়ে আনলেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ বিষয়ী পুরুষ, সন্দেহ নেই। প্রথমেই তিনি নজর দিলেন দ্বীপের দিকে। আবাদ করে জন-বসতি বসাবার নেশায় পড়লেন। লোকলস্কর সংগ্রহ করলেন। দয়াল ঘোষকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন সুন্দরবনের।

পরের ইতিহাস অজানা নয়: মাসখানেক পেরতে না পেরতেই দয়াল ঘোষ পালিয়ে এলেন দলবল নিয়ে। সঙ্গে একগাদা রুগী।

—কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোমাদের?

দয়াল ঘোষ যা বললেন, রজনী বলল তার হাজার গুণ। রজনী বোঝাল, সব কাজেরই একটা রীতি আছে ছোটকর্তা। আমরা জঙ্গল কাটার কাজ শুরু করেছি কিন্তু বনবিবির পুজো করিনি। বনবিবিকে তুষ্ট না করে এ-সব কাজ কোনোদিনই হবার নয়।

দয়াল ঘোষ বললেন, কোত্থেকে একটা ছোট জেলে ডিঙি ভেসে এসেছিল। ডিঙিতে একজন মেয়ে। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছিল আমাদের দোষ, আমরা কেন তাকে আশ্রয় দিয়েছি।

—রোগটা তাহলে ওখান থেকেই ছড়িয়েছে?

—হ্যাঁ হুজুর, ওখান থেকেই। রজনী উত্তেজিত গলায় বলল, আমরা তাই ডিঙিটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়ে দিতে বলেছিলাম। আসলে কি জানেন ছোটকর্তা, মানুষের রূপ ধরে এক অপদেবী এসেছিল। তার যেটুকু কাজ করার ছিল, সেটুকু করে দিয়ে সে চলে গেছে।

দয়াল ঘোষ স্বাভাবিক গলায় বললেন, আপনি ঐ মেয়েটার চেহারা দেখেন-নি। দেখলে আপনিও ওকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন না। যার দেহে মানুষের রক্ত আছে, সে কখনো এমন সাংঘাতিক কাজ করতে পারে না।

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, বসন্ত রোগ এত ছোঁয়াচে সত্ত্বেও ওর সঙ্গে এত মাখামাখি করবার কি দরকার ছিল? ওখানে আমরা কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলিনি।

—কোনোরকম মাখামাখি তো হয়নি! দয়াল ঘোষ বিরক্তি মিশিয়ে জবাব দিলেন।

—আপনিই নৌকোটাকে ভাসিয়ে দিতে দেননি। রজনী সরাসরি অভিযোগ জানাল।

—আমার একার ক্ষমতা ছিল না নৌকোটাকে ধরে রাখার। তোরা ভাসিয়ে দিতে গিয়েছিলি, দিলি না কেন?

—আমরা ঈশানের জন্ম পারিনি।

—ঈশান কে? নরেন্দ্রনারায়ণ শুধোলেন।

—ঐ ঈশানেরই প্রথম দয়া হয়। ওর কাছ থেকে আর সবাই। বিশু মিঞা তার জীবনটাই দিল।

মকবুলও রজনীর হয়ে অভিযোগ জানাল, আমরা নৌকোটাকে জোর করে ভাসিয়ে দিতে পারতাম হুজুর, কিন্তু দয়ালবাবুর ইচ্ছে নয় বলে আমরা বেশি দূর এগোতে পারিনি।

দয়াল ঘোষ হাসলেন, অবজ্ঞার হাসি; আমি যা ভাল বুঝেছি, করেছি। আমি তোদের মতো ভয়ে পালিয়ে আসতে চাইনি। শেষ দেখাই দেখে আসতে চেয়েছিলাম।

—আমরাও প্রথমে পালিয়ে আসতে চাইনি দয়ালবাবু, দলের লোক কমে যাচ্ছিল বলেই বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে।

—দলের লোক প্রতিদিনই কিছু-কিছু করে কমে যাচ্ছিল হুজুর আর ক'দিন ওখানে পড়ে থাকলে আমরা চার-পাঁচজন ছাড়া আর কেউ থাকতাম না।

—লোক পালাচ্ছিল কেন? কে কে পালিয়েছে তার হিসেব আছে?

দয়াল ঘোষ বললেন, হিসেব রাখার মতো অবস্থা ছিল না।

লোকগুলো মরল কি বাঁচল সে হিসেব থাকবে না! আশ্চর্য!

দয়াল ঘোষ জবাব খুঁজে পেলেন না। সমস্ত দোষটাই যে ওঁর ঘাড়ে চাপবে উনি তা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু রজনী এখানে পা দেওয়ার পর থেকেই দয়াল ঘোষ সম্পর্কে একটু বেশি মাত্রাতেই চুগলি শোনাতে চাইছে ছোটকর্তাকে। কি মতলব ওর! কি চায় রজনী!

দয়াল ঘোষ বললেন, ব্যাপারটা যতটুকু না ঘটেছে, তার চেয়ে বেশি করে তুলেছিল ওরাই। ভবিষ্যতে আর এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক নিয়ে আমার দ্বারা কাজ হবে না।

—দায়িত্বজ্ঞানহীন আপনিই ছিলেন দয়ালবাবু। মুখের ওপর জবাব দিল রজনী। আমাদের কথা যদি শুনতেন, বিশু বিঞ্চাকে আমাদের কবর দিতে হত না। একটা লোকের জীবনের কি দাম, তা আপনি বুঝবেন না।

—কি বলতে চাস শুনি? আমার দায়িত্বজ্ঞান নেই! যা মুখে আসবে তাই বলে যাবি। ভেবেছিস কি তোরা?

—আহ্! এখন আর মাথা গরমের কাজ নয়। ছোটকর্তা ওদের থামিয়ে দিলেন। যা হয়েছে, হয়েছে। এখন কি কি করা যায়, তাই ভাবো। নতুন করে ভাবুন দয়ালবাবু।

—আমার আর ভাবাভাবি নেই ছোটকর্তা। আপনাদের বিষয়-সম্পত্তি আপনারাই ভাবুন।

পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরাল হয়ে উঠল। নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝলেন, অন্তঃকলহ থাকলে আমাদের কাজ একচুলও এগোবে না। অথচ রজনী আর দয়াল ঘোষ দুজনকেই ওর সমান প্রয়োজন। রজনী আর যাই হোক বুনো মানুষগুলোকে ঠিক চেনে। আবার দয়াল ঘোষ না থাকলে নথিপত্রই বা কে রাখবে।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, ঠিক আছে, আমি আলাদাভাবে সকলের কথাই শুনব। এখন সবাই বিশ্রাম করে মাথা ঠাণ্ডা কর দেখি।

নরেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী উর্মিবালা এক ফাঁকে দয়াল ঘোষকে ডেকে পাঠালেন, কি সব কথা শুনতে পাচ্ছি নায়েবমশাই?

—কি শুনতে পাচ্ছেন বৌঠান?

—কে একটা মেয়েমানুষ নাকি একা একা ভাসতে ভাসতে এসেছিল?

—হ্যাঁ, এসেছিল।

—ওমা, একা! কি হয়েছিল বলুন না নায়েবমশাই?

দয়াল ঘোষ দাঁড়িয়েই ছিলেন, এখানে এই অন্দরমহলে উনি এর আগেও কয়েকবার এসেছেন, কিন্তু আজ আড়ষ্ট ভাবটা ওঁর কাটবার নয়। বললেন, কি আর বলব বৌঠান, হতভাগী মেয়েটাকে আমরা ভোরবেলা নদীর ঘাটে আবিষ্কার করলাম। সারা গায়ে মায়ের দয়া। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল মেয়েটা।

—ওমা, আর কেউ ছিল না ওর? কেউ বুঝি অসুখ-বিসুখ দেখে ভাসিয়ে দিয়েছিল ওকে?

—হয়তো তাই দিয়েছিল বৌঠান। তবে মেয়েটার মুখ থেকে কিছু শুনবার আর সুযোগ পেলাম কোথায়! তার আগেই তো আমাদের যা অবস্থা!

—মেয়েটাকে আপনারা কি করলেন? নদীর ঘাটে ফেলে রেখেই চলে এলেন?

দয়াল ঘোষ কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাকিয়ে থাকলেন।

—বলুন না নায়েবমশাই, কি হল মেয়েটার?

—কি আবার হবে বৌঠান। আমরা জন নিয়ে ব্যস্ত, তার উপর আমাদের দু'চারজনের মধ্যে যখন রোগটা ছড়িয়ে পড়ল, তখন কে কোথায় গেল নজর দেওয়ার অবস্থা ছিল না আমাদের।

—ওমা, অতগুলো লোক আপনারা, মেয়েটার কি হল খবর রাখবেন না? বয়স কি রকম ছিল মেয়েটার?

—কচি বয়স বৌঠান। কত আর হবে, তের-চোদ্দ।

—ওর বর ছিল না?

—সংসারে ওর কে আছে, কে নেই কিছুই বলতে পারব না বৌঠান। তাছাড়া ওর বিয়ে-থা হয়েছিল, না ও কুমারী তাও বলতে পারব না।

—ওমা অত বড় মেয়ে কুমারী! কপালে সিঁদুর ছিল না? সিঁদুর দেখেননি আপনারা?

দয়াল ঘোষ মনে করতে পারলেন না, কপালে সিঁদুর ছিল কি ছিল না। বললেন, যতদূর মনে হচ্ছে ছিল না বৌঠান। তাছাড়া আমি একবার মাত্র একপলক ওকে দেখেছি।

ঊর্মিবালার কৌতুক তবু দমবার নয়। বললেন, তবে কে দেখাশোনা করত ওকে?

—কেউ দেখাশোনা করেনি বৌঠান। হয়তো একটু-আধটু পথ্যি পড়লে মেয়েটা বেঁচে যেত।

—তবে যে শুনলাম, ঈশানকে ওর দেখাশোনা করার জন্য আপনি নৌকোয় রেখেছিলেন ?

দয়াল ঘোষ বুঝলেন, চৌধুরীদের অন্দরমহল অবধি ওর সম্পর্কে উল্টো সুর গেয়ে গেছে কেউ। শুধোলেন, কে বলেছে বৌঠান ?

—যেই বলুক না কেন, রেখেছিলেন কিনা বলুন না ?

—না, কাউকে আমি ঐ রুগীর পাশে বসে থাকতে বলিনি। তবে ঈশান নিজের ঝুঁকি নিজেই নিয়েছিল। ঈশান ছিল ওর নৌকোয়।

—ওমা জানাশোনা নেই, হঠাৎ ওরকম একটা নৌকোয় রাত কাটাতে গেল! আপনি বারণ করেননি ওকে ?

—না, করিনি। ঈশান যা ভাল বুঝেছে করেছে।

—তবে যে শুনলাম, মেয়েটা আসলে ছদ্মবেশী, অপদেবী!

—যার কাছে শুনেছেন, তার কাছেই তো সবকিছু জিজ্ঞেস করে নিতে পারতেন। আমাকে কেন বৌঠান ?

—আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন নায়েবমশাই। আসলে মেয়েটার সম্পর্কে খুব জানতে ইচ্ছে করছে, তাই। বলুন না, সত্যি সত্যি মেয়েটা কে ?

দয়াল ঘোষ হাসলেন, মেয়েটা মেয়েই। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি ওকথাই বলব। মানুষেরমতোই হাত-পা-মাথা, একমাথা চুল, চোখ-নাক-কান, মানুষের যা যা থাকে সবই আছে। তবে আর বেশি কিছু যদি জানতে চান তাহলে ঈশানকে ডাকুন, ও-ই হয়তো আপনাকে নতুন কিছু শোনাতে পারবে।

দয়াল ঘোষ আর অপেক্ষা করলেন না। খানিকটা বিরক্তি আর আক্ষেপ মেশানো ভঙ্গি নিয়েই বেরিয়ে এলেন।

ওদিকে রজনী ছোটকর্তাকে তুষ্ট রাখতেই ব্যস্ত। সরাসরি প্রস্তাব রাখল ছোটকর্তার কাছে, হুজুর, মাত্র তিনটে মাস আমাকে সময় দিন, দেখুন, জঙ্গল আমি পরিষ্কার করে দিতে পারি কিনা।

নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝতে পারছিলেন না, রজনী এত জোর গলায় কথা বলছে কি করে ? শুধোলেন, তিন মাস, তিন মাসে আবাদ করে দেবে ?

—হ্যাঁ হুজুর। কাজের কাজ হলে ওর বেশি সময় লাগার কথা নয়।

—তার মানে, এতদিন কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলছ ?

—কিছুই হয়নি। সারাটা দিনের মধ্যে দু-তিন ঘণ্টার বেশি কোনোদিনই কাজ হত না হুজুর।

—দু-তিন ঘণ্টা। সে কি। বাকি সময় কি করত সব?

—নাচ-গান করত হুজুর। নাচ-গান আর মদ-গাঁজার ছড়াছড়ি। দিনে যদি আট-দশ ঘণ্টা কাজ না হয়, কোনকালেই ফল পাওয়া যাবে না। ফলে কি হত জানেন, একদিক থেকে জঙ্গল সাফ হত, আর একদিকে আবার তা গজিয়েও উঠত।

নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝবার চেষ্টা করছিলেন রজনীকে।

—আপনি আমাকে একবার দায়িত্ব দিয়ে দেখুন হুজুর। তিন মাস পরে যদি আপনাকে আমি বাদায় নিয়ে বসিয়ে দিতে না পারি, আমার নামে কুকুর পুষবেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ নীরব আছেন দেখে রজনী আবার শুরু করল, আসলে কি জানেন হুজুর, নরম মানুষের কাজ নয় এটা। উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হলে চাবুক হাতে নামতে হবে। অবশ্য দয়ালবাবুও কোন দোষ দিই না আমরা, মানুষ হিসেবে ওঁর জুড়ি পাওয়া ভার।

—তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না রজনী।

রজনী হাসল, আসলে একজন শক্ত মানুষের দরকার ঐ জঙ্গলে। দয়ালবাবু হচ্ছেন মাটির মানুষ। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে আর সইতে পারেন না। নইলে এভাবে আমরা পালিয়ে আসব কেন বলুন!

—তোরা দয়ালবাবুকে চাইছিস না?

—না হুজুর, সে-কথা বলছি না। আমাদের কোনো ক্ষার নেই কারো উপর। আসলে আপনি আমাদের পাঠিয়েছেন বাদা তৈরির কাজে, তা বাদাই যদি তৈরি না হল, তাহলে কি লাভ বলুন! মাসের পর মাস আমরা আপনার অন্ন ধ্বংস করে যাব, এটা কি উচিত?

নরেন্দ্রনারায়ণ বিষণ্নচোখে হাসলেন, ঠিক আছে, কি করা যায় আমি ভেবে দেখি।

রজনী ছাড়বার পাত্র নয়, বলল, আসলে সবার মনে খানিকটা আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে হুজুর। একবার যারা ঘা খেয়ে চলে এসেছে তাদের আপনি চট করে ওখানে আবার পাঠাতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

—যাবে না বলছিস?

—যাবে হয়তো, তবে কয়েকটা কাজ করতে হবে তার আগে।

—কি করতে হবে শুনি?

রজনী বলল, লোকগুলোকে বোঝাতে হবে বনদেবীকে সন্তুষ্ট করেই তবে এবার কাজে হাত দেওয়া হবে।

—সেটা কি ভাবে ?

—বনদেবীর পুজো দিতে হবে ধুমধাম করে। বনদেবীর পাকাপাকি একটা বাথান বানাতে হবে। দু-চার পয়সা হয়তো খরচ হবে কিন্তু দেখবেন তাতে মনে বল ফিরে পাবে সবাই।

—তা আর এমন কি কঠিন কাজ।

—কিচ্ছু কঠিন কাজ না হুজুর। তবে এটুকু কাজও আমরা দয়ালবাবুর কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারিনি।

—দয়ালবাবু চিঠিতে এই পুজোর কথা আমাকে লিখেছিলেন। কিন্তু কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই তো তোরা চলে এলি।

—অনেক আগেই দয়ালবাবু এটা করতে পারতেন। যাক গে, পুজো কিন্তু আমরা খুব ঘটা করে করব হুজুর। পুজোর দিন আশপাশের নতুন আবাদের লোকজন ডেকে ঘটা করে সবাইকে জানিয়ে দেব, চৌধুরীরাজাদের আবাদ পত্তনির কাজ শুরু হয়েছে আবার। লোককে লোভ দেখাতে হবে হুজুর। নতুন আবাদ থেকে কেউ যদি আমাদের আবাদে কাজ করতে চায়, তাকে সুযোগসুবিধে দিতে হবে।

—বেশ, দেওয়া যাবে।

—কারো যদি অসুখ-বিসুখ হয় হুজুর, সঙ্গে সঙ্গে তাকে কলকাতায় আনিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নিতে হবে। লোকে বুঝবে, চৌধুরীরাজারা মানুষের জন্ম ভাবে। কাঠুরেদের জঙ্গলে পাঠিয়ে তাদের ভাল-মন্দ চৌধুরীরাজারা ভুলে যান না।

—তবু ভাল, বলিসনি যে সঙ্গে একজন ডাক্তার দিতে হবে।

রজনী বলল, আর একটা কাজ করলে খুব ভাল হয় হুজুর, খানকয়েক গরু যদি সঙ্গে নেওয়া যায়, খুব ভাল হয়। বাদায় গোবরের বড় অভাব।

—গোবর দিয়ে কি হবে ?

—নোনামাটিতে ঘরের যা অবস্থা হয় তা আর বলার নয়। গোবর পেলে নিকিয়ে নেওয়া যায়। আর তাছাড়া গরুর দুধও পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা, গরু লক্ষ্মী। বাদায় শ্রী বাড়ে।

—বেশ গরুও না হয় হল। আর কি লাগবে ?

রজনী বলল, আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে সব কিছুর একটা লিস্ট করে দিতে পারি হুজুর।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখি। দয়ালবাবুর

সঙ্গেও এসব নিয়ে একবার কথা বলতে হবে। শত হোক দয়ালবাবু নায়েব, একথা ভুললে চলবে না।

রজনী কিছুটা যেন হতাশ বোধ করল। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে কেন। রজনী বলল, তবে তাই দেখুন হুজুর। প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকবেন।

দশ

অবশেষে নতুন করে আবার সুন্দরবন অভিযান শুরু হল ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি। লোকলস্কর মালপত্র বোঝাই চারটে বড় বড় নৌকো, একটা বজরা এগিয়ে চলল।

বজরাটার বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। শক্ত ফ্রেমের মাঝারি গোছের একটা কুঠরি। যেন রাজবাড়ির অংশ বিশেষকে বহন করে নিয়ে চলেছে। সারা গায়ে রামধনুর মতো রঙের কারুকাজ। ময়ূরের পাখার মতো গোলাকার কয়েকটা জানলা। জানলার পাল্লা কাচের। কাচের গায়েও ছবি আঁকা। গলুইদুটো পাখির ঠোঁটের মতো ছুঁচলো সিঁদুরগোলা টকটকে লাল। দেখেই বোঝা যায়, সদ্য রং করা হয়েছে বজরাটাকে। শিবের ঊর্ধ্বনেত্রের মতো পেছনের গলুই উঠে গেছে নৌকোর মাথা ছাড়িয়ে। হালের মাচা ওখানেই। মাস্তলের বল্লীকাঠ এখন ঢেঁকির মতো দু'ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে, বাতাস নেই, পালও খাটানো হয়নি তাই। হালের মাঝি গজল, চৌকস হাতে বজরাটাকে হাঁসের মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। বজরার ছাদের চারপাশে রেলিং আর বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় কয়েকটা কাঠ খোদাই নারী মূর্তি। ঢং ইংরেজি কেতাদুরস্ত। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়, কে বলবে, ওগুলো সত্যিকার মানুষ নয়, কাঠের নিষ্প্রাণ মূর্তি। কেবলমাত্র দাঁড়িয়ে থেকে বজরার গাম্ভীর্য বাড়িয়ে তুলেছে। সবুজ রেশমী কাপড়ের পর্দা ঝুলছে জানলায়। তিরতির করে পর্দাগুলি কাঁপছে।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাশীপুর ঘাট থেকে নৌকো ছেড়েছে ওরা। এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সূর্যের আলো তির্যকভাবে নদীর গায়ে আছড়ে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আর সামান্য কিছু এগোলেই বাদার মুখ দেখা যাবে। মাতলায় এসে পড়বে ওরা।

রজনীর আজ ব্যস্ততার শেষ নেই। রজনী, মকবুল, জগন্নাথ, ঈশান আর পুরনোরা প্রায় সকলেই আছে, নতুন আরো জনাতিরিশেক লোক সংগ্রহ করে

নিয়েছে রজনী। এদের মধ্যে কয়েক জন বেশ পাকা জেঠেল। নতুন পুরনো মিশে নৌকোগুলি বেশ সরগরম।

কিন্তু পুরনোদের মধ্যে একমাত্র দয়াল ঘোষকেই দেখা যাচ্ছে না। হাজার চেষ্টা করেও রাজি করানো সম্ভব হয়নি ওঁকে।

নরেন্দ্রনারায়ণ চেষ্টার কসুর করেননি। যদিও জানতেন, রজনীদের ওপর দয়াল ঘোষ তেমন প্রসন্ন নয় তবু রজনীকেও বাদ দেওয়া চলে না। রজনী একাই বাড়তি উদ্যমে লোক সংগ্রহ করেছে এ ক'দিন। রজনী যেভাবে লোকগুলোকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখতে পারে, এমন ক্ষমতা দয়াল ঘোষের নেই।

ফলে দয়াল ঘোষকে বাদ দিয়েই যাত্রা শুরু করতে হয়েছে ওদের। ছোট-নাগপুর থেকে যে আঠারোজন ওঁরাও মুণ্ডাকে ধরে আনা হয়েছে তাদের তোলা হয়েছে ভিন্ন একটা নৌকোয়। পুরনোরা উঠেছে দুটো নৌকোয় ভাগাভাগি হয়ে। একটা নৌকো রাখা হয়েছে কেবল ওদের মালপত্র খাবার-দাবার বইবার কাজে।

অতি ভোরে যখন ওরা যাত্রা শুরু করল তখন ঘাটে সে এক দৃশ্য। চৌধুরী-রাজাদের কুলপুরোহিত জনে জনে আশীর্বাদ ছড়ালেন, যাত্রা তোমাদের শুভ হোক, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। মেয়েরা শাঁখ বাজাল, উলুধ্বনি দিল। নরেন্দ্রনারায়ণ আশীর্বাদ কুড়োতে কুড়োতে বজরায় উঠলেন।

উঠলেন বটে, তবে দয়াল ঘোষের জন্ত মনের মধ্যে একট খিঁচ থেকেই গেল। দয়াল ঘোষের যেন আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সুন্দরবন থেকে ফিরে আসার পরই লোকটা যেন পালটে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। কি বেশভূষায়, কি তার আচার-আচরণে, কথায়-বার্তায়। অথচ এই লোকটাই একদিন সুন্দরবন নিয়ে কত উৎসাহী ছিল।

—আপনার কি হয়েছে বলুন দেখি, চেহারাটা তো সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো করে ফেলেছেন। প্রশ্ন করেছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

দয়াল ঘোষ একটু মলিন হেসেছিলেন, বাইরের চেহারাটাই আসল নয় ছোটকর্তা। বাইরে আমরা যা দেখি তার কতটুকুই বা সত্যি!

—কি হয়েছে বলবেন তো?

—কি আবার হবে। কিছুই হয়নি। যা ছিল তাই আছে। পৃথিবী যে নিয়মে চলা শুরু হয়েছিল সেই নিয়মেই চলছে। আপনার আমার সাধ্য কি তা পাল্টাই।

—মানে?

—মানে বুঝবার এখনো সময় হয়নি আপনার। যে কাজে যাচ্ছেন, যান, ঘুরে আসুন।

থমকে গিয়েছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ, সুন্দরবনে যাওয়া আমার উচিত হবে না বলছেন ?

—না না, তা কেন। তবে ওই বনে গিয়েই আমার চোখ খুলেছে।

—কি যে হেঁয়ালি করছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—হেঁয়ালি করব কেন! আমি একটা কথা সার বুঝেছি ছোটকর্তা, ঈশ্বরের নিয়ম কেউ পাল্টাতে পারে না।

—তার মানে, আপনি বলছেন, সুন্দরবনের জঙ্গলটুকু পরিষ্কার করে ওখানে আবাদ করা যাবে না ?

—না, তা বলি না। তেমন কথা বলার ক্ষমতা নেই।

—তবে ?

—কি তবে! আমাকে আমার মতো থাকতে দিন ছোটকর্তা। আপনার তো লোকের অভাব নেই। আবাদ আপনার হবেই। আবাদে লাঙলের ফলাও পড়বে।

নরেন্দ্রনারায়ণ দাপটে বলেছিলেন, দেখা যাক, পারি কিনা। হাত যখন দিয়েছি শেষ না দেখেও আমি ছাড়ব না। তবে নায়েবের একটা সমস্যা আপনি বাড়িয়ে তুললেন।

—ইচ্ছে করলে আমাকে আপনারা রেহাই দিতে পারেন ছোটকর্তা। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আর মাথা ঘামাতে সাধ নেই আমার।

নরেন্দ্রনারায়ণ আরো অবাক হয়েছিলেন, চৌধুরীরাজাদের নায়েবী করার সম্মান বড় কম নয়। প্রতিপত্তি কি কম! কিন্তু কি এমন ঘটেছে দয়াল ঘোষের যে এত বড় সম্মান উনি এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারছেন!

—আপনার বাপ চোদ্দ পুরুষের ইতিহাস আপনি ভুলে গেছেন দয়ালবাবু।

দয়াল ঘোষ স্মিত হেসেছিলেন, না, ভুলিনি। এখনো মহালয়ায় আমাকে পিতৃতর্পণ করতে হয়।

—বেশ। যা আপনি ভাল বুঝবেন তাই করবেন। হতাশ হয়েছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

অন্যদিকে রজনীর উৎসাহ যেন দশ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। রজনী যেন কোনো রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে। প্রতিদিন সলা-পরামর্শের অন্ত নেই।

কত হিসেব-নিকেশ। লোকটার বিদ্যে বলতে অ আ ক খ, তবু ভাবভঙ্গিতে মস্ত এক পণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বলেছিলেন, সবই তো বুঝলুম কিন্তু টাকাগুলো শেষপর্যন্ত জলে যাবে না তো? তিন চার মাস ধরে এতগুলো লোকের মাইনে গোনা, খাইখরচ, ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে না তো বাপু?

—কি যে বলেন, আমি রজনী মাইতি, এক মাসেই দেখুন না, কাজ কতটা এগিয়ে দিই। আসলে করাতে জানলে কাজ না হয়ে পারে না। তবে হ্যাঁ, রক্ত জল করে জঙ্গলের সঙ্গে লড়ব, আখেরে আমাকে ভুলে যাবেন না যেন হুজুর।

নরেন্দ্রনারায়ণ হেসেছিলেন, এমন ভাব করছিস যেন যেতে না যেতেই আবাদ হয়ে যাচ্ছে।

—যেতে যেতে না হলেও মাস তিনেকের বেশি আমি সময় নেব না, দেখবেন। আমার চেয়ে ভাল লোক যদি হাতে পান হুজুর, আমাকে সরিয়ে দেবেন, দুঃখ নেই। আসলে কি জানেন, একটা রোখ চেপে গেছে। অমনভাবে নিজেদের বোকামির জন্ম পালিয়ে না এলে বোধহয় অমন হত না।

নরেন্দ্রনারায়ণ হিসেব করে দেখলেন, একটা মাস প্রায় আলোচনা করতে করতেই পার হয়ে গেছে। কেবল জল্পনা-কল্পনা ছাড়া কিছুই হয়নি এই এক মাসে। এখন ডিসেম্বর মাস শেষ হয়ে আসছে। এরপর শীত চলে গেলে বসন্তের বাতাসের সঙ্গে নদীর চেহারা হয়ে উঠবে দামাল। নতুন বাদায় ধুলোর ঝড় নাকি সাংঘাতিক। ঝড়বাদল শুরু হয়ে যাওয়ার আগেই কিছু করে ফেলা উচিত।

অবশেষে তিনি দিন ঠিক করে রজনীকেই সব কিছু গোছগাছ করে নিতে আদেশ দিলেন। দিন সাতেক সময় দিলাম তোকে, এর মধ্যে যতটা পারিস গুছিয়ে তৈরি হয়ে নে। আর আমার বজরাটাকেও গুছিয়ে ফেল।

—আপনার বজরা!

—হ্যাঁ, আমিও সঙ্গে যাব। তোদের কাজ শুরু করিয়ে দিয়েই আমি ফিরে আসব।

ছোটকর্তা সঙ্গে যাবেন। খবরটা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল। তলব পড়ল ওঁর ঠাকুর চাকরের। তলব পড়ল পানিহাটির কামিনীবালার।

সাতটা দিন যা উত্তেজনার মধ্যে কাটল কে তা বর্ণনা করবে।

যাত্রার ঠিক আগের দিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নরেন্দ্রনারায়ণের। প্রথম রাতে অল্প অল্প নেশা করেছিলেন, নেশার তরল আমেজটুকু কখন যেন ঘুমের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল।

ঘুম ভেঙে যেতেই উনি ঝটপট করে উঠে বসলেন। ঘরে ঝাড়লণ্ঠনের আলো, স্বপ্নিল একটা পরিবেশ। মশারির নেট হালকা কুয়াশার মতো যেন ছড়িয়ে ছিল ওঁর চারপাশে। অথচ ঘরের প্রতিটি আনাচ-কানাচও উনি চিনতে পারছিলেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ কৌতুকে দেখলেন, মশারীর ঠিক একটি পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে উর্মি।

—একি! উর্মি, তুমি!

উর্মির দেহে হালকা পোশাক। চোখদুটো আশ্চর্য শীতল।

—কিছু বলবে?

উর্মি ওর পাশটিতে এগিয়ে এল, কবে ফিরবে?

—শুধু এই কথাটি জানার জন্ম এত রাত জেগে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছ? কি বলতে চাইছ বল না উর্মি?

কাছে টেনে নিয়েছিলেন উর্মিকে।

—কিছু না, উর্মি মুখ নামিয়ে এনেছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ নিবিড়ভাবে ওকে বুকে টেনে নিলেন, পাগল! চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে দিলেন।

—কথা দাও, শরীরের যত্ন নেবে?

—অযত্ন করব কেন! ঠাকুরচাকর সবই তো সঙ্গে যাচ্ছে।

—শুধু ঠাকুরচাকর, আর কেউ না?

—কে আবার! কৌতুকে উর্মির মুখখানা সামনের দিকে টেনে ধরেছিল নরেন্দ্রনারায়ণ।

—শুনলাম পেনেটিতে খবর পাঠিয়েছ?

হেসে উঠলেন নরেন্দ্রনারায়ণ, তাই বল, এ কথার জন্ম এত রাত অবধি জেগে আছ?

উর্মির চোখ বেয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল নরেন্দ্রনারায়ণের বাহুর উপর পড়ল। নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, সামান্ত একটু ফুর্তি করব, তাতেও তোমার আপত্তি থাকে তো বল, নেব না ওকে।

উর্মি বাকরুদ্ধ পাথর।

নরেন্দ্রনারায়ণ ওঁকে আদর দিয়ে ভরিয়ে তুললেন, চৌধুরী বংশের ছেলেরা ওই ভাবেই তো এতকাল কাটিয়ে আসছে উর্মি। কেউ কখনো তার স্বামীকে তো শেকলে বেঁধে রাখেনি।

—আমিও তোমাকে শেকলে বেঁধে রাখব না। তোমার যা খেয়াল তুমি তা করবেই জানি। কথা দাও, শরীরটাকে যত্নে রাখবে।

—রাখব, রাখব, রাখব। তিন সত্যি করেছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। এই যেমন দেখছ, ঠিক এরমকটিই আবার ফিরে আসব। তোমার জিনিস তোমার হাতে যখন ফিরে আসবে, দেখ, এতটুকু আঁচড় লাগেনি গায়ে। যাও, এখনো রাত আছে, একটু ঘুমিয়ে নাও গে যাও।

—কিন্তু কবে ফিরবে বললে না তো?

—দু-চার দিন পরেই ফিরে আসব। মনে কর না বাগানবাড়িতে মাঝে মাঝে যেভাবে গিয়ে থাকি, এবারও সেইরকমই যাচ্ছি।

—বাগানবাড়ি যাওয়া আর সুন্দরবনে যাওয়া কি এক হল! কত রকমের বিপদ-আপদ ওখানে।

নরেন্দ্রনারায়ণ মৃদু একটু হাসলেন, পাগল! তিনটে বন্দুক থাকছে সঙ্গে। লোকজন যাচ্ছে প্রায় সত্তরজন। তাছাড়া তুমি যার সহায় কে তার ক্ষতি করবে বল। যাও, ওঠ এবার। ভোর হয়ে আসছে।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকো ছাড়ল ওঁদের। বজরার ভিতরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নরেন্দ্রনারায়ণ জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। নদীর অফুরন্ত জল, যেন বিপরীতমুখী ছুটে যাচ্ছে। দুপারে নতুন নতুন জনপদ, অপরিচিত সংসার। তাকিয়ে থাকতে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

একটানা দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে ঝপ্, ঝপ্, ঝপ্...

অন্যান্য নৌকোগুলি চলেছে মাঝ নদী দিয়ে মিছিলের আকারে। হালের মাঝিরা একে অন্যের দূরত্বটুকু সমানভাবে বজায় রেখে চলেছে। দাঁড়িদের নিকষ কালো পাথরের মতো চেহারা, দাঁড় টেনে প্রায় চিত হয়ে পড়ছে একতালে। দশ দাঁড়ির টান, বার দাঁড়ির টান, নৌকোগুলি গোঁত খেতে খেতে এগোচ্ছে।

ঝপ্‌স ঝপ্, ঝপস্ ঝপ্...

দুপুর অবধি একইভাবে বসে চুপটি করে কাটিয়ে দিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

দুপুরে প্রতিদিনই ঘুমোবার অভ্যেস। আজ খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা নভেল নিয়ে বসলেন। কিন্তু বাইরের আকাশটাকে বড় মধুর লাগছিল। নাম-না-জানা কত পাখি লাট খাচ্ছে আকাশে। সন্ধ্যার মুখোমুখি মাতলা ঢোকে নৌকো। তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে শুরু হবে বাদা। এখন এই যে দু'পাশে ধানী জমি দেখছেন কে জানে এখান থেকে সুন্দরবন উৎখাত হয়েছে কবে!

বৃথাই নভেল খুলে বসেছিলেন, একটা লাইনও উনি পড়তে পারলেন না। চোখ থেকে ঘুম আজ পুরোপুরি উধাও।

আরো একটু বেলা পড়লে বিকেলের দিকে কনকনে একটা ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হল। সমস্ত দেহটাকে যেন শুষে নিতে শুরু করল। নরেন্দ্রনারায়ণ রজনীর তলব করলেন।

রজনীর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। ছোটকর্তার গলা পেয়ে নতজানু হয়ে বজরার ভিতর ঢুকে পড়ল, কিছু বলবেন হুজুর?

—কামিনী কি করছে?

—ছাদে বসে আছে।

—কি করছে ওখানে? পাঠিয়ে দে, ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেলুম।

—দিচ্ছি হুজুর।

রজনী আবার মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল। সামনের দিকে কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে বজরার উপরে। দু'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে রজনী কামিনীর দিকে তাকাল।

কামিনী হাঁটু ভাঁজ করে বসে মাথা দুইয়ে জলস্রোত দেখছিল, হঠাৎ চমকে উঠল।

রজনী চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল ছোটকর্তা ডাকছেন। তারপর আবার নেমে এল রজনী।

ঠাণ্ডা বাতাসে রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে খারাপ লাগছিল না কামিনীর। মাথায় ঘোমটা টেনে বসেছিল। কমলা রঙের বুটিদার শাড়ি পরনে। হাতের কবজি অবধি জামার ঝুল, কলকা বসানো। আঙুলের নখ রং পালিশে ঝকঝকে করছে। হাতে বিশ গাছা করে কাচের চুড়ি, একটু নড়তেই মিষ্টি একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ে।

চুল বাঁধার সময় ছিল অঢেল, কিন্তু আরশি কাঁকুই নিয়ে বসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। পিঠ ভর্তি খোলা চুলের ঢল নেমে আছে। ভেবেছিল আর একটু পরেই এখানে বসে চুল বেঁধে নেবে। কিন্তু আর দেরি করা যায় না। কামিনী পা গড়িমসি করতে করতে নেমে এল।

—ডাকছিলেন?

নরেন্দ্রনারায়ণ নভেলটাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে একটা হাই কাটলেন, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না? একটা চাদর গায় দিলেও তো পার।

কামিনী আরো খানিকটা এগিয়ে গ্রীবাভঙ্গি করল, শীতটা এখন বাইরের চেয়ে ভিতরেই বেশি। বলুন তো বোতল খাজিয়ে দিই।

—তাই না হয় দাও। এখন এ কদিন তোমার দয়াতেই এই অধমকে থাকতে হবে।

—ইস রে, কেবল মুখে মুখেই।

কামিনী একপাশে সরে এসে কাঠের পেটি থেকে একটা হুইস্কির মুদৃশু বোতল বার করল। বেতের ট্রে নামিয়ে নিল দেওয়াল থেকে। গেলাস বার করল গোটা তিনেক।

নরেন্দ্রনারায়ণ দেখছিলেন, শাড়ি পরা ঘরের গৃহিণীর মতো দেখাচ্ছে এখন কামিনীকে। কে বলবে মেয়েটাকে নিয়ে কিছুদিন আগেও রুটি ছিঁড়ে কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর মতো খেলা করেছিল ওরা বন্ধু-বান্ধবরা মিলে। মেয়েটার সহ্য-শক্তিও অসীম।

এবার আর কদিন পরেই ক্রীসমাস। কামিনীকে নিয়ে বাগানবাড়িতে কাটানোর পরিকল্পনা মনে মনে করে রেখেছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। ভালই হল কামিনীর সঙ্গে ক্রীসমাস এবার সুন্দরবনেই কাটবে।

কলকাতায় ক্রীসমাসের দিনগুলোর কথা ওঁর মনে পড়ল। আলো দিয়ে গোটা কলকাতাকে যেন সাজিয়ে ফেলা হয়। পথে-ঘাটে শুরু হয়ে যায় সাহেব-সুবোদের বেলেল্লাপনা। খোল করতাল নিয়ে পাতিখ্রীশ্চানদের নগর পরিক্রমা এখনো যেন চোখের পাতায় স্বপ্নের মতো জড়িয়ে আছে।

গত বছরও নরেন্দ্রনারায়ণ এমন দিনে বাগানবাড়িতে কাটিয়েছেন। তখনো কামিনীর সন্ধান ছিল না ওঁর। ভাড়া করা বাইজী এনে গানের আসর বসিয়েছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গলাগলি, হুইস্কি পান আর এলোমেলো সাহেবি ঢংয়ে নাচ এখনো সেসব কথা মনে পড়লে কেমন যেন রোমাঞ্চ বোধ করেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

বোতল থেকে গ্লাসে ঢালার পর কামিনী বেতের ট্রেটা এগিয়ে ধরল। নরেন্দ্রনারায়ণ অবাক হয়ে তাকালেন, সে কি তুমি খাবে না?

—আপনিই খান না।

—মাথা খারাপ, এসব কি কখনো একা খাওয়া যায়। দেখি বোতল দাও।

বোতল থেকে আর একটা গ্লাসে ঢেলে দিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ, নাও, শুরু কর। চিয়ারস। কিছু খাবার দরকার যে। কিছু খাবার দিতে বল না রজনীকে।

—বলছি। কামিনী ঝুঁকে বজরার বাইরে এল। রজনী তখন বজরার ছাদে। কামিনীকে দেখেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

কামিনী বলল, কেমন আক্কেল হে তোমাদের। বিকেল গড়িয়ে চলেছে সাহেবকে খাবার দেবে না ?

ওপাশে ছোট্ট ঘেরা জায়গায় কয়লার উনোন জলছে, রজনী বাবুর্চির দিকে তাকাল, তোমরা কি বেড়াতে এসেছ নাকি হে, ছোটকর্তার খাবার কোথায় ?

—এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি রজনীভাই।

কামিনী বলল, আর দেরি কর না, যা হোক কিছু ভাজাভুজি পাঠিয়ে দাও।

—পাখির মাংস কষে দিচ্ছি কামিনীদি।

'কামিনীদি' ডাকটা বড় বেখাপ্পা হয়ে কানে বাজল। কামিনী তবু গাম্ভীর্য রেখে বলল, তাই দাও, দেরি কর না।

আবার বজরার ভিতরে ঢুকে পড়ল কামিনী। কাশ্মীরী একটা চাদর গায়ের ওপর বিছিয়ে নিয়েছেন নরেন্দ্রনারায়ণ। জানলার পর্দাটা খোলা। বাইরের চলমান দৃশ্যগুলিকে চোখের আড়ালে রাখতে চান না উনি। জলের একঘেয়ে শব্দটাও বড় ভাল লাগছিল ওঁর।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, বেশ আরাম করে বস দেখি। বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে থাকলে খুব জমে যেত আজ, কি বল ?

কামিনী মুখোমুখি জানলার বিপরীত পাশে বসে পড়ল। আমার কিন্তু দুজন-একজনই ভাল লাগে। প্রাণ খুলে তবু দুটো-চারটে কথা বলা যায়। একগাদা লোক হলে কেমন যেন হাট-বাজারের মতো মনে হয়।

—তাই বুঝি ! নরেন্দ্রনারায়ণ নিঃশেষে গেলাসটাকে শেষ করে ফেলতেই আবার ঢেলে দিল কামিনী। জানলার বাইরে আবার চোখ পড়তেই দেখলেন, ওপাশের নৌকোয় হাত বদলা-বদলি করছে দাঁড়িরা। গা-হাত-পা বাঁকা করে হাই তুলে আড় ভাঙছে। ঘামে জবজব করছে গায়ের চামড়া। এই শীতের মাঝেও লোকগুলি ঘেমে উঠতে পারে দেখে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল ওঁর। গামছায় গা মুছে নিচ্ছে কেউ কেউ। এই না হলে জংলি বলে ওদের। কেউ আবার খেলো হুঁকোতে ঠোঁট লাগিয়ে তামাক টানছে। আগুনের কণা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে। এ গলুইয়ের হুঁকো ঘুরতে ঘুরতে ও গলুইয়ে চলে যাচ্ছে। বেশ মজা লাগছিল নরেন্দ্রনারায়ণের।

—কি দেখছেন ?

—দেখছি, ভগবানের তৈরি কিছু জীব কেমন পরিশ্রম করে বেঁচে আছে।

কামিনী কৌতুকে নরেন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—দেখছি কত সুখে ওরা বেঁচে আছে। শীত গ্রীষ্মকে ওরা বশ করে রেখেছে

দেহের ভিতরে। মাঝে মাঝে সত্যি লোকগুলোর কথা ভাবলে কেমন মজা লাগে।

—ভাবেন আপনি ?

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর দিকে মুখ ফিরিয়ে আনলেন, কেন, যদি নাই ভাবব জমিদারি রাখতে পারতাম! ওদের জন্য কত পয়সা খরচ করতে হয় জান ?

কামিনী মিষ্টি করে হাসল, আপনি পয়সারও হিসেব করেন বুঝি ?

—আমাকে কি ভাবো বল দেখি! নরেন্দ্রনারায়ণ নিজেই আবার খানিকটা ঢেলে নিলেন গেলাসে। তুমি খাচ্ছ না কামিনী ?

—খাচ্ছি তো। কামিনী গেলাস তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল।

এমন সময় থালায় খাবার সাজিয়ে বাবুর্চি ঢুকল, সঙ্গে রজনী।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, এই রজনীকেই জিজ্ঞেস কর না, সুন্দরবনের পিছনে কত টাকা আমি খরচ করছি। যা খরচ করছি তার এক কানাকড়িও যদি ফিরে পাই।

রজনী কামিনীর দিকে তাকাল। কামিনী চোখের ইশারায় জানাল, নেশা! তরল একটু আমেজ এসে আবিষ্ট করে তুলতে শুরু করেছে ওঁকে।

রজনী চোখ নামিয়ে আবার ধীরে ধীরে কুঠুরির বাইরে চলে এল।

বাবুর্চিও বেরিয়ে যাওয়ার পর কামিনী আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এল নরেন্দ্রনারায়ণের কাছে, আমি আপনাকে খাইয়ে দেব রাজা।

—রাজা! বাহ্ বেশ বলেছ তো পেনেটির কামিনী!

কামিনী এক টুকরো মাংস তুলে ধরল নরেন্দ্রনারায়ণের মুখের সামনে।

—রাজা বলে যখন ডেকেছ, নিশ্চয়ই খাব, দাও।

—উহ্, আঙুল সরিয়ে নিল কামিনী।

দাঁত বসিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্রনারায়ণ। তারপর হোহো করে উচ্চস্বরে হেসে উঠেই কামিনীকে আরো কাছে টেনে নিলেন।

—কামড়ালে লাগে না বুঝি ? সারা গায়ে অভিমান জড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করল কামিনী।

—লেগেছে, আহা ষাট ষাট। আঙুলের ডগায় যত্ন করে একবার চুমু খেলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

—এদিকে আবার আপনি গেলাস ফাঁকা করে ফেলেছেন। আরো দিই ?

—দেবে ? দাও। ভর্তি করে ঢেলে দাও। আজ আমি সত্যি সত্যি রাজা।

কামিনী গেলাসটাকে তুলে ধরল নরেন্দ্রনারায়ণের ঠোঁটের কাছে। আর আমি ?

—তুমি ! তুমি কে ? নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

—আমাকে চিনতে পারছেন না ? দেখুন, ভাল করে একবার দেখুন না আমাকে।

নরেন্দ্রনারায়ণ দু' হাতের পাঞ্জায় কামিনীর মুখটাকে তুলে ধরলেন, হ্যাঁ, চিনেছি, তুমি বাঁদী।

কামিনী সহস্র মণি-মুক্তোর মতো হেসে উঠল, আদাব জাঁহাপনা।

জানলার বাইরে ততক্ষণে তরল একটা অন্ধকার ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে। রজনীর সাহস হচ্ছিল না এই শ্বাসরুদ্ধ সময়ে বজরার ভিতরে ঢুকে ঝাড়লণ্ঠনের আলোগুলো জালিয়ে দিয়ে যায়।

আলোর জন্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত ছিলেন না নরেন্দ্রনারায়ণ। সমস্ত দেহের ভিতরে সাপের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে নেশার আমেজটা ওঁকে আচ্ছন্ন করে আনছে। নেশা নেশা নেশা। কখন যেন কামিনীর বুকে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়লেন উনি।

রাত্রির গভীরে হঠাৎ আবার কেমন যেন চমকে উঠলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। স্বপ্ন না জাগরণ, উনি বুঝতে পারলেন না। মনে হল, শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে শীতল চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে ঊর্মি।

—ঊর্মি, তুমি ? কিছু বলবে ?

কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঊর্মি মিলিয়ে গেল।

নরেন্দ্রনারায়ণ পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠলেন। দেখলেন ওঁরই পাশটিতে কামিনী অচৈতন্ত হয়ে পড়ে আছে। উদ্ধত আগুনের শিখার মতো ওর সারা গায়ে টলমল করছে যৌবন, চোখ ফেরানো দায় হয়ে ওঠে।

কিন্তু, আবার কি কথা বলতে এসেছিল ঊর্মি ! কি এমন গুরুতর কথা এতকাল ধরে ও আমাকে বলতে পারেনি ! কি কথা ?

এগার

রাতের দিকে বাতাসে খানিকটা জোর বাড়ায় নৌকোয় নৌকোয় পাল খাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম রাতে কুয়াশা তেমন ঘন ছিল না, কুয়াশা কতটা জমবে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। শেষ রাতের দিকে এমন কুয়াশা পড়ল যে

দূশ হাতের জিনিসও ভাল করে মালুম হয় না। এ কুয়াশায় দিক নির্ণয় করা কঠিন কাজ, তবু জলের টান বুঝে বুঝে নৌকো বাওয়া হয়েছে। আর কুয়াশার দাপটে শীত কমে যাওয়ায় মাঝিদের একদিকে বরং লাভই হয়েছে।

নৌকো বুড়োবাসুকিতে ঢোকার পর বোঝা গেল, নদীর চেহারা ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। ঢেউ তেমন বেশি নয়, কিন্তু জলের ঘোলাটে ভাবটা বেড়েছে। মাঝে মাঝে কিছু বাদা ঠাহর করা যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে টানা অরণ্য।

রজনী অনেক রাত অবধি বজরার ছাদে কম্বল গায়ে বসে কাটিয়ে দিল। লক্ষ্যস্থান যত এগিয়ে আসছিল ততই যেন ওর দুশ্চিন্তা বাড়ছিল। আজ ভাল মন্দ সব দায়িত্বটাই ওর। মাথার ওপর দয়াল ঘোষ থাকলে হয়তো এতখানি অতন্দ্র থাকতে হত না ওকে। তাছাড়া নরেন্দ্রনারায়ণ সঙ্গে আছেন বলেই দুশ্চিন্তাটা যেন হাজার গুণ ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ খেয়ালি লোক, সুন্দরবনের মাটিতে পা দেওয়ার পর হঠাৎ যে তাঁর মতি পালটে যাবে না, কে বলতে পারে! ফলে, নরেন্দ্রনারায়ণকে সারাক্ষণ খুশি রাখার চেষ্টা করতে হচ্ছে রজনীকে। তবুও স্বস্তি নেই।

ভোর রাতের দিকে অবশেষে শুয়োরের মুখের মতো দ্বীপটাকে ওরা খুঁজে পেল। নৌকোয় নৌকোয় কলরব শুরু হতেই টানটান হয়ে উঠে বসল রজনী।

—হ্যাঁ, ওই তো সেই পুরনো কাছারি বাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে। এত কুয়াশার মধ্যেও বাড়িটাকে ওরা চিনতে ভুল করল না। বাড়ির চারপাশে পরিখা কাটা কিন্তু সেই তকতকে উঠোনটা গেল কোথায়! সেই বাঁশ বেখারির বেড়াটা! মনে হল, জঙ্গল যেন গ্রাস করে নিয়েছে সব। জঙ্গল যে এত দ্রুত বেড়ে উঠবে কে জানত! আর কিছুদিন সময় পেলে বোধহয় পুরো কাছারিবাড়িটাকেই গিলে খেত জঙ্গল।

মনে পড়ল দয়াল ঘোষের কথা। ওই কাছারিবাড়িতে দয়াল ঘোষকে আর দেখা যাবে না। এখন থেকে ওই ঘরে থাকবে রজনী। দয়াল ঘোষের জায়গায় এখন রজনী, কথাটা ভাবতেই বেশ একটু উত্তেজনা এসে আচ্ছন্ন করল রজনীকে।

মাঝিরা গেরাফি ফেলতে শুরু করেছিল। রজনী সিঁড়ি বেয়ে বজরার ছাদ থেকে নিচে নেমে এল। এখন ভাঁটা চলছে নদীর। মাঝ ভাঁটা। নৌকো থেকে নামতে গেলেই এক হাঁটু কাদার মধ্যে ডুবে যেতে হবে। কাদা আর জল আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। আর একটু ফরসা হয়ে রোদ উঠলে দেখা যাবে, কাদায় নোনা কুচে আর লাল কাঁকড়া ছুটোছুটি করছে। ভেড়ির

গায়ে চন্দনের মতো প্রলেপ লেগে আছে কাদার। আঃ কী নরম! কিন্তু এই ভোরে মাটি যে এখন বরফের মতো শীতল হয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই।

রজনী চমকে উঠল, এই কাদার মধ্যেই ঝপাঝপ করে কেউ কেউ নৌকো থেকে নেমে পড়েছে। চেঁচিয়ে সবাইকে বারণ করতে ইচ্ছে হল ওর, কিন্তু বজরায় দাঁড়িয়ে চেঁচালে নরেন্দ্রনারায়ণ জেগে উঠবেন। এত ভোরে ওঁকে জাগিয়ে তোলা উচিত হবে না। তাছাড়া এত ভোরে কাছারিবাড়ির দিকটাও স্পষ্ট নয় যে ওঁকে ডেকে তুলে সব দেখানো যাবে।

রজনীকে তাই বাধ্য হয়ে কাদায় নামতে হল। নরেন্দ্রনারায়ণের দেহরক্ষী প্রসাদ সিংকেও নেমে আসতে ইশারা করল রজনী।

বন্দুক হাতে লাফিয়ে নেমে এল প্রসাদ সিং। কিন্তু কাদায় পা পড়তেই গা ছমছম করে উঠল। এত ভোরে কোথাও কিছু ঘাপটি মেরে থাকলেও টের পাওয়ার উপায় নেই।

রজনী এক হাঁটু কাদা নিয়ে তরতর করে ভেড়ির উপর উঠে এল। ভেড়ির ওপাশ থেকে শুরু হয়েছে কোমর উঁচু জঙ্গল। জঙ্গলের দিকে একবার তাকাল রজনী, কুয়াশায় স্পষ্ট ঠাহর করা যায় না। কেমন যেন জালের মতো দৃষ্টি জুড়ে ছড়িয়ে আছে গাছপালা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগন্তুকদের যেন ওরা লক্ষ্য করছে।

রজনী ভেড়ি ধরে খানিকটা এগিয়ে এল অন্যান্য নৌকোগুলির কাছে। মকবুলের গলা শুনতে পেল রজনী। মকবুল গলা তুলে চেঁচিয়ে কি যেন সব বলছে। কি বলছে মকবুল! রজনী দাঁড়াল। প্রসাদও থমকে রজনীর পাশে দাঁড়াল।

এই অন্ধকারে হুট করে এমন ডাঙায় নামা যে উচিত হয়নি সেই কথাই যেন বলতে চাইছে মকবুল।

রজনী তৎপর হয়ে উঠল, এই, ওঠ ওঠ। কে হে তুমি? কি সাহস তোমার! সবাইকে আবার তাড়া করে ডাঙা থেকে নৌকোয় তুলে দিল রজনী।

তারপর বার কয়েক ভেড়ির এপাশ ওপাশ করল। কাছারিবাড়ির জীর্ণ চেহারাটা এখান থেকে আরো স্পষ্ট।

ঈশানের গলা শুনতে পেল রজনী। ঈশান বলছে, আবার গোড়া থেকে সব কিছু শুরু করতে হবে গো রজনীভাই। দেখেছ, কি হাল হয়েছে বাড়িটার?

রজনী বলল, নৌকো থেকে এখন কেউ যেন না নামে লক্ষ্য রাখিস ঈশান। কেউ নেম না হে, সাবধান করে দিচ্ছি।

ভেড়ি ধরে আরো খানিক এগিয়ে রজনী হঠাৎ প্রসাদকে আঙুল তুলে

দেখাল, ঐ যে ভাঙা বাড়িটা ওখানে আগে দয়াল ঘোষ থাকত। এক মাসের মধ্যেই বাড়িটার কি চেহারা হয়েছে দেখ।

প্রসাদ ভাল-মন্দ কি বুঝল কে জানে, তাকিয়ে থাকল।

রজনী শুধাল, বন্দুকে গুলি ভরা আছে তো? চল না একবার দেখে আসি।

প্রসাদ বলল, চলুন।

এক হাঁটু জঙ্গল। গাছের পাতা জলে ভিজে জবজব করছে। দু' হাতে সেই ভেজা পাতা সরাতে সরাতে রজনী কাছারিবাড়ির বেড়াটাকে ডিঙিয়ে এল। কিন্তু বেড়া পার হয়েই পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রজনী।

—কে?

প্রসাদ কিছুই বুঝতে পারল না। বন্দুকটাকে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল, কি? কি রজনীভাই?

না না, চোখের ভুল রজনীর, ও কিছু না।

কিন্তু কাছারিঘরের দরজাটা অমন হাট করে খুলে রাখলে কে? ওটা তো ভাল করে দড়ি আর তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল বলে স্পষ্ট ওর মনে পড়ছে। তবে কে খুলল!

সন্দেহটা যেন গভীর হতে শুরু করল ওর।

আবার কেমন চমকে উঠল রজনী। কেমন একটা শব্দ আসছে না ভিতর থেকে! কিসের শব্দ!

—প্রসাদ সিং! রজনী ফিসফিস করে ডাকল।

—জী!

—কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ? কি যেন একটা চলাফেরা করছে না ঘরের ভিতর?

—জী রজনীভাই।

—তবে কি কোনো মানুষ! কিন্তু কোন মানুষের এমন সাহস হবে এই সুন্দরবনের জঙ্গলে ওই ঘরে একা বাস করবে!

—বন্দুকটা এদিকে দাও তো প্রসাদ সিং! রজনী বাহাদুরের হাত থেকে বন্দুকটা তুলে নিল।

—চল দেখি, ভেতরে একবার দেখার চেষ্টা করি। বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল তুলে রেখে এগোতে শুরু করল রজনী।

শুকনো একটা গরানের ডাল কুড়িয়ে নিল প্রসাদ সিং। শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে রজনীর গায় গায় এগোতে শুরু করল।

আঙুল কাঁপছে কি। রজনী ঠিক বুঝতে পারল না। সতর্কভাবে বন্দুকটাকে আবার চেপে ধরল।

আরো দু-এক পা এগোবার পর আবার থমকে দাঁড়াতে হল, কাছারিঘরের দিক থেকে বিশ্রী একটা গন্ধ ভেসে আসছে। ঝাঁজাল গা-গুলানো গন্ধ। তবে কি কিছু মরে পড়ে আছে ওখানে? বুঝতে পারল না।

কাছারির দরজার কাছাকাছি এসে এপাশে ওপাশে ঝুঁকে উঁকি দেবার চেষ্টা করল ওরা। জটিল অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। বন্দুকটা এ সময় হাত থেকে কিছুটা ঝুলে পড়েছিল, আর ঠিক এই সময়েই ঘোড়ায় সামান্য একটু চাপ লেগে গেল।

বন্দুকের শব্দে লাফিয়ে উঠল দু'জনে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই শব্দ।

থরথর করে গা ঝাড়া দিয়ে কেঁপে উঠল বনভূমি। ককিয়ে উঠল। গাছের ডালপালা থেকে লাখে লাখে পাখি ঝাপটিয়ে লাফিয়ে উঠল শূন্যে।

এমন সময় নজরে পড়ল, ঘরের ভিতর থেকে বিরাটকায় একটা জন্তু বেরিয়ে আসছে।

—কি ওটা! চিৎকার করে উঠল রজনী, বা বা বাঘ···

বাঘ! থতমত খেয়ে গেল প্রসাদ সিং।

সামান্য এক মুহূর্ত সময়, কি যে করবে ওরা ভেবে ওঠার আগেই জন্তুটা ওদের দু'জনের মাথার উপর দিয়ে প্রচণ্ডভাবে লাফিয়ে উঠোনের মাঝামাঝি এসে আছড়ে পড়ল। তারপর আবার কয়েকটা দীর্ঘ লাফ দিয়ে জঙ্গলের ভিতর মিশে গেল।

আরো একটুক্ষণ পরে আবার বাঘের গর্জন শুনতে পেল ওরা। আক্রোশে যেন গর্জে উঠেছে জন্তুটা। আকাশে পাখির ঝাঁক আবার লাফিয়ে উঠল। অসংখ্য পাখির চিৎকারে খলবল করে নেচে উঠল সমস্ত বনভূমি। যেন গোটা দ্বীপটাই বীভৎসভাবে অট্টহাস্য করে উঠল, হাহ্‌হা···হাহ্‌হা···

আর এরপর যে কি ঘটল রজনী মনে করতে পারে না। অকস্মাৎ ওর সমস্ত দেহটা ভারশূন্য হয়ে গেল। ধীরে ধীরে চেতনা হারিয়ে জঙ্গলের উপর ঢলে পড়ল রজনী।

প্রসাদ সিংয়ের এরকম জঙ্গলের কোন অভিজ্ঞতা নেই। চোখের সামনে দেখল, রজনী ঢলে পড়ে যাচ্ছে। প্রসাদ ঝট করে ওর হাত থেকে বন্দুকটা তুলে নিল। শেরটা কি এখনো ঐ জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে! এখনো কি ও নজর রেখেছে ওদের দিকে। নেহাতই যেন পরমায়ু ছিল ওদের, করুণা করেই

বাঘটা ওদের উপর আছড়ে না পড়ে ঐ জঙ্গলের দিকে চলে গেল। নেহাতই যেন ভগবান ওদের এ যাত্রা হতে প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন।

প্রসাদের ঘোর কাটতে একটু সময় লাগে। মাটিতে পা দিতে না দিতেই যে শের দেখা যাবে তা ও কল্পনাও করেনি। ঘরের ভিতর আরো কিছু আছে কিনা কে জানে। পচা গন্ধটা এখনো ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

একবার রজনীর দিকে তাকাল। ওকে টেনে-হিঁচড়ে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াও সোজা নয়। কি করবে ঠিক মাথায় আসছিল না প্রসাদের। ঘরের মধ্যে আরো কিছু লুকিয়ে আছে কি না কে জানে। ঘরের দিকেই উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল ও। আবছা আবছা অন্ধকারে কি যেন একটা ক্ষতবিক্ষত বস্তুকে ও দেখতে পাচ্ছে! কী ওটা? গরু না অন্য কিছু। গাইয়া না ভৈঁসা এখান থেকে বোঝার উপায় নেই। বিপুল দেহটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে গেছে বাঘে। পচা গন্ধটা যে এরই, এতক্ষণ পর ও বুঝতে পারল। আর ঠিক এ সময়ই ওর মনে হল বাঘের মুখের গ্রাস ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে। বাঘটা কি আশেপাশে গা ঢাকা দিয়ে ওদের ওপর নজর রাখেনি! নির্ঘাত ধারেকাছেই কোথাও লুকিয়ে থেকে ওদের দিকে নজর রেখেছে বাঘটা।

চারপাশে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে আঁতিপাঁতি করে তাকাল প্রসাদ। কুয়াশা আর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

রজনীকে ছেড়ে আরো দু'এক পা ও ঘরের দিকে এগোল। সত্যি সত্যি মৃত জন্তুটাকে চিনবার উপায় নেই। পেটের নাড়িভুঁড়ি উলটে-আসা গন্ধ! অথচ গন্ধটাকে তেমন গ্রাহ্য করল না প্রসাদ। ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে হঠাৎই আবার ও চমকে উঠল। ওটা কি! কড়িকাঠ বেয়ে কি ঝুলছে ওটা! সাপ কি, হ্যাঁ। সাপই।

শক্ত একটা দড়ির মতো ঝুলে আছে সাপ। বন্দুকের শব্দে বোধহয় সাপটা বুঝতে পেরেছে ওর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

বন্দুক তুলে এবার সাপের দিকে তাক করল প্রসাদ। অব্যর্থ টিপ। সাপটা ছিটকে পড়ল নিচে। দোমড়াতে শুরু করল। পাক খেয়ে খেয়ে গুটিয়ে যেতে শুরু করল। বেড়ার গায় ঝাপটা মারতে শুরু করল।

একটা গুলিতেই যে কাজ হয়েছে বুঝতে পারে প্রসাদ। ঘরের কাছ থেকে আবার ফিরে এল রজনীর কাছে। এভাবে এখানে আর বেশিক্ষণ রজনীকে ফেলে রাখাটা উচিত হচ্ছে না। প্রসাদ রজনীর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে আনে, এ রজনীভাই! এই—

না, কোন সাড়া নেই। মাথাটা এপাশ থেকে ওপাশে সরে গেল। .

রজনীর হাত ধরে ঝাঁকি দিল প্রসাদ। ওকে এখন কাঁধে তুলে নিতে পারলে কাজ হয়। কিন্তু হাতের বন্দুকটাকে নিয়েই সমস্যা। না, বন্দুকটাকে হাতছাড়া করা উচিত হবে না। প্রসাদ আবার জঙ্গলের মধ্যে আঁতিপাঁতি করে বাঘের হদিস করার চেষ্টা করল। মনে হল, যে কোন মুহূর্তে যেন ওটা এবার ওদের লক্ষ্য করে লাফাবে। এ অবস্থায় বন্দুকটাই একমাত্র ভরসা।

আরো দু-এক মিনিট কেটে গেল। তারপর এক দঙ্গল মানুষের হৈ-হল্লা শুনতে পেল প্রসাদ। নৌকোর লোকগুলোর যেন এতক্ষণ পর ওদের কথা মনে পড়েছে।

রজনীর নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হয়েছে, শুনতে পেল প্রসাদ। আর ঠিক এই সময়ই প্রসাদের চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে কি রকম একটা অবসাদ নামতে শুরু করল। নিজেকে এই আচ্ছন্নতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রসাদ ককিয়ে উঠল, এখানে, আমরা এখানে।

লোকগুলো লাঠিসোটা নিয়ে হৈহৈ করে ছুটে এল। এসে ছেঁকে ধরল প্রসাদকে, রজনীকে।

—কি, কি, কি হয়েছে ?

কিন্তু কি যে হয়েছে কিছুই বোঝাতে পারল না প্রসাদ। ওর গলা কাঠের মতো শুকনো। ওর পাদুটো কেমন যেন টলছে।

—কি হয়েছে বল না ? রজনীকে ততক্ষণে মাটি থেকে কাঁধে তুলে ধরেছে কয়েকজন।

প্রসাদ অনেক চেষ্টা করেও বোঝাতে পারল না, ওরা বাঘের মুখে পড়েছিল। অবশেষে অসহায়ভাবে ও আঙুল তুলে কাছারিঘরের ভিতর দিকটা দেখিয়ে দিয়ে টলতে টলতে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর হাঁপাতে শুরু করল।

প্রসাদকেও টেনে তুলল কয়েকজন। তারপর ধরাধরি করে ফিরিয়ে নিয়ে এল নৌকোয়।

আর মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ভয় আতঙ্ক কৌতুক ঘুরতে শুরু করল চোখেমুখে। প্রসাদ সিং সঙ্গে ছিল বলেই রজনী আজ প্রাণে বেঁচেছে। নেহাতই পরমায়ু ছিল রজনীর, নইলে এভাবে কেউ বেঁচে আসে!

মকবুল সেই থেকে বিড়বিড় করছিল, হবে না, তখন কত করে ডাঙায় নামতে বারণ করলাম, হবে না! অমনভাবে অন্ধকারে জেনেশুনে কেউ জঙ্গলে পা দেয়! তাছাড়া রজনীভাই তো আর নতুন নয়। জঙ্গলের প্রকৃতি ওর না-জানা নয়।

তৎপরতা বেড়ে গেল ঈশানের। ঈশ্বর, গজল, জগন্নাথ জটলা করে নতুনদের সব বিপদ-আপদের কথা বোঝাতে শুরু করল।

আর একটু বেলা হলে হৈহৈ করে কাছারির চারপাশে একবার খোঁজাখুঁজি করা হল। বাঘটা ধারেকাছেই যে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। মরা সাপটাকে বাঁশের ডগায় তুলে মজা করতে করতে নিয়ে এল কাঠুরেরা। বাঘের মুখের গ্রাস আধ-খাওয়া জন্তুটাকে টেনে বার করে আনা হল। কি এটা! হরিণ নাকি!

—হরিণ! কিন্তু শিং কোথায়?

কে একজন বলল, মাদী হরিণের শিং থাকে না। চামড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে হরিণ।

—হবে হয়তো!

কেউ এ নিয়ে বড় একটা প্রতিবাদও করল না। কিন্তু পচা জন্তুটাকে একেবারে নদীতে এনে ভাসিয়ে না দেওয়া অবধি গন্ধে এখানে বাঁচা যাবে না।

নাকে-মুখে কাপড় চাপা দিয়ে জন্তুটাকে টানতে টানতে নদীতে এনে ফেলা হল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওটাকে ভাসিয়ে দেওয়া হল স্রোতের সঙ্গে।

একটু একটু করে আরো বেশ খানিকটা ফরসা হয়ে উঠল চারদিক। কুয়াশায় ভেজা মাটি আর গাছপালা জঙ্গল সব কিছুই এখন স্পষ্টত চোখের সামনে ভাসতে শুরু করেছে। আর একটু পরেই রোদ উঠবে। দিগন্তের ফরসা দিকটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল পুব কোন্ দিকে।

জঙ্গল থেকে আবার সবাই ভেড়ির উপর উঠে আসছিল একে একে। রজনীরও পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এসেছিল। এর মধ্যে অনেকখানি ও নিজেকে প্রকৃতিস্থও করে ফেলেছিল।

ওদিকে নরেন্দ্রনারায়ণের বজরায় তখনো কোনো সাড়া-শব্দ নেই। এখনো উনি অকাতরে ঘুমুচ্ছেন বোধ হয়। বাইরে এত উত্তেজনা অথচ নরেন্দ্রনারায়ণকে ডেকে ঘটনাটা জানানোর মতো কারো সাহস ছিল না। একটু পরে ঘুম থেকে উঠলে উনি সবই জানতে পারবেন।

রজনীও নরেন্দ্রনারায়ণকে খবর দেবার জন্য আগ্রহ দেখাল না। হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। সুন্দরবনে বাঘ সাপ থাকবেই কিন্তু ডাঙাতে পা দিতে না দিতেই যে বাঘের মুখে পড়ে যেতে হবে কল্পনাও করা যায়নি। রজনী বাঘের কাহিনী শোনাতে শুরু করল, বাপরে কী বিরাট চেহারা। গা

দিয়ে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছিল অত বড় বাঘ রজনীর চোদ্দপুরুষও দেখেছে কিনা সন্দেহ।

—জেনেশুনে ওদিকে যাওয়া কেন নিজে তো সবাইকে বারণ করে দিচ্ছিলে নৌকো থেকে না নামতে।

—কাছারিঘরের দরজাটা অমন হাট করে খোলা দেখেই তো সন্দেহ হয়। রজনী বলল, নইলে কি এগোতাম নাকি। তাছাড়া বাঘ যে ওখানে লুকিয়ে থাকবে কে জানতো!

—আমার মনে হয়, বাঘটা হকচকিয়ে গিয়েই পালিয়েছে। নইলে নির্ঘাত তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।

রজনী ক্যাকাসে চোখে হাসল। তারপর নিজের বোকামিটুকু হজম করে সাবধান করে দিতে শুরু করল সবাইকে, যা হবার হয়েছে, এখন থেকে কিন্তু সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। বাঘের ক্ষুধা যদি না মিটে থাকে তবেই ঝামেলা। সুন্দরবনের বাঘ বুদ্ধিতে মানুষকেও হার মানায়। ও এসে যখন দেখবে ওর খাবার উধাও, তখন নির্ঘাত ও ক্ষেপে যাবে। চাই কি নৌকোতেও ও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

রজনী বলছিল বটে, কিন্তু ওর দেহের ভিতরে এখনো ঝিমঝিম করে ঝাঁকি খেয়ে উঠছিল! কি বাঁচাই না আজ বাঁচা গেছে!

কে একজন আবার প্রশ্ন করল, ভুল দেখনি তো রজনীভাই?

—ভুল দেখেছি মানে?

—না, মানে বাঘ না হয়ে অন্য কিছুও তো হতে পারে।

—তা পারে। তবে বাঘ আমি চিনি। আমি একা দেখিনি, আমি একা দেখলে বলতে পারতাম চোখের ভুল, কিন্তু প্রসাদ সাক্ষী আছে।

তবু যেন সন্দেহটা কাটতে চায় না অনেকের। বাঘই যদি হবে তবে দুজন জলজ্যান্ত মানুষকে পেয়েও ছেড়ে দিল! এও কি হতে পারে!

—কেন, হবে না কেন! বাঘেরও প্রাণের ভয় আছে হে। পালটা তর্ক জুড়ে দিল আর একজন।

রজনী আর এখানে বকবক করা অবান্তর মনে করে আর একপাশে সরে এল ধীরে ধীরে।

•

নরেন্দ্রনারায়ণের ঘুম ভাঙল আরো একটু পরে। অতি কষ্টে উনি চোখ মেলে দেখলেন, বজরার ভিতরে অল্প অল্প আলো ঢুকতে শুরু করেছে। হাই

কাটলেন। কামিনী যে কখন উঠে গেছে কে জানে! জানলা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। এ কি! এ যে নোঙর করা সব নৌকো! তবে কি পৌঁছে গেছি!

উত্তেজনায় উনি চাদর গায়ে তৈরী হয়ে নিলেন। তারপর বাইরে এসে দাঁড়ালেন, কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

ভেড়ির ওপর থোকায় থোকায় লোক। নরেন্দ্রনারায়ণ চারপাশে একবার তাকালেন তবে কি পৌঁছে গেছি! অথচ আমাকে ডাকাই হয়নি!

ঈশান ঝটপট এগিয়ে এল বজরার কাছে, হুজুর রজনীকে আর একটু হলেই বাঘে তুলে নিয়ে যেত!

নরেন্দ্রনারায়ণ ঈশানের কথা বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? রজনী কোথায়?

—ঐ যে হুজুর, ভেড়ির ওপর।

নরেন্দ্রনারায়ণ দেখলেন, সবার চোখেমুখেই বেশ আতঙ্ক। রজনীকে একগাদা লোক ঘিরে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ওখানে?

ঈশান ঘটনাটা বোঝাবার চেষ্টা করল, হুজুর, রজনী আর প্রসাদ সিং কাছারিঘরের দিকে গিয়েছিল, ঘরের মধ্যে আগেভাগেই লুকিয়ে ছিল হুজুর।

—গাঁজা খাসনি তো?

—বিশ্বাস করুন হুজুর, বিরাট বাঘ। বন্দুকের গুলির শব্দে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেছে।

—ডাক রজনীকে। কামিনী কোথায়?

দেখা গেল, কামিনীও বজরা থেকে নেমে ভেড়িতে উঠছে। গল্প শুনছে।

রজনীকে ডাকবার জন্য ঈশান তরতর করে বজরা থেকে লাফিয়ে ভেড়িতে নামল, চিৎকার করে ডাকল, রজনী, এই রজনীভাই!

—এই শুয়ার। নরেন্দ্রনারায়ণ হুমকি দিয়ে উঠলেন। সিঁড়ি-কাঠ পেতে দে, আমিও নামব।

বজরার একপাশে উনুনে গরম জল ফুটছিল। বাবুর্চি উনুনের কাছ থেকে উঠে এসে সিঁড়ি-কাঠ সাজিয়ে দিতে এগিয়ে এল।

নরেন্দ্রনারায়ণ ওর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে নামলেন। আর নামার সঙ্গে সঙ্গেই ভিড়টা হুড়মুড় করে এগিয়ে এল।

—হুজুর, সর্বনাশ হয়েছিল।

সত্যি সত্যি যে বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটেছে নরেন্দ্রনারায়ণ তা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু—

রজনী উত্তেজিত গলায় বলল, হুজুর, মাটিতে পা দিতে না দিতেই বাঘ। এত বড় বাঘ আমি কোনো কালেই দেখিনি হুজুর। বড্ড প্রাণে বেঁচেছি।

—শুধু বাঘ না হুজুর, প্রকাণ্ড একটা সাপ।

—এই, সাপটাকে এদিকে আন।

হিড়হিড় করে টানতে টানতে একটা সাপ এনে ফেলা হল। নরেন্দ্রনারায়ণের গা শিরশির করে উঠল। সতেজ দীর্ঘ চেহারা। ভাগ্যিস জ্যান্ত নয়।

—কি সাপ?

—কাছারিঘরে ছিল হুজুর। প্রসাদ গুলি করে মেরেছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ কাছারিঘরের দিকে তাকালেন। কোমর উঁচু জঙ্গলের মধ্যে জীর্ণ চেহারার একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশে আরো কয়েকটি লুজবুজে চেহারার গোলপাতার ঘর।

রজনী বলল, ওই আমাদের কাছারিবাড়ি হুজুর। উঠোনটা একদম ঝকঝকে তকতকে ছিল। কিন্তু এই এক মাসে আবার কেমন জঙ্গল এসে গ্রাস করে ফেলেছে দেখুন। সাপেবাঘে আবার দখল নিয়ে নিয়েছে সব।

নরেন্দ্রনারায়ণ দেখলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। জঙ্গল যে এখানে কোনো দিন কাটা হয়েছে তার চিহ্নই নেই। কেমন যেন দুর্বোধ্য লাগল ওঁর।

মকবুল বলল, হুজর, এই যে ছোট ছোট গাছ যতদূর দেখছেন ততদূর কাটা হয়েছিল। আরো এক মাস পরে এলে এটুকুও চেনা যেত না। কাছারি ঘরটর সবকিছু জঙ্গলের মধ্যে চাপা পড়ে যেত।

আবার সাপটার দিকে তাকালেন, এরকম সাপের মুখে পড়লেই হয়েছে আর কি।

মকবুল বলল, সাপের হাত থেকে তবু সাবধান থাকলে বাঁচা যায়, কিন্তু বাঘের মতো খচ্চর আর দুটি নেই।

—কাজটা কিন্তু মোটেই ভাল হয়নি হুজুর। ওই বাঘ কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। ধারে-কাছেই কোথাও হয়তো লুকিয়ে থেকে ও আমাদের লক্ষ্য করছে!

—মানে!

মকবুল ওর যুক্তির সমর্থনে বলতে শুরু করল, বাঘের মুখের গ্রাস আমরা কেড়ে নিয়েছি। ও ছেড়ে কথা কইবে না।

—কি করতে হবে তাহলে ? নরেন্দ্রনারায়ণের গলার স্বর কেঁপে উঠল।

রজনী বলল, একটু শুধু সাবধানে থাকতে হবে হুজুর। কেউ যেন একা একা কোথাও না যায়। দু-চার দিন এখন আমাদের নৌকাতেই কাটাতে হবে। রাতে ভেড়িতে আশেপাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

—আগুনই হচ্ছে ওদের ওষুধ।

রজনী বলল, আজকের দিনটা বিশ্রাম-টিশ্রাম করে কাল থেকেই আমরা জঙ্গলে নেমে পড়ব দা-কুড়াল নিয়ে। দু দিনেই কাছারিবাড়ি পর্যন্ত সাফ করে ফেলব।

মকবুল বলল, বাড়িটাকে আবার নতুন করে বানাতে হবে হুজুর। খুঁটি অবধি ওর পচে গেছে।

এমন সময় ধীরে ধীরে নরেন্দ্রনারায়ণের কাছটিতে এগিয়ে এসেছিল কামিনী। বলল, ওখানে একটা লোকের সঙ্গে কথা হল, বাঘবন্দী করে রাখতে পারে।

সবাই এক সঙ্গে উৎসাহে তাকাল। বাঘবন্দী জানে, ওঝা ?

—রসিক না কি যেন নাম বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ঈশান আর রজনী ছুটে গেল। কালো পাথরের মতো গায়ের রং, একটা লোককে ওরা টানতে টানতে নিয়ে এল।

লোকটার দু'চোখে ভয়, ছাড়ো ছাড়ো, ছেড়ে দাও।

—এই যে হুজুর, সটান নরেন্দ্রনারায়ণের পায়ের কাছে এনে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হল ওকে।

—কি নাম তোর ? জিজ্ঞেস করলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

—আজ্ঞে রসিকলাল।

—ওঝা ?

—না হুজুর। আমি ওঝা নই হুজুর। আমার বাবা কিছু মন্তর-টন্তর জানত। বাবা মরে গেলে সে সব পাট চুকে গেছে।

রজনী আর এককাঠি ওপরে গর্জে উঠল, ফের মিথ্যে কথা, বাপের কাছ থেকে শিখিসনি কিছু ?

লোকটা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল, অল্পস্বল্প জানি হুজুর।

—ঠিক আছে, ওতেই হবে। বাঘবন্দী করে দেখা। বাবু তোকে ঢেলে বকশিশ দেবে।

বাঘবন্দী জানি না হুজুর। খারাপ বাতাস-টাতাস হলে তাড়িয়ে দিতে পারি।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, বাঘবন্দী করে না দেখাতে পারলে তোকে শূলে চড়াব।

কামিনা অনুনয় করল, একটু মন্তর-টন্তর ছুঁড়ে বাঘটাকে যদি ঘায়েল করতে পার দেখ না। এতগুলো লোকের উপকার হত তাহলে।

লোকটা বলল, ঠিক আছে, মন্তর আমি ছুঁড়ব, কিন্তু বাঘের গায়ে না লাগলে আমি জানি না।

—ঠিক আছে তাই কর।

—যা যা ভাগ। নরেন্দ্রনারায়ণ ওকে তাড়ালেন। আমাদের বন্দুকগুলো সব ঠিক আছে তো রঞ্জনী?

রঞ্জনী বলল, আমি সব দেখে-টেকে রাখছি। এবার আপনারা সবাই ডাঙা ছেড়ে উপরে উঠুন। সুন্দরবনের বাঘকে একদম বিশ্বাস নেই হুজুর।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, চল তবে বজরায় উঠেই কথা বলি।

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে এলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। বাঘটা যদি ধারে-কাছেই থাকবে, ওর গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন!

বারো

সকালবেলাটা উত্তেজনায় কাটল, দুপুরে যুদ্ধক্ষেত্রের শিবিরের মতো থমথমে চেহারা। আর বিকেলে সেই উত্তেজনা পুরোপুরি থিতিয়ে এল।

রঞ্জনী এ-নৌকো থেকে সে-নৌকোয়, এর কাছ থেকে ওর কাছে, সারাক্ষণ ছুটোছুটি আর ব্যস্ততা দেখিয়েই কাটাল।

রসিকলালের পেছনে লেগে রইল মকবুল, দীননাথ। মন্ত্রতন্ত্র পড়ে বাঘকে যদি ঘায়েল করে দেখাতে পারে রসিকলাল ওকে আর পায় কে!

রসিকলালের অবস্থাটা হচ্ছে, ছুঁচোর হাতি গেলার মতো। তবু বোঝাবার চেষ্টা করে, বাঘের যদি প্রাণের ভয় থাকে, তাহলে আর বাছাধন এমনিতেই এগোবে না। মন্ত্রতন্ত্র পড়ে ভূতপ্রেত ঠেকানো যায়, বাঘ ঠেকানো যায় না।

—যারা সত্যিকার ওঝা তারা বাঘও ঠেকাতে পারে। বাঘকে বশ করে ছাগলের সঙ্গে এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারে।

রসিকলাল বলল, পারে হয়তো। তবে আমি তো আর ওঝা নই, আমি কি করে ঠেকাব?

—যার বাপ ওঝা ছিল, সে কি আর বাপের বিদ্যে কিছুই পায়নি?

—না, পাইনি। নেইওনি। বাপও আমাকে দিতে চায়নি।

—কেন, দেয়নি কেন?

—সে অনেক কথা। দেখ ভাই, বাপ যখন মারা গেল, তার দু-একদিন আগে বাপ আমাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিল। তার একটা হচ্ছে, দেখ্ রসা, চোখে যদি কখনো সাপ পড়ে, লাঠিই হচ্ছে তার প্রধান ওষুধ। সাপের জায়গায় এখন বাঘ পড়েছে, এখানকার এতগুলো লোক দা-কুড়াল লাঠি বন্দুক নিয়ে তেড়ে গেলেই বাঘ পালাতে পথ পাবে না।

দীননাথ একটা বিড়ি ধরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে টানছিল, হাসল, বাঘের আবার প্রাণের ভয়, তাও কিনা মানুষকে। একবার ও ধারে-কাছে এগিয়ে গর্জন করে উঠলেই তো বাবা আট-দশটা লোকের পেচ্ছাব বেরিয়ে যাবে।

—তা পারে। তবে আট-দশটা লোক একসঙ্গে তেড়ে গেলে বাঘেরও আর হাসিমুখ থাকবে না। আসলে সাহস আর গায়ের জোর থাকলে কে হারায় বল দেখি।

গাছের গুঁড়ির মতো গাঁট গাঁট শরীর নিশিকান্তর। এতক্ষণ বসে বসে সব শুনছিল, এবার সেও কথা না বলে পারল না। বলল, গায়ের জোর আর সাহসেই সব হয় না রসিকভাই, একটু মগজও দরকার। বুদ্ধি থাকলে বাঘ তো বাঘ, বাঘের বাপ-ঠাকুর্দাকে অবধি বশে আনা যায়।

—এনে দেখাও না।

নিশিকান্ত বলল, তাহলে আমারই জীবনের একটা গল্প শোন।

জুত করে সবাই ঘন হয়ে বসল, বলো।

টনটনে রোদ লাগছে পিঠের উপর। শীতের রোদ, এ রোদে আলসেমি করে বসে বসে গল্প শোনায় বেশ একটা আমেজ আছে। ভেড়ির ওপারে জঙ্গলের গায়ে রোদ, অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে দৃশ্যটা।

নিশিকান্ত শুরু করল, সে প্রায় পনের বিশ বছর আগের কথা। চুনোখালির বাদায় তখন আমি কাজ করি।

চুনোখালি। কোন চুনোখালি নিশিকান্ত?

—বিদ্যাধরী দিয়ে যেতে হয়। তখন ওখানে বন সাফাইয়ের কাজ চলছে। বন প্রায় তিনপোটেক খতম করা গেছে। বাকি যা আছে মাসখানেক আর কাজ হলেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এমন সময় একদিন সন্ধ্যের দিকে কি একটা কাজে যেন একা একা জঙ্গলের ধারে ভেড়ির দিকে যেতে হয়েছিল। ভেড়িতে উঠে দেখি নদী পেটেপিঠে প্রায় সমান সমান। ভেড়ি থেকে প্রায় হাত তিরিশেক নিচে নেমে গেছে নদী। আর সেই তিরিশ হাত কি পরিমাণ কাদা হয়েছে তা বুঝতেই পাচ্ছ।

ভেড়ি ধরে হাঁটছিলাম, হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। পাশেই ঝোপের ভিতর কি যেন একটা নড়ে উঠল। বাতাস বইছে না যে গাছগাছালি কাঁপতে শুরু করবে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে ঝাঁকি খেয়ে উঠল। ঝোপটা কিন্তু তক্ষণে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিছু একটা যে ঘাপটি মেরে ওর ভিতর লুকিয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। এ অবস্থায় কি যে করব ঠিক ভেবে পেলাম না। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আর নজর রাখলাম ঝোপটার দিকে। নাহ্ আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

হঠাৎ দেখলাম, একরাশ বেলে হাঁস উড়ে যাচ্ছে। এদিকে কাদার ওপর শামুকখোল পোকামাকড় ধরার কথা ভুলে গিয়ে ঘাড় উঁচু করে অপেক্ষা করছে। কিছু একটা ওরাও যেন আঁচ করেছে।

আবার ঝোপের দিকে তাকালাম, এসময় আর সন্দেহ রইল না, কিছু একটা জন্তু যেন ঝোপের ভিতর থেকে আমার দিকে তাক করে রয়েছে। জন্তুটা যে বাঘ তখনো ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু যদি বাঘ হয়, এই দুশ্চিন্তাতেই বোধ হয় আর আমার দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। ভেড়ি থেকে নিচে নামতে গিয়ে কাদার মধ্যে হড়কে গেলাম এমন সময় বোধ হয় হাত থেকে শিকার ছুটে যাচ্ছে দেখে বাঘটা প্রকাণ্ড একটা লাফ দিয়ে ভেড়ি ডিঙিয়ে আমার দিকে ছুটে এল। কিন্তু গড়িয়ে পড়ার জন্যই হোক, আর যে জন্যেই হোক, বাঘটা আমার থেকে আরো পাঁচ-দশ হাত নিচে গিয়ে পড়ল। কাদা, অসম্ভব কাদায় অর্ধেক ডুবে গেল বাঘটা। দেহের ভারে আরো বেশ খানিকটা ওর কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

আমি প্রাণের ভয়ে চিৎকার করে আরো একটু উপরে সরে এলাম। কিভাবে এলাম তা ঈশ্বরই জানেন।

ওদিকে বাঘের তখন ভিন্ন অবস্থা। কি তর্জন গর্জন, উপায় নেই ঐ কাদার ফাঁদ থেকে ও উঠে আসে। আমি আরো একটু উপর উঠে অবশেষে কাদা থেকে একেবারে ভেড়ির উপরে। আর এসময়ই আমার মনে পড়ল, হাতে ধারাল কুড়ালটা আমি ধরে আছি। বাঘটার দিকে আমি তাকালাম, চট করে ঐ কাদা থেকে ওঠা ওর দ্বারা সম্ভব নয়। ব্যাস্ ব্যাপারটা যখন আমার কাছে পরিষ্কার তখন আর পায় কে আমাকে।

কুড়াল উঁচিয়ে তেড়ে গেলাম।

বাঘটা প্রাণপণে কাদা থেকে উঠে আসার চেষ্টা করছে। দুপা একপা করে এগিয়ে বাঘটাকে লক্ষ্য করে কুড়াল চালাতে শুরু করলাম। ফিনকি

দিয়ে রক্ত উঠল। বাঘের কি দাঁত খিঁচুনি। কিন্তু আমি ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি। বাঘটাকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে শেষ করে ফেললাম।

—এইভাবে একদিন বাঘ মেরেছিলাম, জানো!

নিশিকান্ত তার জীবনের রোমহর্ষক কাহিনীটা শুনিয়ে একটু থামল। তারপর বিজয়ীর হাসি হাসতে লাগল।

মকবুল বলল, রাখে কৃষ্ণ মারে কে।

ঈশান বলল, বাঘ মেরেছিলে বলে বাবুরা তোমাকে খেতাব দেয়নি?

—কি খেতাব?

—আরে ওই যে খেতাব-টেতাব দেয়, রায়বাহাদুর-না কি যেন। ওকরম একটা খেতাব পাওনি তুমি? বলেই ঈশান হাসতে শুরু করে।

—তোমরা ঠাট্টা করছ। নিশিকান্ত একটু গম্ভীর হয়।

এমন সময় বেঁটে চৈতন্য এসে হাজির। কে কাকে ঠাট্টা করছে গো ঈশান?

ঈশান বলল, ঠাট্টা নয়, নিশিকান্ত একবার কুড়াল দিয়ে বাঘ মেরেছিল, আমি বললাম, বাবুরা তোমাকে খেতাব-টেতাব কি দিল গো? আর অমনি ও ভাবছে ঠাট্টা।

চৈতন্য বলল, বাঘের গপ্পো ছাড়া আজ আর গপ্পো নেই। যেখানেই যাই বাঘ। কিন্তু ওদিকে যে আবার রসিকলালের ডাক পড়েছে গো!

রসিক চমকে উঠল, কেন?

—কেন আবার, বাঘের গলায় দড়ি বেঁধে ধরে এনে ছোটকর্তাকে দেখাতে হবে।

—এটা কি জুলুম বল দেখি। রসিকলালের দেহটা একটা ঝাঁকি খেয়ে কেঁপে উঠল।

—জুলুমের কি আছে। তুমি বাঘবন্দী জানো বলেই না তোমাকে ডাকা। আমরা জানলে আমাদের ডাকতেন।

—আমি জানি না।

—না জানলেও এখন জেনে নিতে হবে। ক্যা ক্যা করে হাসল চৈতন্য।

মকবুল শুধাল, কে কে আছে ওখানে?

—ওই তো বজরার ছাদের দিকে তাকাও না, ওখানে বসে এখন বাঘের পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে।

বজরাটা এখান থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে। কিন্তু সবাইকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। তবে ওই মেয়েমানুষটা কেমন ছোটকর্তার গায়ে গায়ে লেগে বসেছে দেখ।

—দেখে শালা পিত্তি জ্বলে যায়।

মকবুল বলল, যাও না রসিকলাল, ঘুরে এস।

—কি ঝামেলায় পড়লাম বল দেখি। এমন জানলে কে আসে এখানে। সুন্দরবনের খুয়ে প্রণাম, আমি চলে যাবো এখান থেকে।

—এখানে আসা বড় সোজা হে। যাওয়া কঠিন। আন্দামানের নাম শুনেছ! এও হচ্ছে এক ধরনের আন্দামান।

রসিকলাল ক্যাকাসে চোখে তাকিয়ে থাকল, নিশিকান্ত ওকে ঠেলে তুলে দিল, যাও না, কি বলে, শুনে আসতে ক্ষতি কি!

রসিকলাল না উঠে পারল না। হাজার হোক ছোটকর্তা ডেকে পাঠিয়েছেন, ওর না গিয়েও উপায় নেই।

চারপাশে ছড়ানো শীতের রোদে মিষ্টি একটা আমেজ। বাতাস নেই। পিঠের দিক থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে উত্তাপ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভারি রোমাঞ্চকর লাগছিল নরেন্দ্রনারায়ণের। পাশে পেখম তুলে বসে আছে কামিনী। বসার ভঙ্গিটা পেখম তোলা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও গুটিয়ে একশা হয়ে আছে।

আজ সকাল থেকেই এখানকার এই জঙ্গলের রহস্য বুঝবার চেষ্টা করছে কামিনী। কিন্তু কেমন একটা গা ছমছম ভাব সারাটি দিন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ বার কয়েক রসিকতা করে ওর ভয় ভাবটা কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কামিনী মুখে যতই সাহস দেখাবার চেষ্টা করুক, ভিতরে ভিতরে ও গুটিয়েই এসেছে। গুটিয়ে পড়াই স্বাভাবিক, সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম ওর। তাছাড়া নরেন্দ্রনারায়ণকে খুশি করার জন্ম আর যাই হোক জীবনটা তো আর খোয়ান যায় না। কী কুক্ষণেই যে ও ঘর ছেড়ে এখানে এসেছিল! যে কদিন এখন এখানে কাটাতে হবে নৌকোতেই ও শুয়ে বসে কাটিয়ে দেবে। বাপরে, সাপটাকে যদি চোখে না দেখতাম, এক কথা ছিল।

কে যেন বলেছিল, এ সাপের বিষ নেই। বিষ থাক আর নাই থাক সাপ সাপই। চোখের সামনে অত বড় একটা সাপ দেখলে কার মাথার ঠিক থাকে।

সাপটাকে মেরে ফেলায় কে যেন খুব মাথা গরমও করেছিল সে সময়। সাপ স্বয়ং ভগবান, মা মনসা। অমন করে তাকে মারার কি যুক্তি থাকতে পারে! মানুষ এই ভাবেই যত পাপ কুড়ায়।

এ যদি সুন্দরবন না হয়ে অন্য কোথাও হত সাপটাকে নাকি দুধ কলা খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে ছেড়ে দেওয়া হত।

সাপটাকে মারা নিয়ে যে যাই বলুক কামিনী অখুশি নয়। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সাপ কখনো মানুষের বন্ধু হতে পারে না। সাপ চিরকালই শত্রু।

নরেন্দ্রনারায়ণ তাকিয়ায় গা এলিয়ে বসেছিলেন। নদীর জলের অল্প অল্প শব্দ ভেসে আসছে। নদীর ওপারের জঙ্গলে শান্ত থমথমে একটা চেহারা। এপারে কাছারিবাড়ির চারপাশে মাঝে মাঝে চোখ পড়ছিল ওঁর। এই জঙ্গলের দেশে দিনের পর দিন কাটাতে হলেই হয়েছিল আর কি! ভাগ্যিস আবাদ করার জন্য ওঁকেও এদের সঙ্গে এখানে কাটাতে হবে না!

কামিনীর দিকে তাকালেন, কি হল, পেনেটির কামিনীর যে রা বন্ধ হয়ে গেল।

কামিনী জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করল, শুনছি। সবাই যদি বলবে তবে শুনবে কে!

—না হয় আমরা চুপ করছি, তুমিই বলো।

কামিনী বলল, আমি আবার কি বলব। আপনি সেই বাঘিনীর গল্প শোনাবেন বলেছিলেন, সেটা বলুন।

ওপাশে একটু তফাতে রজনী রামায়ণ শোনার ভঙ্গিতে বসেছিল, রজনীর পাশে শুকদেব। রজনী কথা লুফে নিল কামিনীর। হ্যাঁ হুজুর, আপনার সেই বাঘিনীর গল্প এবার শোনান।

নরেন্দ্রনারায়ণ এপাশে ওপাশে চোখ বোলালেন, সে এক জব্বর কাহিনী।

—কি রকম, কি রকম?

নরেন্দ্রনারায়ণ চোখেমুখে একটু কৌতুক ছড়ালেন, সে বাঘিনীর ছিল দুটো হাত, দুটো পা।

দু-হাত দু-পাওলা আবার বাঘ হয় নাকি! কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণ বলেছেন তাই আর প্রতিবাদ করা গেল না।

—তার মেঘের মতো এক রাশ চুল ছিল মাথায়। চোখ ছিল কোকিলের মতো কালো। তিরতির করে সেই গভীর চোখের পাপড়ি কাঁপত! কি বুঝছ?

বাঘের মতো ভয়াবহ নয় এ গল্প। নরেন্দ্রনারায়ণের বলার বিষয়টা বুঝবার জন্য হাঁ করে সবাই তাকিয়ে থাকে।

নরেন্দ্রনারায়ণ আবার শুরু করলেন, সে বাঘিনীর নাম ছিল মধুলতা।

এ গল্প অনেকটা মাঝিমাল্লাদের মুখে শোনা কেচ্ছার মতো মনে হচ্ছিল রজনীর। তা হোক, নরেন্দ্রনারায়ণের মুখে এ কেচ্ছার আলাদা একটা স্বাদ আছে।

—কিন্তু নামে মধুলতা হলে কি হয়, ভেতরটা ছিল ভীষণ হিংস্র। একদিন এক পথশ্রান্ত পথিক পথ চলতে চলতে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় মধুলতার কুটিরে

এসে আশ্রয় ভিক্ষা করল। এই পথিকের নাম ছিল ইন্দ্রনাথ। দিব্যকান্তি চেহারা, সুপুরুষ বলতে যা বোঝায় তাই।

—মধুলতার আর কেউ ছিল না? স্বামী, শ্বশুর? প্রশ্ন করল কামিনী?

হাসলেন নরেন্দ্রনারায়ণ, না। তাহলে আর মজা কোথায়! তাহলে আর গল্প শোনাব কেন? যাক গে, পথিককে ঘরে এনে বসালো মধুলতা। পা ধোয়ার জল এগিয়ে দিল। পাখা দিয়ে বাতাস করল। যত্ন-আত্তির এতটুকু ত্রুটি রাখল না।

শুকদেব বিড়বিড় করে বলল, কি কপাল করে জন্মেছিল লোকটা।

নরেন্দ্রনারায়ণ শুধোলেন, কিছু বলছিস?

—না না। শুকদেব ক্যাকাসে হয়ে ওঠে।

নরেন্দ্রনারায়ণ আবার শুরু করলেন, তা মধুলতা রান্নাবান্না করে আসন পেতে বসিয়ে ইন্দ্রনাথকে পরিতৃপ্তি করে খাওয়াল। অবশেষে বিছানা পেতে ওকে শুতে দিল। আর এরপরই সেই ঘটনাটি ঘটল।

কামিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে নরেন্দ্রনারায়ণ ইঙ্গিতময় চোখে হাসলেন।

—কি ঘটল? কামিনী শুধোল।

—রাত্রি গভীর হলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ইন্দ্রনাথের। কে? কে ওখানে?

—আমি। উত্তর করল মধুলতা।

—তুমি? কি চাও?

—চাই! মধুলতার চোখ মুখ তখন দগদগ করে জ্বলছে। ঘন ঘন শ্বাস টানছে মধুলতা। ঠোঁট দুটো গরম লোহার মতো লাল টকটক করছে। চাঁপা কলির মতো তার হাতের আঙুলে ধারালো নখ ঝলসাচ্ছে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে এল ইন্দ্রনাথের।

মধুলতা অর্থপূর্ণ চোখে হাসল, আপনাকে এই যে আমি আশ্রয় দিয়েছি, আপনি আমাকে কি দেবেন?

—কি চাও তুমি?

মধুলতা বলল, আমি অনেকদিন ধরে একটা ভ্রমর খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনার বুকের ভেতর লুকোন আছে সেই ভ্রমর। তাকে দিন।

—এ আবার কি কথা!

—কেন বিশ্বাস হল না? ধারালো হাতের আঙুলগুলো ইন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে দিল।

ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল ইন্দ্রনাথ।

আর ঠিক এই সময়ই হিংস্র বাঘিনীর মতো মধুলতা ঝাঁপিয়ে পড়ল ইন্দ্রনাথের বুকে। ইন্দ্রনাথকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। তারপর ও রক্তাক্ত হাতে ইন্দ্রনাথের বুকের ভেতর থেকে একটা কালো ভ্রমর বার করে আনল।

বেচারা ইন্দ্রনাথ ককিয়ে উঠল, ও কি, এই ভ্রমরের মধ্যেই তো আমার প্রাণ। ওটা ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।

মধুলতা বলল, এ আমার মজুরি। এখন থেকে এটা আমার।

ইন্দ্রনাথ ভ্রমরটাকে ফেলে রেখে আর কোথাও যেতে পারল না। বাঁধা পড়ে গেল মধুলতার কাছে।

গল্পটা বলা শেষ করে নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর চুলে একবার এলোমেলো হাতের আঙুল বুলিয়ে নিলেন।

গল্পটা কেমন ধোঁয়াটে থেকে গেল। তবু কামিনী এর তারিফ না করে পারল না।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, আসলে বাঘিনীর খপ্পরে যে পড়েছে তার আর গতি নেই। তা সে সত্যিকার বাঘিনীই হোক, আর মানুষের মতো চেহারার বাঘিনীই হোক।

কামিনী প্রতিবাদ না করে পারল না, আর বাঘেরা সব বুঝি ধোয়া তুলসী পাতা?

—তা কেন, সময় বিশেষে বাঘও মারাত্মক, তবে সব সময় নয়।

রজনী এতক্ষণ কথা বলেনি। কথা বলার মতো প্রসঙ্গও খুঁজে পায়নি। এবার বলল, বাঘই বলুন আর বাঘিনীই বলুন, পেছনে লাগলে আর রক্ষে নেই। সকালে যে চেহারা আজ দেখলাম ছোটকর্তা, অত সহজে ও ছেড়ে দেবে বিশ্বাস হয় না।

নরেন্দ্রনারায়ণ আবার কাছারিবাড়ির দিকে চোখ ফিরিয়ে আনলেন, রোদের তেজ ক্রমশ আরো কমে আসছে। এই পড়ন্ত রোদে সবুজ গাছগাছালির একটা আভা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা নামলেই বনের চেহারাটা পুরোপুরি পাল্টে যাবে। গোপন এক ষড়যন্ত্রে যেন লিপ্ত হয়ে যাবে অরণ্য।

দেখা গেল, ভেড়িটা ফাঁকা। কেউ সাহস করে ভেড়িতে উঠে চলাফেরা করবে সে ক্ষমতা নেই। তাছাড়া বারণও আছে আজ।

ওদিকে নৌকোয় নৌকোয় জটলা।

নরেন্দ্রনারায়ণ রজনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তা রাতটা কিন্তু আজ খুব সাবধানে থাকতে হবে। চারপাশে পাহারা রাখতে হবে।

রজনী অভয় দিল, আপনি কিছু ভাববেন না ছোটকর্তা। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ির ওপর দফায় দফায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হবে। তাছাড়া আজ সবাই পালা করে রাত জাগব। বন্দুক তিনটে বজরাতেই রাখব।

কামিনী বলল, সুন্দরবনের যাদের অভিজ্ঞতা আছে, এমন লোক কিন্তু বজরায় রাখতে হবে।

রজনীর বলতে ইচ্ছে করছিল, সাক্ষাৎ বাঘিনী থাকবে যে নৌকোয়, সেখানে আবার লোক কেন। কিন্তু এমন কথা বললে ওর গর্দান যাবে। রজনী হাসল, বলল, ভয় নেই, মকবুলকে বলে রেখেছি, মকবুল থাকবে। ঈশান থাকবে। দরকার হলে আরো দু-একজনকেও রাখব। তাছাড়া আমি তো থাকবই।

এমন সময় হঠাৎ বোধ হয় আবার রসিকলালের কথা মনে পড়েছিল নরেন্দ্র-নারায়ণের। বললেন, কৈ রসিক এল না তো? ওকে না ডাকতে বললুম।

—ঠিকই তো। রসিক এল না কেন! বজরা থেকেই চেঁচিয়ে উঠল রজনী, কি হল রসিক এল না?

শুকদেব উঠে দাঁড়াল, দেখছি, আমি দেখে আসছি।

কিন্তু না, কোথায় রসিকলাল। খোঁজ খোঁজ, কোথায় রসিকলাল। এ নৌকো সে নৌকো তন্নতন্ন করা হল, লোকটা কি বেমালুম উবে গেল নাকি।

বেঁটে চৈতন্য বলল, ও তো এখানেই ছিল। আমরাই তো ওকে তুলে পাঠিয়ে দিলাম বজরায়।

—বজরায়, কৈ যায়নি তো!

—কতক্ষণ আগে পাঠিয়েছ?

—সে তো অনেকক্ষণ হল মশাই। ব্যাটা কি বাঘবন্দী করতে হবে বলে গা ঢাকা দিল নাকি।

সব কটি নৌকোয় তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। নৌকোর পাটাতন তুলে দেখা হল, সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাতেই তছনছ করে ফেলা হল, কিন্তু না, রসিকলাল বেপাত্তা।

—তা হলে ও বাঘবন্দী করার জন্য একা একা জঙ্গলে ঢোকেনি তো?

—কি জানি। আমার কিন্তু সুবিধে মনে হচ্ছে না রজনীভাই।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখনি আবার ভেড়ির ওপর কাঠকুঠো জড় করে আগুন জ্বালাতে হবে। রজনী, মকবুল, ঈশান ভেড়ির উপর নেমে এল। ওদের দেখাদেখি নেমে এল আরো অনেকেই। কারো কারো হাতে লাঠি, কারো বা হাতে দা কাটারি।

মকবুল বলল, ধারেকাছে একটু খুঁজে দেখলে হত।

নিশিকান্ত বলল, তোমার যেমন বুদ্ধি। এখন অন্ধকার হয়ে আসছে, এখন জঙ্গলে ঢোকা মানে ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনা।

—তাহলে কি করবে বল।

—কি আবার করব। কেউ যদি সাধ করে মরতে যায়, তার জন্যে তো আর সবাই মরতে পারে না।

চৈতন্য এসময় গলা তুলে চিৎকার করে ডাকল, রসিকলাল, ও রসিকলাল।

জঙ্গলেও যে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় এই প্রথম শোনা গেল। বার দু-তিনেক রসিকলালের নামটাকে জঙ্গল নৌকোর দিকে ফিরিয়ে দিল।

—চল, ভেড়ি ধরে বরং কিছুটা এগিয়ে দেখি। একদল ওদিকে যাক, একদল এদিকে।

তাই ঠিক হল। হৈহৈ করতে করতে ভেড়ি ধরে দুটো দল দুদিকে এগোতে শুরু করল। মাঝে মাঝে চিৎকার: রসিকলাল, ও রসিকলাল।

আর অরণ্য সেই ডাকটাকে ব্যঙ্গ করে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিতে লাগল, রসিকলাল, ও রসিকলাল।

কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল মকবুল, খবরদার!

—কি, কি হয়েছে?

ফিসফিস করে মকবুল রজনীকে কাছে ডাকল ঐ, ঐ যে।

—কি ঐ যে? কিছুই বুঝতে পারল না রজনী। শ্বাসযন্ত্রটা দপদপ করে লাফাতে শুরু করল। গা ছমছম করে উঠল রজনীর।

মকবুল বলল, ঐ দেখ, একটা গাছ হেঁটে আসছে।

—গাছ হেঁটে আসছে! গাছ হেঁটে আসবে কি রকম?

—দেখ না, ঐ যে ভেড়ির গা ধরে ধরে নিচে একটা গাছ হেঁটে আসছে না?

তাই তো কি আশ্চর্য। রজনী দেখল, সত্যি সত্যি একটা গাছ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

বেশ কিছুক্ষণ ওরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। গাছটা আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেই রহস্যটা পুরোপুরি ধরা গেল।

রজনী লাফিয়ে উঠল, শালা রসিকলালের কীর্তি। এই শুয়োরের বাচ্চা রসিকলাল, কি করছিস?

রসিক গাছের ঝাপড়ানো ডালটাকে ফেলে দিয়ে ভেড়িতে উঠে এল। অদ্ভুত রক্তশূন্য ওর চোখমুখ।

আবার হুমকি দিল রজনী, কি করছিলি ওভাবে ?

—জঙ্গলে ঢুকেছিলাম।

—জঙ্গলে ঢুকেছিলি ? কেন ?

—বাঘটাকে দেখা যায় কিনা দেখছিলাম।

—তোর কি মাথা খারাপ! ইচ্ছে হচ্ছিল ওর চোয়ালে একটা ঘুষি বসিয়ে দেয়।

—বারে, বাঘটাকে না দেখতে পেলে মন্ত্র পড়ব কি করে। যাকে চোখেই দেখলাম না, তাকে বন্দী করব কি করে ?

—তবে যে বললি, মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানিস না তুই ?

—জানি না তো ঠিকই। জোর করে আমাকে দিয়ে বাঘবন্দী করাতে চাইলে, তাই শেষ চেষ্টা করে দেখছিলাম। একটু একটু যা জানি, তাই নিয়ে চেষ্টা করব ঠিক করেছিলাম।

—তবে গাছটা নিয়ে হাঁটছিলি কেন ?

—বাঘের সাড়াশব্দ পেলে গাছ হয়ে যেতাম।

—বটে! পেটে পেটে তো বেশ বুদ্ধি। চল শালা, ছোটকর্তার কাছে তোকে নিয়ে গিয়ে আজ জবাই করব।

হিড়হিড় করে ওকে টানতে টানতে বজরার দিকে এগিয়ে এল রজনীরা। এনে বজরায় তুলে ছোটকর্তার সামনে ওকে আছড়ে ফেলল।

হাউমাউ করে ককিয়ে উঠল রসিকলাল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, একা একা জঙ্গলে ঢুকেছিলি ? বাঘ তোকে বন্দী করত, না তুই বাঘকে ?

কেঁদে উঠল রসিকলাল, আপনি মা-বাপ হুজুর।

—বটে আমি মা-বাপ !

নিশি বলল, বন্দুক দিয়েও বাঘের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না, আর ও কিনা খালি হাতে লড়তে গিয়েছিল।

—বেটাকে শূলে চড়ানো দরকার।

কামিনী বলল, আহা ওর কি দোষ। ও তো স্বীকারই করেছে ও মন্ত্রতন্ত্র জানে না, তবু যদি সবাই ওকে বাঘ ধরতে বলে, ও কি করবে।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কিছু যখন করতেই পারবে না তখন জঙ্গলে ঢুকেছিল কেন! যা ভাগ। মেয়েছেলের মতো এখানে বসে কাঁদবি তো তোর চামড়া তুলে নেব।

রসিকলাল প্রায় নাকে খত দিতে দিতে বজরা থেকে ভেড়িতে নামল, তারপর এক ছুটে আর একটা নৌকোয় উঠে গা লুকোল।

দৃশ্যটা বড় মজার। রসিকলালের ছুটে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে না হেসে পারলেন না নরেন্দ্রনারায়ণ। শালা, বড্ড জোর আজ বেঁচে গেছে। জেনেশুনে ওভাবে কেউ একা একা জঙ্গলে ঢোকে!

লোকটা চলে যাওয়ার পর হঠাৎই খেয়াল হল নরেন্দ্রনারায়ণের, সারা আকাশ পাখিতে পাখিতে ছেয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ আগেই সূর্যটা নদীর নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। অন্ধকার নামছে, আর সেই সঙ্গে কনকন করা ঠাণ্ডা জোলো বাতাস।

ভেড়ির ওপর তখন কাঠের গুঁড়িতে আগুন জ্বালাবার জন্য এক দঙ্গল লোক। রজনী ওদের কি সব যেন বোঝাচ্ছে। নরেন্দ্রনারায়ণ তাকিয়ে থাকলেন।

—আর এখানে বসা উচিত নয়। কামিনী বলল, চলুন আমরা নিচে যাই।

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর দিকে একবার তাকালেন, চল। এই বাতাসে কি যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে, টের পাচ্ছ?

—কি রহস্য? কামিনী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, বুঝতে পারছ না। তোমাকে দেখছি বোঝাবার জন্য আর একটা লোকের দরকার।

—কি বলুন না? গায়ে ঢলে পড়ল কামিনী।

নরেন্দ্রনারায়ণ ওর চিবুকে একটা টোকা দিয়ে হাসলেন, নেশা গো নেশা। গলার নলিটা কেমন শুকিয়ে শুকিয়ে আসছে, টের পাচ্ছ না?

কামিনী নরেন্দ্রনারায়ণের চোখে অন্য কোনো নেশার ইঙ্গিত যেন দেখতে পাচ্ছিল। এক হাতে ওঁর কোমরটাকে জড়িয়ে ধরে মিষ্টি করে হেসে বলল, চলুন আমরা নিচে যাই।

বজরায় ভিতরে নেমে এল ওরা। ভেতরে ঝাড়লণ্ঠনের আলো। এসে দেখল, ওদের নেশার সব জিনিসই সুন্দর করে সাজানো। ঠিক এই না হলে জীবন। নরেন্দ্রনারায়ণ মনে মনে খুশি হলেন। তারপর বসে, গড়িয়ে, ভুল বকে সত্যি সত্যি এক সময় নেশায় ঢলে পড়লেন। বিরাট লাশটাকে টেনেটুনে গুছিয়ে শুইয়ে দিল কামিনী। তারপর একটু একটু করে রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হতে শুরু করল। সমস্ত চরাচর নিস্তব্ধ হয়ে গেল এক সময়।

মাঝরাতে হঠাৎই কামিনী চমকে উঠল। কোনো একটা নৌকো থেকে এক সঙ্গে অনেকগুলি লোক চেঁচিয়ে উঠেছে।

—কি হল ? কি হয়েছে ?

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আতঙ্কিত চোখে কামিনী উঠে বসল। কিন্তু সাহস হল না দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতে। জানলার ফাঁক গলিয়ে দেখবার চেষ্টা করল কামিনী। ও কি, মাঝের নৌকোয় লোকগুলি ছুটোছুটি করছে কেন। কি হয়েছে ?

ভেড়ির দিকে তাকাল, দগদগে আগুন জ্বলছে কয়েকটা। কিন্তু ভেড়িতে একটা মানুষও দেখতে পেল না। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল, কি বলাবলি করছে লোকগুলি। কিছুই বুঝতে পারল না।

বজরাতে রাত্রি কাটাতে যাদের রাখা হয়েছিল, তারা এখন যে সবাই ছাদে কাঠের শব্দেই তা বুঝতে পারল কামিনী।

ভয়ে বুকের ভিতর কাঁপুনি শুরু হল ওর। ছোটকর্তা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। এই নেশাগ্রস্ত লোকটাকে ডেকে লাভ নেই। বরং একটু বাইরের দিকেই বেরিয়ে দেখা যাক।

দরজার পাল্লা খুলে দেহের খানিকটা বার করে আনল কামিনী। আর বাইরে বেরুতেই রজনীকেও চিনতে পারল। বন্দুক হাতে রজনী কি যেন দেখাচ্ছে।

—কি হয়েছে ওখানে ? প্রশ্ন করল কামিনী।

রজনী এক পলক পিছন ফিরে তাকাল, বাঘ, সেই বাঘটা।

—বাঘ।

—হ্যাঁ বাঘটা নৌকো থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেছে।

—মানে !

রজনী আঙুল তুলে দেখাল, ওই দিকে। জঙ্গলের দিকে পালিয়েছে বাঘটা।

মশাল হাতে নৌকো থেকে লোক নামতে শুরু করেছে দেখতে পেল কামিনী। আর সর্বাঙ্গ যেন হিমেল অনুভূতিতে কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসতে লাগল ওর। দরজার বাইরে বেশিক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। টলতে টলতে বজরার মধ্যে ঢুকে পড়ল কামিনী।

নরেন্দ্রনারায়ণ শিশুর মতো মুখের ভঙ্গি করে এখনো ঘুমুচ্ছেন। লোকটাকে সত্যি সত্যি ডেকে কোন লাভ নেই বুঝতে পারল ও।

তের

গৌরী যেদিন ঘোষবনে আশ্রয় পেল, ফাদার গ্যাব্রিয়েল সেদিন ঘোষবনে ছিলেন না। থাকলে ঘটনাটা অন্যরকম ঘটতে পারত। হয়তো গৌরীর সমস্ত

ঝক্কি ফাদার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। নিজের হাতেই সেবা শুরু করতেন উনি। ফাদার এই সামান্য একটা ঘটনার সুযোগ নিয়ে আরো দশজনকে মানবধর্ম বোঝাতে পারতেন। যীশুর মহিমা বোঝাতে পারতেন। বলতে পারতেন দেখ, মানুষকে এইভাবে নিঃস্বার্থ সেবা করার শক্তি মানুষ কোথা থেকে পায়! দেখ যীশুই সেই মহান শক্তির আধার। দেখ, এই যীশুই একদিন অসুস্থ এক মহিলাকে কেমনভাবে সুস্থ সবল করে তুলেছিলেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই ঘটনাটি তখন সবাইকে শোনাতে পারতেন গ্যাব্রিয়েল। যীশু ছাড়া মানুষের যে গতি নেই একথাটা না বোঝাতে পারা অবধি স্বস্তি কোথায়!

ফাদার ঘোষবনে ছিলেন না, কলকাতা গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে এখানকার পাঠশালার জন্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনতে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ক্রিশ্চান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে হাসপাতাল গড়ার ব্যাপার নিয়েও কথাবার্তা বলবেন বলে কথা আছে।

ফাদার ঘোষবনে ছিলেন না বলেই দুর্লভের যেন রোখ চেপে গিয়েছিল। হোক না ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ, দুর্লভ পরোয়া করেনি। কুন্তির ওপরই পুরোপুরি আস্থা রেখেছিল দুর্লভ। কুন্তি মুখে যাই বলুক, ওর মতো দয়ালু সেবাপরায়ণ মহিলা দুর্লভ খুব কমই দেখেছে। কুন্তির হাতে গৌরীকে তুলে দিয়ে ও স্বস্তিই পেয়েছিল।

ফাদারের অনেক উপদেশই ওর এ সময় মনে পড়ে গিয়েছিল, ফাদার একদিন বলেছিলেন, কোনো ঘটনাই নিজে নিজে বিলীন হয়ে যেতে পারে না। প্রত্যেকটি ঘটনাই জন্ম দেয় আর একটি ঘটনার। ঘটনার ভিতর দিয়েই ঘটনা বেঁচে থাকে। ফলে গৌরীকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারে দুর্লভ, এই সামান্য ঘটনাই আরো দশটা ঘটনা তৈরি করে বেঁচে থাকবে। এবং শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। ওই কুৎসিত রোগাক্রান্ত মেয়েটাকে কি সুন্দর তরতাজা ফুলের মতো তৈরি করে ফেলল কুন্তি। আর কি তৃপ্তি এই ঘটনায়। জীবনে অনেক বড় বড় ঝুঁকির কাজ করেছে দুর্লভ, কিন্তু এর মতো তৃপ্তি কোথায়!

সামান্য একজন মাঝির ছেলে ছিল দুর্লভ। মনে পড়ে যাচ্ছে হুগলিতে ওর ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা। মাঝির ছেলে বলে দরিয়ার সঙ্গে খেলা করেই এত বড়টি হয়েছে ও। দরিয়ার কি আশ্চর্য খেলা। এই আছে শান্ত ধীর স্থির, এই আবার দামাল। নদীর চরিত্র বুঝতে হলে সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয় নদীর। দুর্লভ ওর বাপের সঙ্গে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নদীতে কাটাবার সুযোগ পেয়েছে। ছবির মতো সেই স্মৃতিগুলো ওর মনে পড়ে। ওর সেই বাপজান আজ আর বেঁচে নেই। মাও বেঁচে নেই। গত বছর ঠিক এমনি সময়ে মাকে ও গোর

দিয়েছে মাটির নিচে। আজ দীর্ঘ এক যুগ ধরে পাদরিপাড়ায় ও পড়ে আছে। ওর ওপরে খবরদারি করার কেউ নেই। দুর্লভ ভাল বুঝেছে, হিন্দু থেকে খৃস্টান হয়েছে। উপাধিটা পাল্টে নিয়ে ম্যাকডোনাল্ড হয়ে গেছে ও।

হ্যাঁ, এই নিয়ে কম গঞ্জনা সইতে হয়নি ওকে। হিন্দুপাড়ায় কালাসাহেব নাম হয়েছে ওর। কালাসাহেব নামের মধ্যে ব্যঙ্গ আছে, থাকুক, গ্রাহ্য করে না দুর্লভ। করেনি কখনো। ফাদার ওকে বুঝিয়েছিলেন, চামড়ার রং যাই থাক গো বাবু, চামড়া খুলে দেখ দেখি, কি পাও। সেই লাল রক্তই চলাফেরা করছে তোমার দেহে, আমার দেহে।

আর তোমার দেহেও যে কলকব্জা, আমার দেহেও তাই। তুমি যেমন দুঃখে কাঁদো, আনন্দে হাসো, আমিও তেমনি দুঃখে না-কেঁদে, আনন্দে না-হেসে পারি না। আসলে চামড়াটা তো বাইরের খোলশ, ভেতরটাকে মহান করে তোল, মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাতেই। যীশু এই শিক্ষাই মানুষকে দেন, যীশুর ওপর ভরসা রেখে এগিয়ে যাও।

কত সব অজস্র প্রশ্ন দুর্লভের। গ্যাব্রিয়েল তার সমস্ত কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উত্তর দেন। দুর্লভ অবাক হয়ে শোনে, পরম শ্রদ্ধায় যীশুর ক্রুশবিদ্ধ সুন্দর পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্লভও তৃপ্তিতে সুন্দর হয়ে ওঠে।

দুর্লভ আবাদে এসেছিল নিঃস্ব হাতে। সর্বস্বান্ত সেদিনকার সেই দুর্লভ আর আজকের দুর্লভের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। আজ দুর্লভ ঘর তুলেছে পাদরিপাড়ায়। একচালা গোলপাতার ঘর। আজ দুর্লভ বারোশ' মনী নৌকো ভাড়া করে হুগলি অবধি গিয়ে সওদা করে আসতে পারে। সবই যীশুর করুণা।

ফাদার গ্যাব্রিয়েল কলকাতা থেকে ফিরে এসে গৌরীর কথা শুনে বিস্ময়ে ফেটে পড়েছিলেন। কুন্তির মুখেই সবকিছু শুনে নিলেন উনি। শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল যেন একটা ইন্দ্রজালের দৃশ্য দেখছেন। তুড়ি মেরে কেউ যেন দেখাচ্ছে, এই ছাখো সাহেব, দেখছ, একমুঠো মাটি আমার হাতে, এবার দেখ এই মাটি একটা সোনার ডিম হয়ে গেল। কিংবা এই দেখ, দেখছ? একখানা কাপড় পেতে রাখলুম তোমার সামনে, দেখ, কাপড়টা সরিয়ে দিতেই একখানা সুকুমারকান্তি মানবদেহ।

গৌরীর আবির্ভাবটা তো এরকমই। ভগবান যেন ওদের পরীক্ষা করার জন্যই গৌরীকে ওভাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

গৌরীকে ফাদার কাছে টেনে নিয়েছিলেন। দীক্ষা দিয়ে নিলেন ওকে খ্রীস্টমন্ত্রে। কিন্তু তার আগে ওর সম্পর্কে ভাল করে জেনে নিয়েছিলেন ফাদার।

মেয়েটার বাঁধন কি রকম জানবার জন্ম কুন্তিকে প্রশ্ন করেছিলেন ফাদার, সংসারে ওর কে কে আছে ?

কুন্তি বলেছিল, কথা শুনে যা বুঝেছি, এক মা ছাড়া তেমন কেউ নেই। তা মাও ওকে ত্যাগ করেছে এখন বলা যায়। নইলে এভাবে ওকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে কেন বলুন।

মা ত্যাগ করেছে, কথাটা ভাবতে কেমন একটু খটকা লেগে যায় ফাদারের। কিন্তু আর বেশি জানতেও সাহস হয় না। জিজ্ঞেস করলেন, কি জাত, হিন্দু?

—হ্যাঁ ফাদার, হিন্দু. শীল।

—শীল! মানে ক্ষৌরকার ?

—হ্যাঁ ফাদার, নাপিত। চুল দাড়ি কাটে। আমরা ওকে আশ্রয় দিয়ে ভাল করিনি ফাদার ?

ফাদার গদ্‌গদ চোখে তাকিয়েছিলেন, ভাল করনি মানে, এই তো মানুষের ধর্ম। মানুষ হয়ে এটুকু কাজও যদি করতে না পার তবে আর বেঁচে থাকা কেন।

—তা ওকে পাদরিপাড়ায় থাকার মতো জমির বন্দোবস্ত করে দেবেন তো ফাদার ? একটু আশ্রয় পেলে ও বেঁচে যায়।

—নিশ্চয়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো সব বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে। আমরাও ওকে নৌকোয় তুলে ভাসিয়ে দেব না।

গৌরী একটু সুস্থ হতেই ওকে পাদরিপাড়ার আশ্রমে এনে রাখা হল। বিঘা চারেকের ওপর আশ্রমের এলাকা। চারপাশে সবজির বাগান, আশ্রমের বাগান আশ্রমেরই ছেলেমেয়েদের দেখতে হয়। ছেলেদের থাকার জায়গা মেয়েদের থাকার জায়গা আলাদা। মাঝখানে গোলপাতার ছাউনি দেওয়া টানা লম্বা একটা ঘর। ওখানে তাঁত বসানো আছে কয়েকটা। ছেলেরা মেয়েরা একসঙ্গে কাপড় বোনে, সুতো টানে। এছাড়া চাটাই ঝুড়ি বেড়া বানাবার কাজেরও আলাদা আলাদা জায়গা আছে। হাতের কাজ শিখলে নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়িয়ে যাবে ওরা।

কিন্তু আশ্রমে প্রথম দিকটা খুব বিমর্ষ লাগছিল গৌরীর। কি হওয়ার কথা ছিল, কি হল! তবু যে ও প্রাণে বেঁচেছে এজন্য ও ভগবান যীশুর কাছেই কৃতজ্ঞ। প্রথম দিন থেকেই ওর সঙ্গী হয়ে গেল চিন্ময়ী আর ঊষা। চিন্ময়ী ওর সমান বয়সীই হবে, কিন্তু ঊষা ওর দিদির মতো। প্রথম দুদিন চিন্ময়ীর সঙ্গেই শুতে হয়েছিল ওকে। পরে ওর জন্ম আলাদা বিছানাপত্র আশ্রম থেকে দেওয়া হল।

ফাদার ঘন ঘন এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন গৌরীর। টকটকে ফরসা সুন্দর এই মানুষটাকে দেখে গৌরীর বিস্ময় যেন কাটতে চায় না। ফাদারকে দেখলেই ওর

ভক্তিতে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। ফাদার কত সরল মানুষ। ভুম করে আশ্রমে ঢুকে হয়তো ওর বিছানাতেই বসে পড়লেন। হয়তো নিজের হাতের চাটাই বোনবার কাজে বসে গেলেন। কাজে কখনো লজ্জা রাখতে নেই, তা সে যে ধরনের কাজই হোক।

বড় অদ্ভুত ভঙ্গি করে সাহেব মাঝে মাঝে গানও গেয়ে ওঠেন, গাও, গাও, আমাদের সঙ্গে গাও

এসো খ্রীস্টের দল,
এসো ভক্ত সকল।
প্রেম সুরে ভরি প্রাণ
গাহ প্রেম সুধা গান
যীশু জয় দেশময় বল অবিরল।

আশ্রমের সকলেই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে ফাদারের সঙ্গে। গৌরীর সঙ্কোচ কাটতে চাইত না। চিন্ময়ী, বেলা, উষা সবার দিকে তাকিয়ে থেকে কেমন অবাক হয়ে যেত গৌরী।

চিন্ময়ী বলত, গা না গৌরী। গেয়ে দেখ ভাল লাগবে।

—জানি না যে।

—আমরাও কি জানতাম নাকি। গুনগুন করে গাইতে গাইতেই শিখে গেছি। এখন অনেক গান আমাদের মুখস্থ।

—বেশ তো আমাকে অন্য সময় শিখিয়ে দিস, আমিও গাইব।

চিন্ময়ী বলল, আর কিছুদিন পরেই তো বড়দিন, তখন দেখিস সারা পাদরিপাড়া গানে নাচে কেমন জমে থাকে। আমরা ক্যারল গাইতে বেরুব। চার্চে গিয়ে প্রার্থনা গাইব। আমরা সবাই নতুন নতুন জামা-কাপড় পাব।

বড়দিন সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই গৌরীর। জিজ্ঞেস করল, ক্যারল কি ?

চিন্ময়ী বলল, যীশু বেথেলহামে গোশালাতে জন্মগ্রহণ করেছে, আমরা এই খবরটা গান গেয়ে গেয়ে সবাইকে জানিয়ে দেব। বলেই গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল চিন্ময়ী :

প্রেমের রাজা জন্ম নিল
বেথেল গোশালাতে
ভয়ভাবনা দূর হল ভাই
আলোর মহিমাতে।

—গা না, আমার সঙ্গে সঙ্গে গা, তুইও শিখে যাবি।

চিন্ময়ীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে খারাপ লাগে না গৌরীর। গুনগুন করে গৌরীও গাইবার চেষ্টা করে।

আশ্রমের জীবনটা খারাপ লাগে না গৌরীর। কেমন সব নিয়মে বাঁধা কাজ। সেই কাকভোরে উঠতে হবে, হাত মুখ ধুয়ে প্রার্থনা সভা। প্রার্থনায় হারমোনিয়াম বাজে; বাঁশি, খোল, কর্তাল—জমজমাট লাগে তখন। তারপর শুরু হয় সাফাই, বাগানের কাজ। ছেলেরা মাটি কোপায়, আগাছা বাছে, বালতি বালতি জল ঢালে গাছের গোড়ায়। মেয়েরা ঝাঁট দেয়, ঘর মোছে, রান্নার আয়োজন করে। তরিতরকারি কোটে। সবাই মিলে কাজ করতে কি মজা।

একটু বেলা হলে হাতের কাজে লেগে পড়তে হয় সবাইকে। লক্ষ্মণদা ওকে চাটাইয়ের কাজ শেখাচ্ছে এখন, এরপর শেখাবে ঝুড়ি বোনা। চিন্ময়ী ওসব শিখে গেছে বহুকাল আগে। এখন ও তাঁতের কাজে এগিয়ে গেছে। খটখট করে মাকু চালায় চিন্ময়ী। চোখের সামনে কাপড় বুনতে দেখাও কত মজার!

চিন্ময়ী বলে, তাঁত বুনবার আগে সুতো তোলা শিখতে হয়। যাদের আঙুল খুব সুন্দর, তাদের সুতোও হয় সুন্দর। দেখি, তোর আঙুল দেখি? এরকম আঙুল লক্ষ্মণদার খুব পছন্দ হবে! দেখিস, আমি বলে রাখলাম, লক্ষ্মণদা তোর আঙুল খুব পছন্দ করবে।

—তোর আঙুলই বা কি খারাপ শুনি?

—সুন্দর না ছাই। লক্ষ্মণদা আমাকে দেখতেই পারে না।

গৌরী চুপ করে থাকে।

লক্ষ্মণ বারিক আর ভদ্রেশ্বর বেরা ছেলে মেয়েদের হাতের কাজ শেখায়। ভদ্রেশ্বরের বেশ বয়স হয়েছে, বুড়ো, চোখে কম দেখে। বেশ মজার মজার কথা বলতে পারে ভদ্রদা। ওর কথা শুনলে হাসবে না এমন কেউ জন্মায়নি পৃথিবীতে। আর সে তুলনায় লক্ষ্মণদা কিছুটা অন্যরকম। গৌরীকে সত্যি সত্যি লক্ষ্মণদা বেশ পছন্দ করে। ঘটনাটা গৌরী প্রকাশ করতে চায় না। চোখ টাটাবে অন্যদের।

বিকেলে আশ্রমের মেয়েরা দল বেঁধে রুমাল চোর খেলে। ছেলেরা খেলে কাবাডি, দারিয়াবান্দা।

তারপর অল্প অল্প করে সন্ধ্যা নামে। পাদরিপাড়ার সন্ধ্যায় কেমন যেন একটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে থাকে। কনকনে শীতের বাতাস এসে আঁকড়ে ধরে সবাইকে। এই সন্ধ্যার পর থেকেই মনটা কেমন ভার হয়ে যায় গৌরীর। মনে পড়ে যায় দেশের কথা। মায়ের কথা। মনে পড়ে যায় নৌকায় কাটানো ভয়াবহ রাত্রিগুলোর কথা। সেই জঙ্গলের ধারে নৌকোটা যখন আটকে গিয়েছিল, সেই কালো মতো

লোকটা, ঈশান, হ্যাঁ সেই ঈশান নামের লোকটা কোথায় যে হারিয়ে গেল কে জানে। শেষ পর্যন্ত নিমাই বা কোথায়। নিমাই কি বেঁচে নেই, না কি মজা দেখার জন্য ওকে ঘর থেকে বার করে এনে পালিয়ে গেল।

কি জানি কিছুই বুঝতে পারে না গৌরী। বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে গৌরীর। বারবার ইচ্ছে হয়, মায়ের কাছে ছুটে যায়। শত হোক মা, ওকে ফেলে দিতে পারবে না মা। যত নিশ্চিন্তেই এখানে থাকি না কেন, মায়ের কাছে থাকা অন্যরকম। কিন্তু মায়ের কাছে কি আর কোনোদিন ফিরে যেতে পারবে গৌরী। কে জানে, দু চোখ ঝাপসা হয়ে আসে ওর। কোনো কোনো দিন আকুল হয়ে বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে ও কাঁদে। কোনো কোনো দিন এমন হয়, রাত্রে ছটফট করে, ঘুমই আসে না।

রাত্রি এলেই বড় ঝামেলা হয়। রাত্রি নামলেই গুটিয়ে যায় গৌরী।

এর মধ্যে একদিন দুর্লভদা এসে হাজির। কি গো মেয়ে, কি করছ? আশ্রমের আর দশটা মেয়ের কাছ থেকে উঠে এসেছিল গৌরী।

—আয় বোন, বাইরে চাঁদ উঠেছে, আয়, বসে একটু গল্প করি।

গৌরীকে নিয়ে বাইরে পুকুরের ধারে বাঁধানো ঘাটে বসেছিল দুর্লভ। মুখখানা অত শুকনো শুকনো কেন গো? কি হয়েছে?

কৈ কিছু না তো! হেসে নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করছিল গৌরী। শুকনো কোথায়, আজ সারাদিন কাজ করেছি। কি সুন্দর একটা আসন বুনেছি। নেবে আসনটা?

—পাগলী, আশ্রমের জিনিস দান করতে নেই। ওটা বাজারে বিক্রি হবে। সেই পয়সায় আশ্রমের খরচ চলবে।

—আমার কিন্তু খুব ইচ্ছে করছিল কুন্তিদিকে আসনটা দিই।

দুর্লভ ওকে কাছে টেনে নিল। মেয়ের মতো আদর করে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল। আমরা তাহলে তোমার ভালই করেছি, কি বল। ভাগ্যিস তোমাকে নৌকো সমেত নিয়ে এসেছিলাম।

হঠাৎ একথা কেন। গৌরী কেমন থমকে গেল।

দুর্লভ বলল, আসলে পাদরিপাড়ার বাইরের লোকরা নানা জনে নানা কথা বলছে। শুনলে বড় খারাপ লাগে, তাই বলছিলাম।

—কি হয়েছে দুর্লভদা? গৌরী আগ্রহে তাকিয়ে থাকে।

দুর্লভ বলল, আমাদের ভাল হোক এটা অনেকেই চায় না, তাই বলছিলাম।

—ভাল চায় না, কেন? কার কথা বলছ?

—কার কথা আর বলব। কাল ঘোষবনের হাটে গিয়েছিলাম, সেখানেই শুনে এলাম।

গৌরীর বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। কি জানি, কি হয়েছে আবার। ওর যা কপাল, আবার কি বিপদ আসছে কে জানে।

দুর্লভ বলল, না, থাক, ওসব কথা থাক ;ওদের কথায় কান দিলে আমাদের চলবে না।

গৌরীর ব্যাপারে দুর্লভকে অনেক কথাই শুনতে হচ্ছে। পাদরিপাড়ার বাইরের লোকগুলি ভীষণ হিংসুটে। পাদরিপাড়ার লোকদের ভাল হোক এটা ওরা একদম চায় না। ওদের যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে লাগে। গৌরী দুর্লভের হাতদুটো জড়িয়ে ধরে, বল না দুর্লভদা? কি হয়েছে বল না?

—ওসব নোংরা কথা আর বলতে ইচ্ছে করে না। নকুলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চিড়বিড় করে জ্বলে উঠলেন।

—কেন?

—কেন আবার। আমরা নাকি ছেলেমেয়ে ধরে এনে তুকতাক করে খ্রীস্টান বানাই। আমরা নাকি তোমাকে চুরি করে ধরে এনে ভয় দেখিয়ে খ্রীস্টান করেছি।

—না তো! আমি নিজেই হয়েছি।

—সে কথা আর কে বুঝতে যাচ্ছে। বলে, কোত্থেকে নাকি একটা কচি মেয়েকে চুরি করে এনেছে দুর্লভ। শোন কথা। সত্যি সত্যি যা ঘটেছে আমি খুলে বললাম। তা কি আর বিশ্বাস করে, ওদের ধারণা, আমরা নাকি হিন্দু বাড়ি থেকে মেয়ে চুরি করে আনি, তারপর তাদের খারাপ করে ফেলি।

—ওদের সঙ্গে কথা বলো না দুর্লভদা।

—আমি বলি কোথায়। ওরাই তো গায়ে এঁটুলির মতো লেগে থাকে। ওরাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঝগড়া করতে চায়।

গৌরীর খুব খারাপ লাগে। ওর জন্য দুর্লভদাকে অনেক গঞ্জনা সইতে হচ্ছে। কি দরকার ছিল দুর্লভদার। নৌকোটাকে ঠেলে জলে ভাসিয়ে দিলেই তো সব ফুরিয়ে যেত। যেমনি করে ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে নিমাই, যেমনি করে জঙ্গলের ধারের ঐ লোকগুলি ওকে ভাসিয়ে দিয়েছে। অনায়াসেই তো দুর্লভদা ওরকম করতে পারত। পারেনি এই ওর দোষ।

গৌরী দুর্লভের হাতটাকে মুঠোয় তুলে নিল, তুমি ওদের কথায় আর কিছু মনে করো না দুর্লভদা।

দুর্লভ গৌরীর দিকে তাকাল, না রে পাগলী। ঠিক করেছি, আর ওদের সঙ্গে কথাই বলব না। নেহাত ঘোষবনের নায়েব নকুলবাবু কথা বলছিল তাই।

—তুমি বললে পারতে, গৌরীর জন্য ওদের না ভাবলেও চলবে। গৌরী মিশনে থেকে এখন হাতের কাজ শিখছে।

—বলেছি। ওরা মনে করে ওসব আমাদের চালাকি। ওরা বিশ্বাস করবে কি করে, পাদরিপাড়ায় ঢুকতেই সাহস পায় না। সব সময় ভয় পায়, এই বুঝি ওদের আমরা খ্রীস্টান বানিয়ে দিলাম।

গৌরী আর কথা বলল না। এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল নিকটেই কে যেন একা একা গান গাইছে, ভারি মিষ্টি গলা।

কান পেতে ওরা দুজনেই কিছুক্ষণ শুনল।—

গাও রে মধুর স্বরে
যীশু নাম ভক্তি ভরে
যার নামে প্রেম ঝরে
অবিরত ধারে—

—কে গাইছে? প্রশ্ন করল দুর্লভ।

গৌরী বলল, লক্ষ্মণদা। রোজ রাতে ওদিকে ঐ গাছতলায় বসে একা একা গায়।

নকুলবাবুকে ধরে এনে একবার এই গান শুনিয়ে দিলে হত। বুঝত, মনে ঘোরপ্যাচ থাকলে কেউ এভাবে গাইতে পারে না।

গৌরী চুপ করে থাকল।

দুর্লভ বলল, আমাদের এই গান গাওয়া নিয়েও ওরা কেচ্ছা করে। কি বলে জান, বলে, ও কালাসাহেব, তোমরা নাকি পালা বাঁধছ?

ভাল মনে উত্তর দিলাম, বাঁধতে পারি।

—তা, কি পালা? নিমাই সন্ন্যাস না নৌকা বিলাস?

—জানা কথাই আমরা ওসব গান গাই না। বললাম, এবার বড়দিনে যীশু যাত্রা গাইব।

—বটে, তোমাদের যীশুর তো এখন গোপিনীর শেষ নেই, ভালই হবে।

—কি রকম রাগ হয় বল দেখি, বললাম, 'তিন আনা দেই কড়ি, পার কর তাড়াতাড়ি' ওসব প্যানপ্যানানি গান আমরা গাই না। বড়দিনে যখন পালা গাইব তখন শুনে যেও।

সত্যি সত্যি গায়ের ঝাল মেটে না দুর্লভের। জমে থাকা অনেকে ক্ষোভের কথাই ও ফাদারকে গিয়ে বলে হালকা হয়।

ফাদার অন্য ধাতে গড়া মানুষ। আমলই দেন না এসব কথা। কে কি বলছে তাই ভেবে যদি মাথা খারাপ করব, তবে বাপু কাজ করব কখন। ওসব ভাবনা না ভেবে কাজ কর দেখি। কথায় জবাব দিলে লাঠালাঠি হবে; কাজে জবাব দাও, ওদের মাথা আপনিই নিচু হয়ে যাবে।

ফাদার সত্যি সত্যি এক আশ্চর্য পুরুষ। এমনভাবে পাদরিপাড়াটাকে মাথায় করে রেখেছেন যা ভাবতেও অবাক লাগে। গৌরীর মাঝে মাঝে মনে হয়, দেশ থেকে মাকে একবার নিয়ে এসে এই মহাপুরুষকে দেখাতে পারলে যেন শান্তি হত। সাক্ষাৎ এক দেবতা যেন এই পৃথিবীর মাটিতে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন।

দুর্লভদা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ একা একা ওই পুকুরপাড়ে বসেছিল গৌরী। বারবার কেবল মায়ের কথাই মনে আসছে। মা। মাকে এমন করে দেখতে ইচ্ছে করছে কেন! অতবড় মেয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল, আবার সেই গ্রামে ঢুকতে গেলে কেউ কি ওকে কাছে ডাকবে! একঘরে করবেই।

করুক একঘরে। তবু মার কাছে তো ফেরা যাবে। মা, মা! মার চিন্তায় কখন এক সময় ওর চোখদুটো ভিজে জল গড়িয়ে এল।

—আর এমন সময় ও চমকে উঠল, কে?

দেখল, ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মণদা।

—তুমি কাঁদছ? কি হয়েছে?

গৌরী আঁচলে চোখ মুছল, কিছু না। এমনি।

—এমনি কেউ কাঁদে বুঝি? লক্ষ্মণ ওর পাশটিতে বসে পড়ল। কী হয়েছে বল না গৌরী? তোমাকে কাঁদতে দেখলে আমারই দিন খারাপ যাবে।

—ছাই দিন খারাপ যাবে। মুখ ঘুরিয়ে নিল গৌরী।

লক্ষ্মণ ওর ঘোরানো মুখটাকে টেনে সামনের দিকে আনল, ছাই মানে! তার মানে আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না!

—বিশ্বাস করব না কেন, তবে আমি বুঝে গেছি, আমার জন্য কেউ ভাবে না।

—কি হয়েছে বলবে তো?

—আমাকে দেশে নিয়ে যাবে বলেছিলে, তার কি হল? সরাসরি প্রশ্ন করল গৌরী।

—এই আস্তে। শুনতে পাবে। শুনতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না।

গৌরী চারপাশে তাকাল। সত্যি সত্যি ও পালানোর কথাটা বড্ড জোরেই বলে ফেলেছিল। জিভ কাটল।

লক্ষণ ওর নরম হাতের আঙুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরল, বড়দিনটা যাক গৌরী, আমি একটু গুছিয়ে নিই, ঠিক পালাব। তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার ভাগ্য কজনের হয়।

গৌরী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

চৌদ্দ

বাঘের হদিস পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল লোকটার বিকৃত দেহের অবশিষ্ট। তাও দিন তিনেক পরে। লোকটাকে বাঘে বয়ে নিয়ে এসেছিল তিনসুরোর মুখ অবধি। জঙ্গল তোলপাড় করে খুঁজতে খুঁজতে একটা ঝোপের পাশে কাদা-মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। চিনবার উপায় নেই, তিন দিনের মড়া পচে ফুলে উঠেছিল। দুর্গন্ধে কেউ কাছে এগোবে সাধ্য কি!

—কি নাম ছিল লোকটার?

অনেক গোনাগুনতির পর জানা গেল, লোকটার নাম ভাসান। নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপের কাছাকাছি একটা গ্রামে। গ্রামের নামটা কেউ বলতে পারল না। ফলে ওর বাড়ি-ঘরে যে একটা খবর পাঠানো হবে, তাও উপায় রইল না।

রজনী বলল, ভালই হয়েছে হুজুর, ঝামেলা বাধাবার লোক রইল না কেউ।

নরেন্দ্রনারায়ণ কি ভাবছিলেন কে জানে, মনে মনে রজনীর তারিফ না করে পারলেন না। লোকটার দাবিদার থাকলে সত্যি সত্যি বেশ খানিকটা ঝামেলা পোহাতে হত। কিন্তু রজনী যত সহজে মুখ ফুটে কথাটা বলে ফেলতে পারল, ওঁর পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ জড়িয়ে রেখে বললেন, ঝামেলার কথা নয় রজনী, মানুষ হিসেবে আমাদেরও একটা দায়িত্ব থাকা উচিত। অন্তত ওর শ্রাদ্ধশান্তির একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া কে জানে লোকটার সংসারপাতি ছিল কিনা, ওর ছেলেমেয়ে বউ থাকলে তারা সারা জীবন লোকটার কোন হদিস জানবে না, এটা ভাল নয়।

রজনী বলল, আমাদের এখানে নব্বই ভাগ লোকেরই কোনো দায়-দায়িত্ব নেই হুজুর। যারা এই জঙ্গলে কাজ করতে এসেছে, তাদের বাড়ি-ঘরের মায়া থাকলে আসত না। এখানে জীবন মুঠোয় করেই কাজ করতে হয়।

—না না, এটা ঠিক নয়। কারো কোনো হদিস থাকবে না, হিসেবথাকবে না, এটা ঠিক নয়। তুমি প্রতিটি লোকের নাম-ধাম, বাপের নাম, সাকিন সব লিখে রাখবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন কিছু না বলতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। আচ্ছা ভাল কথা, লোকটাকে ভালভাবে সৎকার করা হয়েছে তো?

রজনী মাথা ঝাঁকাল, আমাদের সাধ্যমতো তো করে এলাম হুজুর। বামুন পুরুত তো আর পাওয়ার কথা নয় এখানে, ও ব্যাপারটাই কেবল বাদ গেল।

নরেন্দ্রনারায়ণ কি ভাবলেন, কিছুক্ষণ পরে বললেন, বামুন ঠাকুর একজন কাউকে সঙ্গে নিয়ে এলে পারতে। বনবিবির পুজো করতে গেলেও তো লাগবে।

রজনী বলল, সে আমরা ঠিক আনিয়ে নেব হুজুর। দিনে কিছু কিছু করে জঙ্গল সাফ হচ্ছে এখন, আর কিছুটা এগোলেই আমরা ঘটা করে এখানে পুজো লাগিয়ে দেব। আশেপাশের আবাদের লোকেদেরও আমরা নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসব।

—সে তো বিরাট খরচের ব্যাপার হে। খরচের কথা ভেবেছ?

রজনী হাসল, যার খরচ সেই দেবে হুজুর। আপনি কিছু ভাববেন না।

—মানে।

—বনবিবির পুজো। দেখবেন হুজুর, বনবিবিই তা যোগাড় করে দেবেন।

—বড্ড হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে না?

রজনী বলল, আপনি অত ভাবছেন কেন ছোটকর্তা। দেখবেন মাছের তেলেই মাছভাজা হয়ে যাবে। এখানকার খরচ থেকে বাঁচিয়েই পুজোর খরচটা আমি তুলে নেব। আর সেইজন্যই তো একটু দেরি করতে চাইছি।

নরেন্দ্রনারায়ণ ধূর্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

রজনী বলল, অবশ্য আপনি এখানে থাকতে থাকতেই পুজোটা সেরে ফেললে ভাল হত। কিন্তু এখন যেভাবে কাজ এগোচ্ছে হুজুর, তাতে এখনি পুজোর হুজ্জোত লাগিয়ে দিলে কাজে ঢিলে পড়ে যাবে।

—না না, পরেই করো। তোমাদের সুবিধেমতোই কারো। আর ভাল কথা, কাল-পরশুই আমি কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছি।

—আর দুটো দিন থাকবেন না হুজুর?

কাজ তো শুরুই হয়ে গেছে। মিছিমিছি আমাদের বজরায় শুয়ে বসে কাটাবার কোনো মানে হয়।

এতক্ষণ কামিনী চুপচাপ বসে শুনছিল, বিষয়-সম্পত্তির আলোচনায় ওর নাক গলাবার কথা নয়, কিন্তু এবার যেন ও কথা বলার সূত্র খুঁজে পেল। বলল, তাছাড়া

আর দু'দিন বাদেই বড়দিন আসছে। ও সময়টা আমাদের কলকাতাতেই থাকতে হবে।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। রজনী ভ্রূ বাঁকা করে কামিনীকে একবার দেখল।

কামিনী বলল, কি? বড়দিনে কলকাতায় থাকবেন না?

—থাকব না কেন। নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, ইচ্ছে তো সে রকমই। তবে সব কিছুই এখন আমাদের রজনীর উপর নির্ভর করছে। কি বলিস রজনী, আমরা না হয় কালই রওনা দিই।

রজনী ঠোঁট কামড়িয়ে কি ভাবল। বলল, কালই যাবেন, হরিণের মাংস খাবেন না?

—হরিণের মাংসের কথা তো প্রথম দিন থেকেই শুনে আসছি, কবে যে হরিণ ধরা পড়বে তার কি ঠিক আছে?

ঈশানকে লাগিয়েছি হুজুর। আজকালের মধ্যেই পেয়ে যাব। ঈশান কোনো চেষ্টার কসুর করছে না।

—সবই তো বুঝতে পারছি, তবে কাল-পরশুর মধ্যে পাওয়া যায় ভাল, না হলে আর কি করা যাবে।

রজনী বলল, ঠিক আছে হুজুর, কালকের মধ্যেই যেভাবে পারি আপনাকে হরিণ খাওয়াব। এখন একবার জঙ্গলের দিকটা ঘুরে আসি। লোকগুলোর পেছনে লেগে না থাকলেই ওরা কাজে ফাঁকি দেবে।

নরেন্দ্রনারায়ণ রজনীকে আর আটকালেন না। শীতের রোদে ভারি চমৎকার একটা আমেজ ছড়িয়ে আছে। পাশেই কামিনী, পিঠভর্তি চুল ছড়িয়ে দিয়ে পানের কৌটো নিয়ে পাকাগিন্নীর মতো বসেছে। নরেন্দ্রনারায়ণ একবার ওর বসার ভাঙ্গটা দেখে নিলেন, তারপর জঙ্গলের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, যাই বল কামিনী, এই রোদটার কিন্তু তুলনা নেই।

কামিনী উচ্চারণ করল, হুঁ।

এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, কাছাড়িবাড়ির উঠোনটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। নতুন করে বাড়িটার আবার মেরামতি কাজ শুরু হয়েছে। পরিখার পাশ দিয়ে মজুরদের জন্ত সারিসারি ঘর বানানো হচ্ছে। আর জঙ্গল কাটার কাজ এখন এগিয়ে চলেছে পরিখা ছাড়িয়ে পেছন দিকে। কাঠ ঝাড়াই, কাঠ বাছাই, ভেড়ির একদিকে থাক-থাক কাঠ সাজানো হচ্ছে। এসব কাঠ নৌকো-বোঝাই হয়ে কলকাতার দিকে চালান যাবে। কাঠুরেরা যতদিন তাদের ঘরসংসার নৌকো

থেকে সরিয়ে না নিচ্ছে, ততদিন কাঠগুলো জমতে জমতে পাহাড় হয়ে উঠবে। কামিনীর কাছে সব কিছুই কেমন অদ্ভুত লাগছিল।

—কি ভাবছ ?

কামিনী নরেন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকাল, কিছু না।

—আমি বলতে পারি, কি ভাবছ।

—ওমা, তাই নাকি ! কি বলুন তো ? কৌতুকে তাকায় কামিনী।

—এখানে তোমার একদম ভাল লাগছে না। বাঘের ভয় তোমার এখনো কাটেনি।

—বাঘের ভয় কারোরই কাটেনি। আপনারা এতগুলো লোক এখানে, এত হম্বিতম্বি, অথচ বাঘ তার সুযোগমতো একজনকে ঠিক তুলে নিয়ে গেল।

সেটা ওর কপালে লেখা ছিল। কপালে যদি লেখা থাকে আমাকেও নিয়ে যেতে পারে।

—বালাই ষাট ! ওকথা বলবেন না তো !

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, তবে কি কথা বলব বলে দাও।

—আর কথা নেই বুঝি ? কলকাতায় আমাদের বড়দিনের রাতটা কিভাবে কাটবে সেটা বলুন।

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর পিঠভাঙা চুলে একবার আঙুল ডুবিয়ে আদর করে নিলেন, সত্যি বলব কামিনী বড় একঘেয়ে লাগছে এখন। সারাক্ষণ এই জঙ্গল আর জলের শব্দ কার ভাল লাগে বল ! তবু যে এই একঘেয়েমির মধ্যে এখনো বেঁচে আছি, তার একটাই কারণ—

—কি কারণ ?

—একা আসিনি। সঙ্গে বুদ্ধি করে তোমাকেও নিয়ে এসেছিলাম।

কামিনী আবার কাছারিবাড়ির পাশ দিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল। কাঠুরেরা বেবাক এখন ও দিকে। গাছে গাছে কুড়াল চালাবার শব্দ আসছে। মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টা চিৎকার। ভাসানের কথা ক'দিনই বা লোকে মনে রাখবে। কেউ মনে রাখবে না। বাঘ এসে কামিনীকেও যদি তুলে নিয়ে যেত তাহলেও কি এমন হত। হুজুরের ভয়ে বেমালুম হয়তো চেপে যেত এরা।

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর দিকে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা হাই তুললেন, একটা কথা আছে না, বক্তেরা বনে সুন্দর, তোমাকে দেখে আমার সেই কথাই মনে পড়ছে।

—ওমা, সে কি, কেন ?

—এখানে তোমাকে ঠিক মানাচ্ছে না। কলকাতার বাজারের মতো জায়গা ছাড়া তোমাকে ঠিক মানায় না। এখানে এসে পৌঁছন অবধি তুমি যেন সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছ।

কামিনী মলিনভাবে হাসে, বজরায় বসে বসে কোমর ধরে গেল। চলুন না একটু কাঠ-কাটা দেখে আসি।

—যাবে? নরেন্দ্রনারায়ণ কি একটু ভাবলেন, ঠিক আছে, চল, বনের ভিতর থেকেই ঘুরে আসা যাক।

ওদিকে তখন ঈশানের মাথায় চেপেছে হরিণ। হরিণ শিকার করতে না পারলে আর ইজ্জত থাকবে না। ছোটকর্তাকে হরিণের মাংস খাওয়াতেই হবে। অথচ দুদিন ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেও হরিণের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। শুকদেব ওরফে শুকুকে সঙ্গে নিয়ে ঈশান জঙ্গলের ভিতর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। শেকড় আর শুলোর খোঁচায় পায়ে জ্বালা ধরে গেছে। কি যেন একটা বুনো ঝোপের ওপর আছড়ে পড়েছিল ও, হাঁটুর কাছে চাক ধরে ফুলে আছে। শুকু আর ঈশান দুজনের হাতেই দুটো বন্দুক। হরিণ মারতে এসে বাঘের খপ্পরে না পড়ে যায়।

কিন্তু বাঘের মুখোমুখি হওয়া দূরের কথা, বাঘের পায়ের ছাপ অবধি ওদের চোখে পড়েনি। একবার একটা জায়গায় হরিণের পায়ের ছাপের মতো কিছু ওরা দেখেছিল, হরিণের পায়ের ছাপ কিনা নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। বুনো শুয়োরও হতে পারে। অনেকক্ষণ ওরা ঘুরঘুর করে কাটিয়েছে, কিন্তু—

নাহ্, বৃথাই ওদের ঘুরে বেড়ানো।

আজ একটু রোদ উঠতেই আবার ওরা বেরিয়ে পড়ল। মকবুলকে সঙ্গে নিলে ভাল হত, কিন্তু মকবুল কাছারিঘরের কাজে ব্যস্ত। শুকুকে নিয়েই বেরিয়ে পড়ল ঈশান। যেভাবেই হোক হরিণ না মেরে আজ আর ফেরা নয়। ঈশান ভেড়ির মাটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে নিল, আজ একটা এসপার-ওসপার করতেই হবে।

শুকু বলল, এমনিভাবে এলোমেলো না ঘুরে ফিরিঙ্গি দেউলের কাছে চল, এখানে প্রচুর কেওড়াগাছ।

ঈশান বলল, ছোটকর্তা যত না খেতে চাইছেন, ঐ রজনীই বেশি করে ওর মাথায় ঢোকাচ্ছে। ল্যাং মেরে রজনী দয়াল ঘোষকে তাড়াল। এখন আবার—

শুকদেবকে এখন তারকেশ্বরের যাত্রীদের মতো দেখাচ্ছে। বলল, ওখানেই যাই চল।

ঈশানও জানে কেওড়া ফল আর পাতা হরিণের প্রিয় খাদ্য। হরিণের দল কেওড়া গাছতলায় আসবেই। কিন্তু সেদিন ঘণ্টা দু-তিনেক ওখানে কাটিয়েও ওরা হদিস পায়নি হরিণের। এমনও তো হতে পারে চৌধুরী রাজাদের এই জঙ্গলে হরিণ নামক জন্তুটাই নেই। বাঘ যে আছে তার প্রমাণ ওরা চাক্ষুষ পেয়েছে। বানরের কথা না বললেও চলে। বানরের ঝাঁক যেখানে সেখানেই চোখ পড়ে। তবু ভাল, বানরের জন্য ওদের গুলি খরচ করতে হয়নি। কোনো ঝামেলায় ফেলেনি বানরগুলো।

আর মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সরসর করে যখন ভুষো রঙের কোনো জন্তু পালিয়ে যায়, ওরা টের পায় ওগুলো শুয়োর।

ঈশান শুকুর কথায় আপত্তি করে না, ঠিক আছে, ফিরিঙ্গি দেউলেই যখন যেতে চাইছ চলো। আজ কিন্তু হরিণ আমাদের চাই-ই চাই।

—সবই বনবিবির ইচ্ছা।

দুজনেই সতর্ক ভঙ্গিতে বনের ভিতর দিয়ে এগোতে থাকে। পাতার খসখস শব্দ হলেই চমকে চমকে বন্দুক তুলে ধরে, এঁদো পচা গন্ধ পেলেই স্নায়ুগ্রন্থি সতর্ক করে দাঁড়ায়। কে জানে, আবার কোনো বাঘের গ্রাসের সামনে পড়ে গেল কিনা ওরা।

এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায় শুকু, ঈশানভাই, দেখ দেখ।

ঈশান প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি কি দেখাতে চাইছে শুকদেব। কিন্তু শুকু ওকে আঙুল তুলে ওপরের দিকে দেখাচ্ছে।

ঈশান উপরে তাকায়, কি?

—দেখছো না মৌমাছি উড়ছে, ধারেকাছে কোথাও চাক আছে।

ঈশান দেখল, ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি উড়ে যাচ্ছে ওদের মাথার ওপর দিয়ে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। মউলি থাকলে হাঁড়ি হাঁড়ি মধু পাওয়া যেত গো।

শুকু বলল, চলো না, আমরাই একবার চেষ্টা করে দেখি। দেখবে?

—মাথা খারাপ, ঢাল নেই তরোয়াল নেই, চাক ভাঙা কি সোজা কথা। তাছাড়া কত দূরে চাক রয়েছে কে জানে। এখন আর আমি ছুটতে পারব না।

শুকু অনেকক্ষণ ধরে মৌমাছি লক্ষ্য করল, তারপর বলল, চলো, ঠিক আছে।

আবার ওরা হাঁটতে শুরু করে। বুনো পাতার গন্ধ, পায়ের নিচে নরম কাদামাটি। শুলোগুলো সবই যে ওপর দিকে উঠে আছে এমন নয়, কিছু কিছু বাঁকা ত্রিশূলের মতো ঝুঁকেও আছে। একটু সাবধান না হলেই এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে।

খুব সাবধানেই ওরা পা টিপে টিপে এগোতে থাকে। যতদূর সম্ভব কম শব্দ করা যায়, তারই চেষ্টা করে ওরা। মাঝে মাঝে পাখির ডানা-ঝাপটানোর শব্দ ওঠে। এ-ডাল থেকে ও-ডালে দৌড়ে দৌড়ে কাঠবেরালি ছোটার দৃশ্য। কাঠবেরালিগুলো জানে না এই চৌধুরী রাজাদের জঙ্গলে একটাও গাছ থাকবে না। যদি জানত, ওদের এই নিশ্চিন্ত ভঙ্গিটা বোধহয় থাকত না।

অদ্ভুত লাগে ঈশানের। মানুষের কাছে শেষপর্যন্ত হারতেই হবে জঙ্গলকে। জঙ্গলের হম্বিতম্বি আর ক'দিন। এরপর লাঙলের ফলা পড়বে এই জমিতে। প্রয়োজনে দুটি-চারটি গাছও হয়ত নতুন করে লাগানো হবে। সবই মানুষের মর্জি-মাফিক।

শুকু হঠাৎ একটা ঝটকা টান দিল ঈশানকে, কি ভাবতে ভাবতে চলেছ বল দেখি। আর একটু হলে গর্তটার মধ্যেই পড়ে যেতে।

ঈশান দেখল, সামনেই একটা ছড়ানো গর্ত। জল আর কাদা থিরথির করছে। একগাদা ব্যাঙ আস্তানা গেড়েছে ওখানে। একটু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, তবু ভাল, গর্ত। আমি ভাবলাম বাঘ-কাগ দেখে বোধহয় টান মেরেছ আমাকে।

—এসব গর্ত বড় খারাপ। আর ব্যাঙ থাকা মানেই ধারেকাছে সাপও থাকতে পারে।

ঈশান বাঁদিক দিয়ে গর্তটা পেরিয়ে এল। পেরিয়েই কিছুটা ঢালমতো জায়গা, তরতর করে নিচে নেমে এল।

সুন্দরবনের জঙ্গলে সচরাচর এরকম ঢাল চোখে পড়ে না। গোটাটাই প্রায় সমতল থাকে। ঢালটার জন্যই একটু অদ্ভুত লাগল ঈশানের।

শুকু বলল, ওই যে ফিরিঙ্গি দেউলটা দেখা যাচ্ছে। মাটি কেটে এখানে বোধ হয় ফিরিঙ্গিরাই ঢাল বানিয়েছিল এককালে। দেয়াল-টেয়ালও হতে পারে। [illegible]ভেঙে এখন ঢাল হয়ে রয়েছে।

ঈশান ফিরিঙ্গি দেউলের দিকে হাঁটতে শুরু করে। বহু পুরনোকালের কিছু ইটের গাঁথনি। ঢিবি মতন। জঙ্গল এসে গ্রাস করে নিয়েছে। কে বলবে এককালে ওখানে মগ বা ফিরিঙ্গিরা বহাল তবিয়তে বাস করে গেছে। এককালে হয়তো লোকজনে গমগম করত। কে বলবে ফিরিঙ্গিরা শেষপর্যন্ত হার স্বীকার করে নির্মূল হয়ে গেছে এখান থেকে। জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে পারেনি ওরাও।

ওরা পারেনি বলে আর কেউ পারবে না এমন কথা নয়। ঈশান জানে, কয়েক মাসের মধ্যেই এই জঙ্গলের সব জারিজুরি শেষ হয়ে যাবে আবার।

—ওপাশে চল। ওদিকে কেওড়াগাছের জঙ্গল শুরু হয়েছে।

ঈশান দেখল, সরু সরু পাতা, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। ওরকম থাকে থাকে গাছগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক না হয়ে উপায়ে নেই।

—এত গাছ। এখানেই কিন্তু হরিণ আসার কথা। অথচ নাম-গন্ধ নেই।

—আমাদের কপালে থাকলে এখানেই পাব, নইলে কোথাও নয়। আমরা বরং দেউলের ইটের পাঁজার ওপর উঠে বসি, বসবে?

ঈশান আপত্তি করল না। হরিণ একটা না পেলে কিন্তু ইজ্জত থাকবে না আমাদের।

শুকু হাসল, আমাদের আবার ইজ্জত। বাবুরা হরিণ খাবে, আর প্রাণের ঝুঁকি নেব আমরা।

—না না, তা ঠিক না। আসলে হরিণের দেশে এসে একটাও হরিণ মারতে পারব না, এটাই বা কি কথা!

ইটের পাঁজার কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল শুকদেব।

—কি হল?

—সাপ। আস্তে!

—সাপ, কোথায় সাপ?

—ওই যে পাঁজার গায়ে জড়িয়ে আছে, দেখছ না?

সাপটাকে চিনতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল ঈশানের। ইটের গায়ে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে গাছের শেকড়, ইটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

—কি সাপ?

রং দেখে ধরার উপায় নেই। শুকু বলল, যে সাপই হোক চেহারা দেখেছ? মেটে রঙের গা, তেলে জলে যেন কুচকুচ করছে। ঈশান তাকিয়ে থাকে।

—এই শীতের দিনে সাপ সাধারণত গর্তে থাকে। কিন্তু এ শালা বাইরে যখন বেরিয়েই পড়েছে ব্যাটাকে আমি ধরব।

ঈশান শুকদেবের দিকে তাকাল, মাথা খারাপ নাকি! আমরা সাপ ধরতে আসিনি।

শুকদেব হাসে, সাপের দেশের মানুষ গো আমি। তুমি আমার বন্দুকটা ধর দেখি।

—না না, ভাল হচ্ছে না শুকু। সাপ ধরে কি হবে।

—কি হবে। শুকদেব বন্দুকটা ঈশানের হাতে ধরিয়ে দিল, দেখ না কি করি।

অগত্যা ঈশানকে বন্দুক হাতে সরে দাঁড়াতে হল। শুকদেব ছোট মতো একটা গাছের ডাল ভেঙে নিল। ডালটাকে বাগিয়ে ধরে সাপটার কাছে এগিয়ে এল।

কোন দিকটায় মাথা কে জানে। গায়ে একটু খোঁচা দিতেই ইটের গায়ে তরতর করে এগোতে শুরু করল সাপটা।

বেশি দূর এগোতে দিল না শুকদেব। অতর্কিতে ওকে ইটের গা থেকে টেনে এনে সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলল।

চেঁচিয়ে উঠল ঈশান, এই শুকু! কি হচ্ছে?

শুকদেব বলল, ভয় নেই, তেজি না। নোনা বাতাসে ঝিমধরা। মজাটা দেখ না।

ঈশানের কিছুই করার ছিল না। সাপটা ঝিমমারা ঠিকই, কিন্তু দিব্যি ও এগিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। কি আশ্চর্য! সাপে কি সাপুড়ে চেনে! এখনি তো ও ঘুরে ফণা তুলে ছোবল বসিয়ে দিতে পারে শুকুকে, কিন্তু—

শুকদেব হা হা করে এক লাফে এগিয়ে ওর মাথার ওপর লাঠিটা চেপে ধরল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাপটা মুচড়ে বাঁক খেয়ে শুকদেবকে পেঁচিয়ে ধরতে গেল।

লাঠির দু প্রান্তে পা চেপে শুকদেব ওর লেজের অংশটা ধরে ফেলল। তারপর নিজের এই সাফল্যে ও হা হা করে কেমন একটা শব্দ করে উঠল। ওর চোখ দুটো এখন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছে।

আমার গামছাটা কোমর থেকে খুলে দাও ঈশানভাই। জলদি, জলদি।

ঈশানের শরীরের ভিতর সিরসির করছিল। কাঁপতে কাঁপতেই ও এগিয়ে এল। গামছাটা সাবধানে ও শুকুর কোমর থেকে হেঁচকা মেরে খুলে ফেলল। কি হবে গামছায়?

—আগে সামনের এই মাটির ওপর বিছিয়ে দাও। দেখতেই পাবে কি করি।

কি করতে চায় শুকু বুঝতে পারল না ঈশান। গামছাটাকে মাটিতে বিছিয়ে দিল।

—এবার দুদিকে দুটো হটকা বেঁধে ফেল। এ ব্যাটাকে গামছায় বেঁধে নিয়ে যাব।

তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

—আহ্, যা বলি কর না। আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারছি না।

ঈশান গিঁঠ বাঁধল গামছায়।

শুকদেব বলল, সাবধান, সাপটাকে এবার আমি গামছায় ঢোকাব, শক্ত করে ওকে বেঁধে ফেলতে হবে।

—মাথা খারাপ, আমি নেই।

—আমি সাপের বিষ তুলতে জানি ঈশান ভাই। যা বলছি করে ফেল।

ঈশান গতিক না দেখে বলল, কি করতে হবে বল।

শুকদেব এবার ঝুঁকে সাপের মাথার একটু নিচে শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে লাঠিটাকে পা দিয়ে সরিয়ে ফেলল। এক হাতে লেজের দিকটাও ধরা। সাপটা দড়ির মতো পাক খেয়ে যাচ্ছে।

ঈশান শুকুর কথা অনুযায়ী গামছাটাকে তুলে ধরল। আর সঙ্গে সঙ্গে শুকদেব সাপটাকে ভেতরে ছুঁড়ে ফেলল। দু-এক মুহূর্ত লাগল গামছার মুখটাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলতে। তারপর লাঠির ডগা দিয়ে গামছার গিঁটের সঙ্গে জড়িয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল শুকদেব, হল তো!

ঈশানও কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। হল তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু এবার কি হবে?

—ছোটকর্তাকে উপহার দেব।

—পিঠের চামড়া তুলে নেবে।

—তবে ছোটকর্তার ওই মেয়েছেলেটাকে।

ঈশান হাসে, তা যা বলেছ, ওকেই দেওয়া ভাল। হেঁ হেঁ—

শুকদেব বলল, জীবনে এরকম কত সাপ ধরেছি তার ইয়ত্তা নেই। আগে আগে সাপ ধরতাম, আর বিষ বার করতাম। সাপের বিষ বিক্রি হয় জান?

ঈশান বলল, দুনিয়ায় কি না বিক্রি হয়। কিন্তু সাপ তো হল, হরিণ?

শুকদেব সাপের গামছা-বাঁধা লাঠিটাকে বাঁকের মতো পিঠে ফেলে বন্দুকটা হাতে তুলে নিল। জঙ্গলে যদি হরিণ না থাকে, আমরা কি করব! চল, ছোটকর্তাকে গিয়ে বললেই হবে এ জঙ্গলে হরিণ নেই।

—বিশ্বাস করবে না।

—কেন বিশ্বাস করবে না। আমরা কি গড়ে আনব নাকি? তবু ভাল, বাঘের দুধ খেতে চাননি ছোটকর্তা!

—হরিণ তাহলে হবে না বলছ?

শুকদেব হাসে, হবার হলে এতক্ষণ হয়ে যেত, চল।

শুকদেব আর দাঁড়ায় না। অগত্যা ঈশানও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

আর ওদিকে ভেড়ির ওপর তখন পায়চারি করছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। পাশে তাঁর কামিনী আর রজনী। ওঁরা কাছারিবাড়ি ছাড়িয়ে কিছুদূর বনের ভিতর ঢুকেছিলেন, ফিরে এসে ভেড়ির ওপর পায়চারি করছিলেন। শুকদেব আর

ঈশান জঙ্গলের ভেতর থেকেই ওদের দেখতে পেল। আর খানিকটা দূরে বজরার কাছাকাছি পাথরের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রসাদ সিং, বন্দুক হাতে।

ঈশান এগিয়ে এল। সাপ-বাঁধা গামছার পুঁটলিটা হাতে তুলে নিল শুকদেব। লাঠির আর প্রয়োজন নেই, ফেলে দিল।

ভেড়ির ওপর উঠে আসতে যেটুকু সময়, রজনীর নজরে পড়ে গেল ওরা।

—কি হল? হরিণের কি হল? উৎসাহে রজনী এগিয়ে আসে।

ঈশান বলল, পাইনি। হরিণের নামগন্ধই নেই জঙ্গলে। শুকদেব একটা সাপ ধরে এনেছে। দেখার মতো।

—সাপ। নরেন্দ্রনারায়ণ কৌতুকে গামছাটার দিকে তাকালেন, কোথায় সাপ?

গামছার পুঁটলিটা সামনে রাখল শুকদেব, এই যে হুজুর এর ভেতর রয়েছে।

—গামছার ভেতর! কামিনী কেমন আঁৎকে উঠল; অসম্ভব নয়, গামছাটা নড়ছে।

—গামছায় বেঁধে এনেছিস? কোথাকার ভূত সব।

—শুকু সাপের বিষ বার করতে জানে হুজুর। সাপে কাটা বাঁচাতে পারে।

রজনী দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল, তাই বলে গামছায় বেঁধে আনবি। মারতে পারলি না।

শুকদেব বলল, চটছ কেন রজনীভাই, সাপের খেলা দেখাব।

চোখমুখ শুকিয়ে এসেছিল কামিনীর। মাগো, কী সর্বনেশে লোক এরা!

নরেন্দ্রনারায়ণের বেশ মজাই লাগছিল, শুধোলেন, বিষ নেই? কি সাপ?

মেটে সাপ হুজুর। শীতে আর নোনা হাওয়ায় ঝিম মেরে গেছে। বিষ থাকলেও ভয় নেই হুজুর, আমি আছি।

শুকদেব গামছার গিঁটটা খুলবার জন্য হাত বাড়ায়।

কামিনী দু'পা পিছিয়ে এসে হাঁ হাঁ করে উঠল। শুকদেব ওর অবস্থা দেখে হাসে, মজা পায়। ভয় পাচ্ছেন কেন গো, দেখুন না।

গিঁটটা খুলেই গামছাটাকে একটা ঝাড়া দেয় শুকদেব। আর সঙ্গে সঙ্গে চকচকে মেটে রঙের সাপটা ভেড়ির ওপর আছড়ে পড়ে। কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত-গতিতে শুকদেব ওর লেজের দিকটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে। তারপর দানবীয় ভঙ্গিতে মাথার ওপর তুলে নিয়ে বাঁইবাঁই করে ঘোরাতে শুরু করে ও সাপটাকে।

—আহা হা, করে কি করে কি! নরেন্দ্রনারায়ণও দু'পা পিছিয়ে আসেন। কামিনী আরো খানিকটা দূরে সরে যায়। ঈশান মাটি আঁকড়ে বসে পড়ে। রজনী চেঁচায়, এই শুকদেব।

কিন্তু শুকদেব যেন এতে আরো উৎসাহ পেয়ে যায়। দড়ির মতো সাপটাকে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে নাচে, নাচতে নাচতে হাসে, হা হা হ'—

নরেন্দ্রনারায়ণ চেঁচাতে থাকেন, ফেলে দে হারামজাদা, ফেলে দে।

শুকদেবের কোনো পরোয়া নেই। নাচতে নাচতে ভেড়ি থেকে নদীর দিকে ঢালে নেমে পড়ে। তারপর সড়াৎ করে একসময় সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নদীর জলে। ঝপাৎ করে একটা শব্দ ওঠে, সাপটা জলের মধ্যে মিশে যায়।

আর শুকদেব দু' হাতের তালি বাজিয়ে চেঁচাতে থাকে, খা খা, কুমীরে খা। কামড়ে খা।

পনের

পরদিন ভোর হতে না হতেই ঘুম ভেঙে গেল নরেন্দ্রনারায়ণের। বজরার ভেতর ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে। আলোয় দেখলেন, উনি একাই শুয়ে আছেন। কামিনী নেই। মাথার কাছে জানালাটা খুলে দিতেই চোখে পড়ল, কী ভীষণ কুয়াশা, কুয়াশা আর দাঁতখসানো শীত। এত কুয়াশা যে নিচে নদীর জলের চেহারাও স্পষ্ট দেখা যায় না। সারারাত যেন বরফ পড়েছে। গলগল করে কুয়াশা বজরার ভেতর ঢুকতেই উনি আবার জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে ঝাড়লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলেন, ছাদে শব্দ হচ্ছে. কেউ ওখানে চলাফেরা করছে। মনে পড়ল, রাতে অনেকেই ছাদে বসে বজরা পাহারা দেয়। তবে কি ওরা এখনো ছাদেই রয়েছে। সারারাত নরেন্দ্রনারায়ণ নেশার ঘোরে থাকেন, টের পান না। এই ঠাণ্ডায় কয়েকটা লোক যে ছাদে বসে ওরই জন্য রাত কাটায় এটা ভাবতেই বেশ চাঙ্গা বোধ করলেন উনি।

কিন্তু কামিনী কোথায়? নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর নাম ধরে ডাকলেন।

বজরার পর্দা সরিয়ে যে ঢুকল সে কামিনী নয়, রজনী। রজনীর চোখে বেশ উত্তেজনা।

নরেন্দ্রনারায়ণ শুধোলেন, কি হয়েছে?

রজনী বলল, তিন চারটে কুমির এসে বজরার চারপাশে ঘুরছে হুজুর। ওদের মতলব ভাল নয়।

নরেন্দ্রনারায়ণ অবাক হয়ে তাকালেন, কুমির। কোথায় কুমির?

—বাইরে ছাদে এসে একটু বসুন, দেখতে পাবেন।

—বটে বটে। নরেন্দ্রনারায়ণ আর অপেক্ষা করলেন না। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

—ছাদে উঠুন হুজুর। ছাদ থেকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ ছাদে উঠলেন, কামিনীকেও এখানেই দেখা গেল, জলের দিকে তাকিয়ে হুমড়ি খেয়ে আছে। বন্দুক হাতে ওপাশে প্রসাদ সিং। বন্দুকটা এমনভাবে ও ধরে রেখেছে যেন যে কোনো মুহূর্তে ও গুলি ছুঁড়তে পারে।

—কোথায় কুমির? নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর পাশে এগিয়ে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

কামিনীর গলায় উত্তেজনা। বলল, ওই ভেড়ির ওপর উঠে শুয়েছিল একটা। আমি বজরা থেকে বেরিয়েই প্রথমে সেটাকে দেখতে পেলাম। লেজের খানিকটা জলের ভেতর ডোবানো ছিল।

—কি রকম দেখতে? প্রশ্নটা এমনভাবে করলেন নরেন্দ্রনারায়ণ যেন জীবনে কখনো কুমির দেখেননি।

কামিনী বলল, কুমির যে রকম দেখতে হয়। প্রথম দিকে আমি ভেবেছিলাম, বুঝি একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, কিন্তু খানিকক্ষণ পর যখন ওটা নড়ে উঠল, তখনই আমার খেয়াল হল, গাছের গুঁড়ি নড়ে কেন! আমি চেঁচিয়ে রজনীকে ডাকতেই রজনী ছুটে এসে লাফিয়ে উঠল, কুমির!

রজনী বিপরীত দিকে জলের ওপর তাকিয়ে আছে। বলল, হুজুর, দশ-বার হাতের কম নয় এক-একটা।

—মারলে না কেন?

রজনী নরেন্দ্রনারায়ণের কাছাকাছি এগিয়ে এসে আবার জলের দিকে তাকাল, কুমির চট করে মারা যায় না হুজুর। ওদের চোখের ভেতর গুলি করতে না পারলে সুবিধে করা যায় না। মিছিমিছি কেবল গুলি নষ্ট হয়।

—কেন, গায়ে লাগলে মরে না? কামিনী রজনীর দিকে তাকায়।

—সারা গা তো পাথর। গুলি ঢুকবেই না। এই পাথরের মধ্যে যে সব জায়গা ওদের নরম, সেখানে গুলি লাগলে ফল পাওয়া যায়।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কিন্তু কুমির যে নৌকোর আশেপাশেই ঘুরছে বুঝলে কি করে?

—শুধু একটা কুমির নয় হুজুর। ঝাঁক বেঁধে এসেছে। মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে আবার জলে তলিয়ে যাচ্ছে। একটু দাঁড়ান না, দেখতে পাবেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ জলের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজতে শুরু করলেন। কুয়াশায় সব কিছুই অস্পষ্ট। কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখছেন বলেই কি সাদা দুধের মতো দেখাচ্ছে নদীর জল, ঠিক ধরতে পারলেন না। এখন জোয়ার না ভাঁটা কে জানে। বজরাটা জলের উপরই ভেসে আছে, ভাঁটা হলে আর কিছুক্ষণ পর চড়ায় ঠেকে যাবে। আর জোয়ার হলে পুরোপুরি ভাসতে শুরু করবে।

—ঐ ঐ! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রজনী।

নরেন্দ্রনারায়ণ তাকালেন, হ্যাঁ, হাত দশেক দূরে কি যেন একটা ভেসে উঠেছিল, চেহারাটা পুরোপুরি মালুম হওয়ার আগেই আবার তলিয়ে গেল।

—যাহ্, দেখতে পেলুম না তো! বন্দুকটা নিজের হাতে তুলে নিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। এলোপাথাড়ি কয়েকটা গুলি ছুঁড়লে কেমন হয়। কি বল?

রজনী নরেন্দ্রনারায়ণকে বাধা দিল, কালতু গুলি ছুঁড়ে লাভ নেই হুজুর। পালিয়ে যাবে। বরং একটা টোপ দিতে পারলে ভাল হত।

—টোপ?

—টোপ মানে একটা জন্তু-জানোয়ার যদি দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেওয়া যেত তা হলে মজা দেখা যেত।

হাতের কাছে জন্তু জানোয়ার এখন কোথায় পাওয়া যাবে। নরেন্দ্রনারায়ণ একটুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন, একটা মানুষকেই বেঁধে নামানো যাক না।

—মানুষ! রজনী কেমন অবাক হয়ে তাকায়।

—মানুষের অভাব কি! হাতের কাছে তো পেনেটির কামিনীই রয়েছে। ওকেই ঝুপ করে ফেলে দিলে কেমন হয়।

কামিনী হাসল, আমাকে ফেললে কুমিরে পিঠ পেতে দেবে। কুমিরের পিঠে চেপে আমি সটান কলকাতা চলে যাব।

—তাই বুঝি! তবে ফেলে দিই?

যতই রসিকতা হোক, গা সিরসির করে ওঠে কামিনীর। দু'পা পিছিয়ে আসে।

নরেন্দ্রনারায়ণ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। তারপর দুম দুম করে দু'বার গুলি ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করলেন। তারপর বন্দুকটা লোফ্‌ফা করে রজনীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

—আসলে বাঘ, কুমির, হরিণ কোনোটাই আমার ভাগ্যে নেই, থাকলে ঠিক দেখতে পেতুম।

গুলির আওয়াজে জঙ্গলের দিকে অসংখ্য পাখি লাফিয়ে উঠেছিল। একে

কুয়াশা তায় এখনো সূর্য ওঠেনি, ভেজা জঙ্গলের একপাশ ডিমের কুসুমের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত রহস্যময় একটা পরিবেশ।

যাওবা কুমির দেখা যেত, গুলি ছোঁড়াতে তা গেল। কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর খবরদারি চলে না। রজনী বলল, হুজুর কুমিরগুলি সব পালিয়ে গেল।

—বাঁচা গেল। ওরা থাকলেও যা না থাকলেও তা, চোখে তো আর দেখা দিল না।

কামিনী বলল, আমার কপাল ভাল, আমি দেখেছি।

রজনী জলে চোখ রেখে আঁতিপাঁতি করে কুমির খুঁজছিল তবুও। বলল, আর দু'-একটা দিন থেকে যান ছোটকর্তা, কুমিরগুলো আবার এদিকে আসবে।

নরেন্দ্রনারায়ণ বজরার ছাদে বসে পড়লেন, তার মানে এখনো ভাগ্যে আছে বলছিস? কাল তো হরিণের বদলে সাপের খেলা দেখালি।

কামিনী বলল, ভাগ্যে থাকলে কলকাতা গিয়েও হরিণের মাংস পাওয়া যেতে পারে।

—আমিও সে কথাই ভাবছিলাম কামিনী। নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, আমি তো কালকেই কলকাতার পথে বজরা ভাসাতে চাই। তুমি কি বল?

কামিনী বলল, আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি, যখন যেতে বলবেন তখনই রাজি।

রজনী তাকিয়ে থাকে, কালই যাবেন হুজুর?

নরেন্দ্রনারায়ণ কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে বললেন, কালই। আজ একবার বিকেলের দিকে এসে দরকারি কিছু কথাবার্তা সেরে নিস। আর আমার মাঝিদের গোছগাছ করে নিতে বলিস।

রজনী খুশী কি অখুশী বোঝা গেল না। মাথা নাড়ল, ঠিক আছে, বিকেলে সবাই আসব। আজ সারা দিন খুব ঝামেলা যাবে, নইলে এখনই সবাইকে ডেকে আনতুম।

আজ নৌকো ছেড়ে কাছারি ডেরায় সবার নেমে পড়ার কথা ওদের। রজনীও আজ নৌকো খালি করে কাছারিঘরে আশ্রয় নেবে। কাল থেকে খালি নৌকোয় কাঠ তোলা হবে। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দু' নৌকো কাঠ কলকাতার পথে যাত্রা করিয়ে দেওয়া যাবে।

নরেন্দ্রনারায়ণ আবার বজরার চারপাশে জঙ্গলের দিকে তাকালেন। ঘোলা দুধসাদা জল। সূর্যের রক্তিম আভা তার ওপর বিছিয়ে পড়ছে। কানের লতি

ছুটো ঠাণ্ডায় জমে আসছিল, কম্বলটাকে মাথা মুড়ি দিয়ে উনি আয়েস করে বসলেন। কতকাল যে সূর্যোদয় দেখা হয়নি তা আর মনেই পড়ে না।

কামিনীও পাশে বসে পড়ল। রোদে গা পিঠ গরম না হওয়া পর্যন্ত নিচে নেমে লাভ নেই।

ষোল

প্রায় এক দুপুর ঐভাবেই বজরার ছাদে বসে আলসেমি করে করে কাটিয়ে দিলেন। এ ছাড়া কিছুই করার নেই।

দুপুরে পাখির মাংস দিয়ে গরম গরম ভাত, বেশ রসিয়ে রসিয়ে খেলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। নৌকোয় রান্না-বান্না, নৌকোতেই খাওয়া। স্নান. বাথরুম সবই ওদের নৌকোয়। বেশ কেটে গেল ক'দিন। বন্ধুবান্ধব কিছু নিয়ে এলে জমিয়ে আড্ডা মারা যেত, কিন্তু এখন একমাত্র কামিনীকে নিয়ে যেন ক্লান্তি ধরে গেছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে পান চিবোতে চিবোতে নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, নৌকোয় নৌকোয় বেশ ক'টা দিন কেটে গেল, কি বল? এবার একবার জঙ্গলের ভেতরটা ঘুরে দেখে এলে হত না। আবার কবে আসব।

কামিনীর পিঠ ছড়ানো খোলা চুল। রোদে পিঠ এলিয়ে বসে দুপুরে ভাত ঘুমটাকে দমন করার চেষ্টা করছিল, বলল, জঙ্গল তো এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। এত দেখার পর আর কিছু বাকি থাকে না।

—থাকে গো থাকে! নরেন্দ্রনারায়ণ চটুল একটু রসিকতা করলেন, মেয়েমানুষ যেমন দেখে শেষ করা যায় না, বনও তেমনি। রোজই মনে হয় নতুন।

—ভালই বলেছেন। কামিনী মিষ্টি করে একটু হাসল।

—তাছাড়া বাইরে থেকে দেখা আর ভেতরে ঢুকে দেখা, বুঝলে না।

—বুঝলাম।

—বুঝে থাকলে এবার চটপট তৈরি হয়ে নাও। বনের ভেতর ঢুকে দুপুরের আলসেমিটা একবার কাটিয়ে আসি, চল।

—ও মা গো! ঐ জঙ্গলে ঢুকলে আর রক্ষা থাকবে না।

—কেন, রক্ষা থাকবে না কেন?

—জানেন না, কেন? বাঘটাকে তো কিছুই করতে পারলেন না আপনারা। মানুষের স্বাদ পাওয়া বাঘকে বিশ্বাস করি না।

—বাঘ! নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, হাসিটা বড় অদ্ভুত। ভয় নেই, বন্দুক-টন্দুক নিয়েই বেরুব। রজনী মকবুল ছাড়াও আরো দু'-একজনকে নিয়ে নেব।

কামিনীর তবু ভরসা হয় না। নিজের অসহায়তা ও প্রকাশ করতে মলিনভাবে একটু হাসে। আপনারাই ঘুরে আসুন না, আমি একটু বসি।

—মাথা খারাপ, তোমাকে একা রেখে আমি নড়তেই পারব না। ওঠ ওঠ একবার গা তোল মা ভবানী।

কামিনী বুঝল, মাথায় যখন একবার ঢুকেছে তখন আর উপায় নেই। অথচ এই অদ্ভুত জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর কি আছে কে জানে! জমিদারী খেয়াল। মনে মনে বিরক্ত হলেও ওকে উঠতে হল।

নরেন্দ্রনারায়ণ হাঁক-ডাক শুরু করে দিলেন, তিনটে বন্দুকই সঙ্গে নেওয়া হল। ডাক পড়ল শুকদেবেরও। সাপ নিয়ে যা কীর্তি দেখিয়েছে ও, তাতে ওরকম লোকই এখন সঙ্গে দরকার।

তৈরি হয়ে ভেড়ির ওপর জটলা শুরু করে দিল কয়েকজন। ঈশান একটা বন্দুক তুলে নিল। প্রসাদ সিংয়ের হাতে একখানা, বাকিখানা রইল রজনীর হাতে।

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীকে নিয়ে ঘাটসিঁড়ি বেয়ে বজরা থেকে ভেড়িতে নেমে এলেন। সব ঠিক আছে তো? নরেন্দ্রনারায়ণ শুধোলেন।

—সব তৈরি হুজুর। রজনী উত্তর করল। আমরা যতক্ষণ সঙ্গে আছি, কিছু ভাববেন না হুজুর।

—বটে! এত লোকের মাঝখান থেকেই তো কি নাম যেন তুলে নিয়ে গেল। কামিনী আবার আক্রমণ করল রজনীকে।

রজনী নির্বিকার। বলল, সে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই।

—অ! ঘুমিয়ে না পড়লে যেন চড়চাপড় মেরে বাঘকে তাড়িয়ে দিতে! যাকগে, চল, কোন দিকে যাবে?

শুকদেবের চোখেমুখে সারাক্ষণ একটা হাসির ছোঁয়া লেগেই আছে, বলল, যাবার তো একটাই জায়গা হুজুর, ফিরিঙ্গি দেউল।

—ফিরিঙ্গি দেউল, মানে সেই সাপের জায়গা?

শুকদেব হাসে, শীতকালে বড় একটা সাপ থাকে না হুজুর। কপাল ভাল বলেই আমরা একটা পেয়ে গিয়েছিলাম।

কামিনা একবার ভেড়ির নিচে বনের দিকে তাকাল, বাব্বা, এর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে পারব তো?

—পালকি থাকলে পালকির বন্দোবস্ত করে দিতাম, কিন্তু নেই যখন কি

পার করা যায়। নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর কাঁধে হাত রেখে এগোতে শুরু করলেন, আসলে একটু ভিতরে ঢুকলেই বুঝতে পারবে, কিচ্ছু কঠিন না।

তবু বনের মধ্যে প্রথম পা দিতেই কামিনীর শাড়ি আটকে গেল কাঁটায়।

হাঁ হাঁ করে উঠল ঈশান। ঈশান আর শুকদেব পেছনে পেছনে, সামনে রয়েছে রজনী, মকবুল আর প্রসাদ।

—শাড়িটা একটু তুলে হাঁট না, এই জঙ্গলে কি এসে যায়।

কামিনী অন্য সময় হলে চোখে কপট তিরস্কার ছড়াত, কিন্তু এখন রঙ্গ-রসিকতাও ভুলে গেছে। হাঁটুর ওপর শাড়ি তুলে ধবধবে পা দুটো নগ্ন করে দিল। পায়ে সরু ফিতের চটি। পা টিপে টিপে ও এগোতে শুরু করে।

জঙ্গলের আকৃতি দেখে শিউরে উঠতে হয়। গাছের ডালে পাতায় যেন জাল সৃষ্টি করে রেখেছে। নিচে মাটি কি নরম। কখনো কখনো মনে হচ্ছে পা যেন কাদার মধ্যে গেঁথে যাবে। আর কাদা ভেদ করে বেরিয়ে আসা শুলোগুলো কি ছুঁচলো। চামড়ায় একটু ছোঁয়া লাগতেই কেটে দরদর করে রক্ত বেরুতে শুরু করবে।

অবস্থা বুঝে খুব সাবধানে পা মেপে মেপে এগোতে শুরু করলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। কামিনীর চোখে মুখে বিরক্তি, নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে এসে কি ঝামেলাতেই না পড়া গেছে।

পাতার খসখস শব্দ হতেই আবার চমকে উঠতে হয়। ঈশান পেছন থেকে বলে, ও কিছু নয় হুজুর, আমরা আছি।

নরেন্দ্রনারায়ণ সামনের দিকে তাকান, এই হারামজাদা, রজনী, তোরা অত জোরে হাঁটছিস কেন?

রজনীরা দাঁড়ায়। মকবুলের হাতে বল্লমের মতো একটা লাঠি। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে শব্দ করে ও এগোচ্ছিল। শব্দটা অদ্ভুতভাবে চারপাশে ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছিল। মাঝে মাঝে ভয় পাওয়া পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ ওদের কানে আসছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ এক পলক আকাশের দিকে তাকালেন, আকাশ সূর্যের আলোয় বেশ পরিষ্কার। কিন্তু জঙ্গলের সহস্র বাধা যেন সেই আলোকণাকে ভিতরে ঢুকতে দিতে নারাজ। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার পরিবেশ জঙ্গলের ভেতরে। কখনো বা ছিটেফোঁটা আলো জঙ্গলের ফাঁকফোকর গলিয়ে নিচে এসে পড়েছে। কখনো আবার পাতার আড়ালে সূর্যের আলো বাধা পেয়ে সহস্র ধারায় ছড়িয়ে গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা যেন।

হঠাৎ এক সময় থমকে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনারায়ণ, ওটা কি হে?

শুকদেব লাফিয়ে এগিয়ে আসে, কি হুজুর ?

—ঐ যে কি একটা লম্বামতো দাঁড়িয়ে আছে ?

ভয়ে চিৎকার করে ওঠে কামিনী।

রজনীরা পিছিয়ে এসে বন্দুক তুলে ধরল, কি, কোথায় ?

নরেন্দ্রনারায়ণ আঙুল তুলে দেখালেন, ঐ যে লতা ঝোপটার পিছনে।

ঈশান বন্দুক হাতে লতা ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বন্দুকের নল দিয়ে ঝোপের গায়ে নাড়া দিল, কিছুই নেই।

নরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, ঐ যে ঝোপের পাশে।

—ঝোপের পাশে, ঈশান ঝোপের পাশে একটা মাথা ভাঙা মরা গাছ দেখতে পেল, এটা ?

—হ্যাঁ, কী ওটা ?

ঈশান হাসবে না কাঁদবে। এটা তো গাছ।

—গাছ ! নরেন্দ্রনারায়ণ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, একটা গাছ অমন চারপেয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে !

—গাছটা হয়তো ঝড়-ঝাপটায় ভেঙে পড়ে ওরকম হয়ে আছে।

রজনী বলল, অনেক সময় এ রকম চোখের ভুল হয়। আর সেজন্য গভীর জঙ্গলে কেউ একা ঢুকতে চায় না।

কামিনীর আতঙ্ক এখনো সারা চোখে ছড়িয়ে আছে। বলল, চলুন না, আমরা ফিরি এবার। আমার ভীষণ ভয় করছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর দিকে অভয় দিয়ে তাকালেন, ঢুকেছি যখন ফিরিঙ্গি দেউলটা দেখেই ফিরব। কতদূর রে তোদের ফিরিঙ্গি দেউল ?

—বেশি দূর নয় হুজুর। শুকদেব বলে, আমরা আগের দিন ঘুর পথে গিয়েছিলাম, আজ সোজা যাচ্ছি।

কামিনী বিরক্ত গলায় বলল, পথ কোথায়! বনের মধ্যে আবার ঘুর পথ সোজা পথ আছে নাকি ?

ঈশান হাসল, ঐ সূর্যদেব আছেন না। ঐ তো বনের মধ্যে পথ দেখায়। চলুন হুজুর, আর সামান্য দূরেই ফিরিঙ্গি দেউল।

নরেন্দ্রনারায়ণ আবার কামিনীকে অভয় দিলেন, ভয় নেই কামিনী, আমরা এতগুলো লোক একসঙ্গে আছি, ভয় কি !

কামিনী আবার শাড়ি সামলাতে সামলাতে হাঁটতে শুরু করে। সতর্ক দৃষ্টি, সতর্ক কান, কী ঝামেলাতেই পড়া গেছে আজ।

আরো খানিকটা এগোতেই মকবুল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। মাটিতে ঝুঁকে কী যেন দেখাতে শুরু করল।

বুকের ভেতর আবার ধড়াস করে উঠল নরেন্দ্রনারায়ণের, কি ওখানে?

—হুজুর, পেয়েছি। হরিণের পা।

—হরিণের পা। সেটা কি জিনিস?

নরেন্দ্রনারায়ণ এগিয়ে এলেন, অসংখ্য পায়ের ছাপ।

—এখান দিয়ে নিশ্চয় হরিণ গেছে হুজুর।

—হরিণের পায়ের ছাপ এরকম? কৌতুকে ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তবে তোরা হরিণ নেই বলছিলি?

শুকদেব বলল, আমরা কিন্তু সারা জঙ্গল তোলপাড় করেও ওদের পাইনি হুজুর। ভীষণ চালাক। যদি হুকুম করেন তো একবার এই ছাপ ধরে এগিয়ে এগিয়ে দেখতে পারি। এই দিক দিয়েই ওরা গেছে।

—মাথা খারাপ নাকি! আমাদের ফেলে রেখে কোথাও এগোবার দরকার নেই।

রজনীও শুকদেবকে থামিয়ে দিল। হরিণ এখান দিয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু কোথায় গেছে তা তো জানা নেই। আর মানুষের সাড়া পেলে ওরা নিশ্চয়ই ধারেকাছে থাকবে না। অগত্যা হরিণ সন্ধান থামিয়ে রাখতে হল। ঈশান ফিসফিস করে বলল, আমাদের কপালে নেই। কপালে থাকলে আগেই পেতাম।

শুকদেব বলে, আসলে ছোটকর্তারই কপালে নেই। জঙ্গল কাটতে কাটতে একদিন না একদিন সব হরিণ আমাদের হাতে ধরা পড়বে দেখে নিও।

রজনীর গলা পাওয়া গেল, বাঁদিকে বানরের ঝাঁক আছে। ওদের পেছু লাগবেন না কেউ।

নরেন্দ্রনারায়ণ বাঁদিকে তাকালেন, কোথায় বানর। কিছুই চোখে পড়ল না ওঁর।

কামিনী বোধহয় নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চারের চেষ্টা করছিল। বলল, কাশীতে অনেক হনুমান দেখেছি। সে কি হনুমান, জোর জুলুম করে, মানুষের পেছনে লাগে।

ঈশান বলল, এখানকার হনুমান বাঘ মারতে পারে।

ঈশান রসিকতা করছে কিনা ধরা গেল না। নরেন্দ্রনারায়ণ তখনো বানর দেখার জন্য ব্যস্ত। এপাশে-ওপাশে খুঁজছিলেন। কামিনী পিছন ফিরে একবার

ঈশানকে দেখে নিল। ঈশানের চোখে হালকা একটু ঠাট্টা যেন ঝরে পড়ছে।

শুকদেব আঙুল তুলে দেখাল, ঐদিকে দেখুন, ঐ যে।

নরেন্দ্রনারায়ণ এবার চমকে উঠলেন, সত্যি হাজারে হাজারে বানর।

—ওরা একসঙ্গে সবাই দল বেঁধে থাকে। একবার তেড়ে এলে কার বাপের সাধ্যি সামলায়।

নরেন্দ্রনারায়ণ চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। অদ্ভুত কুতকুতে চোখে বানরগুলি এখন মানুষ দেখছে। চাহনিগুলো মোটেই ভাল নয়। বুকের ভেতর গুরগুর করে ওঠে। আমাদের এই ছ-সাতটা মানুষের দিকে সত্যি সত্যি ওরা তেড়ে এলে বাঁচার আশা থাকবে না। সামান্য তিনটে বন্দুক দিয়ে যে ওদের ঠেকানো যাবে না, বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না।

শুকদেব বলল, বানরগুলো না দেখার ভান করে এগিয়ে যান হুজুর। ওদের আমরা তেড়ে না গেলে ওরাও আমাদের তাড়া করবে না।

মাথা নিচু করে মিত্রপক্ষের ভঙ্গি করে এগোতে শুরু করে সবাই। আরো খানিকটা এগিয়ে রজনীর মনে হল নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছনো গেছে। বলল, আর ভয় নেই হুজুর, সামনেই ফিরিঙ্গি দেউল দেখা যাচ্ছে।

—ফিরিঙ্গি দেউল! কোথায়? কেবল জঙ্গলের গাছপালা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না নরেন্দ্রনারায়ণের!

ঈশান আঙুল তুলে একটা ঢিবি দেখাল, ঐ যে ঢিবিটা দেখছেন, ঐটে। ওখানে ইটের গা থেকে সাপ ধরেছিল শুকদেব।

—ওখানে কি এগোনো ভাল হবে? কামিনীর গলা দিয়ে ক্যাসকেসে শব্দ বেরুল।

নরেন্দ্রনারায়ণ ইটের ঢিবিটাকে আলাদা করে দেখবার চেষ্টা করছিলেন। কে জানে, এই ঢিবির পেছনে কত কালের ইতিহাস লুকানো আছে। অথচ সবটাই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস। ওটা আসলে ফিরিঙ্গিরাই তৈরি করেছিল না মগেরা, তাও আর জানার উপায় নেই। যেই বানিয়ে থাক, আগে ওখানে লোক যাতায়াত ছিল এটা ভাবতেই কেমন গা ছমছম করে ওঠে নরেন্দ্র-নারায়ণের। এখানে পথঘাটও তৈরি হয়েছিল এককালে। কিন্তু সব কিছুই কালে কালে জঙ্গল গ্রাস করে নিয়েছে। জঙ্গলের শক্তিই বা কম কি!

রজনী বলল, হুজুর, মাত্র মাসখানেক আমাকে সময় দিন, দেখুন এই অবধি আমি জঙ্গল সাফ করে আপনাকে দেখাচ্ছি। আর এই ফিরিঙ্গি দেউলের এখানেই

আমরা বনবিবির থাথান বানাব। বনবিবি যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন, দেখবেন, হুহু করে কাজ এগোচ্ছে।

—এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন? কামিনী অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ কামিনীর দিকে চোখ রাখলেন, বসার জায়গা থাকলে বসতাম।

কামিনী কিছুটা অসহায় বোধ করল। ঠিক আছে, আপনি বসুন।

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, কেন যে এত ভয় পাচ্ছ বুঝতে পারছি না। আমার তো বেশ লাগছে জায়গাটা।

—তা তো লাগবেই! আপনার সম্পত্তি এসব, ভাল লাগবে না?

—তা যা বলেছ। নরেন্দ্রনারায়ণ দমলেন না, বললেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে, এত যে সব গাছপালা আর এই গাছপালার আড়ালে লুকোনো এত জন্তু-জানোয়ার পশু-পাখি, এরা সবাই কিন্তু আমার দয়ায় বেঁচে আছে। আমি ইচ্ছে করলেই এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারি, আবার ইচ্ছে করলেই—

—এ সময় একটা বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেই বোঝা যেত।

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, আসবে না। বাঘেরও প্রাণের ভয় আছে। আসলে মানুষকে যে ভগবান শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তৈরি করেছেন, এখানে এসে বেশ তা বুঝতে পারছি।

রজনী দোহারকি দিল, হ্যাঁ হুজুর, মানুষের বুদ্ধির কাছে হার স্বীকার না করে কারো উপায় নেই।

—তাই যদি হবে, তবে কিরিজি দেউলের এই অবস্থা কেন? মানুষেই তো বানিয়েছিল এসব?

—মানুষেই বানিয়েছে, কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর আর এদিকে কেউ ফিরে তাকায়নি। তাছাড়া সব মানুষ তো আবার একরকম নয়।

মকবুল বলল, হ্যাঁ হুজুর, মানুষের মধ্যেও হের-ফের আছে, কি বলো ঈশান, নেই?

—নিশ্চয়ই আছে হুজুর। রজনীর গলাতে তোষামোদী ঝরে পড়ে। আমাদের ছোটকর্তার যুগ্যি একজনও নেই।

নরেন্দ্রনারায়ণ পরিতুষ্ট হলেন কিনা বোঝা গেল না। মনে হল, উনি প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চাইছেন, বললেন, সবই তো বুঝলাম, তা আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব না কি? চল, দেউলটা একবার ঘুরে দেখি।

কামিনী বলল, এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে, আবার কি দেখার আছে বুঝি না।

—ঘুরে না দেখলে বুঝবে কি করে, চলো, এগোও।

দলটা এগোতে শুরু করে।

রজনী বলল, পুরানো এই সব ঢিবির নিচে অনেক সময় অনেক ধনরত্ন চাপা পড়ে থাকে বলে শুনেছি। এই ঢিবির নিচেও তেমন কিছু যদি থাকে হুজুর তাহলে আর পায় কে।

নরেন্দ্রনারায়ণ হাসলেন, এর নিচে মাটি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ফিরিঙ্গিরা অত বোকা নয়, ধন-দৌলত ফেলে রেখে চলে যাবে। মানুষের জান যায় তবু ভি আচ্ছা, কিন্তু ধন-দৌলত ছাড়ে না।

শুকদেব বলল, অনেক সময় হুজুর স্রেফ কঙ্কাল জমা পড়ে থাকে এই ঢিবির নিচে। হি-হি করে হাসল।

কঙ্কাল, কিসের কঙ্কাল। কামিনী শুকদেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

শুকদেবের চোখে-মুখে কৌতুক। কার কঙ্কাল আবার, মানুষের। অনেককাল আগে জন্মালে আমার কঙ্কালও পড়ে থাকতে পারত।

—তুই থামবি? রজনী ওকে ধমকে ওঠে।

শুকদেবের বিন্দুমাত্র ভয়-ডর আছে বলে মনে হয় না। বলে, অত ধমকাচ্ছ কেন গো রজনীভাই। তোমারও কঙ্কাল থাকতে পারত।

রজনী ঈশানের দিকে তাকায়, এ হারামজাদার জ্ঞান-গম্যি বলে কিছুই নেই। কোথায় ছোটকর্তাকে চারপাশটা ভাল করে ঘুরিয়ে দেখাবি, তা না যত রাজ্যের অলুক্ষণে গল্প।

শুকদেব হাসে, ওটাই তো আসল কথা গো। তারপর ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে।

নরেন্দ্রনারায়ণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখেন।

রজনী আবার ওকে ধমকায়, এই থামবি? আসলে হুজুর ও একটা জানোয়ার। ওর আসল পরিচয় যদি শোনেন, ওটাকে মানুষ বলেই মনে হবে না আপনার।

শুকদেব গাছের ডাল ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকি দিতে থাকে। ঝরঝর ঝরঝর একটা অদ্ভুত শব্দ হয়। সেই শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শুকদেব হাসে, মাথা ঝাঁকায়, গা হাত-পা বাঁকায়। তারপর হঠাৎ থমকে গিয়ে বলে, হুজুর এই যে গাছপালা দেখছেন, এদের খবরদার বিশ্বাস করবেন না হুজুর।

নরেন্দ্রনারায়ণ কৌতুকে তাকিয়ে থাকেন।

—এরাও বদলা নিতে জানে হুজুর। সুযোগ পেলেই বিষ দাঁত মেলে ধরে তেড়ে আসবে। এদের বিশ্বাস নেই হুজুর।

রজনী এবার নিজেই কেমন থমকে যায়। কি বলতে চাইছে শুকদেব, কে জানে।

ঈশান বলল, ওর সব কথা কখনো বোঝা যায় না। জানোয়ার।

শুকদেব আবার মাতালের মতো গাছের ডাল ধরে লাফায়, বুঝবি না, বুঝবি না, বুঝবি না।

সতের

আজ বড়দিন। উৎসবের দিন। খুব ভোরে পাড়াময় ক্যারল গেয়ে বেরিয়ে সকালে স্নানটান সেরে সাজগোজ করে সবাই চার্চে এসে হাজির হল। ফাদার গ্যাব্রিয়েলকে আজ সাক্ষাৎ যীশুর মতো দেখাচ্ছিল। দু' চোখে ছড়িয়ে আছে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি। ভারি মিষ্টি লাগছিল ওঁকে। গৌরীর চোখ ভরে যাচ্ছিল ফাদারের দিকে তাকিয়ে। সাদা ধবধবে আলখাল্লা মতো পোশাক পরেছেন ফাদার। সারা দেহ থেকে যেন দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে। যাকে দেখছেন, তাকেই কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। মিষ্টি করে হেসে স্নেহ বিলিয়ে দিচ্ছেন।

গৌরীকে দেখেও ফাদার আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, মামণি, ভাল আছ? আশ্রমের সবাই এসেছে তো?

গৌরীর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এত ভাল মানুষ ফাদার, কিন্তু এই ফাদারের চোখে ধুলো দিয়ে আজই ও গোপনে পালিয়ে যাবে লক্ষ্মণদার সঙ্গে। সন্ধ্যার পর একটু ফাঁক বুঝেই ওরা নৌকো ছাড়বে। ফাদার যখন জানতে পারবেন গৌরী পালিয়েছে, ভীষণ ব্যথা পাবেন ফাদার। অথচ এছাড়া আর কিছু করারও উপায় নেই ওদের। ফাদারকে যদি বলা যেত, ফাদার আমি আর লক্ষ্মণদা একবার বিত্তাপুরীতে যাব, মায়ের সঙ্গে দেখা করেই আবার ফিরে আসব, ফাদার কিছুতেই ওদের ছাড়তেন না। কিছুতেই এখন গৌরীকে কোথাও যেতে দেবে না ওরা।

গৌরী মনের ভাব গোপন রেখে বলল, হ্যাঁ ফাদার, আমরা সবাই এসেছি।

—চিন্ময়ীকে দেখছি না?

—চিন্ময়ী আর বেলা বাগানে বসে মালা গাঁথছে ফাদার। ওরা এখনি এসে যাবে।

—বেশ, ভাল, ভাল।

ওদিকে তখন কুন্তি আর দুর্লভকেও দেখা গেল। দুর্লভের মাথায় জবজব করছে

তেল। পাট করা চুল। বহু পুরনো কালের একটা কোট গায়ে চাপিয়ে সাহেব হয়ে এসেছে দুর্লভ। ধুতিটা সে তুলনায় অনেক পুরনো।

কুন্তি গৌরীকে দেখে এগিয়ে এল, এই যে গৌরী, তোমার সঙ্গীটি কোথায়? তাকে দেখছি না?

গৌরীর বুঝতে অসুবিধা হল না, লক্ষ্মণদার সম্পর্কেই ইঙ্গিত করছে কুন্তিদি। হেসে বলল, আসবে।

দুর্লভ বলল, লক্ষ্মণ ছেলেটা কিন্তু ভাল! ওরা যদি রাজি থাকে, আমি লাগিয়ে দিতে পারি।

—তোমাকে লাগাতে হবে না। ওরাই পারবে। হেসে জবাব দিল কুন্তি।

গৌরী জানে, ওদের দুজনকে নিয়ে এই যে কানাঘুষা এটা চিন্ময়ীই ছড়িয়েছে। লক্ষ্মণদা আর গৌরী কথা বললে চিন্ময়ী সহ্য করতে পারে না। লক্ষ্মণদা আশ্রমের সব কাজ ফেলে গৌরীর আশেপাশেই লেগে থাকে, এটা অনেকেরই সহ্য করার নয়। কিন্তু গৌরী কি করতে পারে? গৌরীর কি দোষ? গৌরীর মনের কথা কে বুঝতে পারবে! লক্ষ্মণদাকে আজ গৌরীর প্রয়োজন একটিই মাত্র কারণে, লক্ষ্মণদাকে ছাড়া বিষ্ণুপুরী মায়ের কাছে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই ওর। ফলে যে যা ভাবুক, যে যা বলুক, গৌরী আজকের বিকেল অবধি সহ্য করবে। তারপর অদৃষ্টে যা আছে।

দুর্লভ বলল, তা বাপু যা কর আর তা কর, আজ আমাদের বাড়িতে নতুন চালের পিঠে হবে, সন্ধ্যের পরে একবার এসো দেখি।

কুন্তির গায়ে ধুসর রঙের একটা চাদর জড়ানো। চোখে কৌতুক ছড়িয়ে বলল, আহা বেচারিকে আবার ঝামেলায় ফেলছ কেন। আজ ওর সময় আছে বুঝি?

—কেন কেন, সময় নেই কেন?

—কেন কি গো! লক্ষ্মণের সঙ্গে একটু বেড়াবে-টেড়াবে তাও তোমরা বন্ধ করে দিতে চাও।

গৌরী কেমন মিইয়ে গেল। কিন্তু আজ আর রাগ নয়, দুঃখ নয়, আজই তো ওর শেষ দিন এখানে। দুর্লভের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি যাব দুর্লভদা। যদি বলো তো প্রার্থনা শেষ হলেই আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি।

এমন সময় জলধরকে দেখা গেল। জলধর তার বাচ্চা ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। খুশী খুশী মুখ। ছেলেটা বাবার কাঁধে বসে আঙুল চুষছে।

—সুপ্রভাত দুর্লভদা।

দুর্লভের মেজাজই আলাদা। সাহেবি ভঙ্গিতে হাত তুলল, গুড মর্নিং।

—কুন্তি বৌদিকে তো মরিয়মের মতো লাগছে গো! ছেলেটাকে কাঁধ থেকে নামাল জলধর। ফাদারের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

গৌরী বলল, এই তো কিছুক্ষণ আগেই ফাদার এখানে ছিলেন।

জলধর গৌরীর মুখের দিকে তাকায়, সাদা ধবধবে মুখে খোদাই করা দাগগুলো আজও সেদিনের ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। কি বীভৎস ছিল সেদিন মুখখানা। যীশুর অসীম করুণা, যমের দরজা থেকে মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনা গেছে। জলধর শুধাল, ভাল আছ তো বোন?

গৌরী মলিন চোখে বলল, ভাল। তুমি ভাল জলধরদা? বৌদি আসেনি?

—আসেনি আবার! দেখ গে কোথায় কোন বয়-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করছে। আমিই শালা চাকরের চাকর। তোমার বৌদি একটু মিষ্টি চোখে আমার দিকে তাকালেই আমি গলে যাই।

—বউ-এর চাকর হতে পারা ভাগ্যের কথা। দুর্লভ কুন্তির দিকে তাকায়, কি গো তুমিই বল না?

—ইস রে, বউদের কথা কত শোনে বাবুরা। ওসব মুখে মুখেই।

গৌরী হঠাৎ চমকে ওঠে, ওদিকে লক্ষ্মণদাকে দেখা গেল। না জানি, এখনি আবার এখানটিতে চলে আসে। লক্ষ্মণদার যদি বুদ্ধি থাকে এখানে ওর না আসাই উচিত।

জলধর গলা তুলে কি যেন একটা রসিকতা করল, অন্যমনস্ক থাকায় গৌরী তা ধরতে পারল না। সবাই হোহো করে হেসে উঠতেই ওকেও নকলভাবে কিছুটা হাসতে হল।

এমন সময় চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠল। এখন চার্চে গিয়ে আসন নিতে হবে সবাইকে। এখনি প্রার্থনা শুরু হবে বড়দিনের।

—চল, চল। ভেতরে চল সব। তাড়া লাগাল দুর্লভ।

গৌরী কুন্তির পাশেপাশে হেঁটে চার্চের দিকে এগিয়ে এল।

চার্চের ভেতরে ভারি সুন্দর শান্ত একটা পরিবেশ। সামনেই দেয়ালজোড়া যীশু খ্রীষ্টের ছবি। ছবির সামনে একটা টেবিল। ওখান থেকেই ফাদার আজ প্রার্থনা পরিচালনা করবেন।

মিনিট কয়েক সময় লাগল সবার আসন নিতে। জগদীশকে দেখা গেল হারমোনিয়ম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গাও ওর পাশে খোল নিয়ে তৈরি। এছাড়া বাঁশি, করতাল, বেহালা সব কটি বাদ্যযন্ত্রই আজ কাজে লাগবে।

কুন্তির পাশাপাশি বসল গৌরী। চিন্ময়ী যে কখন এসে ওর পেছনে বসেছিল ও খেয়াল করেনি। চিন্ময়ী ওর পিঠে আঙুলের টোকা দিতেই ও চমকে পেছনে তাকাল। তাকিয়েই আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। এখানে বসে কোনোরকম কথা বলা অন্যায়।

চিন্ময়ী এবার আলতো করে গৌরীর পিঠে চিমটি কাটল। আবার পেছনে তাকাতে হল গৌরীকে। চোখে গাম্ভীর্য এনে চিন্ময়ীকে ধমকে উঠল গৌরী।

ফিসফিস করে চিন্ময়ী বলল, ওদিকে তাকা না মুখপুড়ী।

গৌরী বাঁ দিকে তাকাল। কিছুই বুঝতে পারল না।

চিন্ময়ী ফিসফিস করে বলল, লক্ষ্মণদা এসেছে।

এবার সত্যি সত্যি বিরক্ত হয় গৌরী। লক্ষ্মণদা এসেছে তো ও কি করবে! চোখ ঘুরিয়ে কাঠ হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ফাদার উপাসনা শুরু করে দিয়েছেন। গমগম করে হারমোনিয়াম বেজে উঠেছে। খোলের চামড়ায় দুটি চারটি করে শব্দ ফুটে উঠেছে। ঘরের পরিবেশটাই মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেল। সবাই সমস্বরে গান ধরল :

হে পৃথিবীস্থ মানব সব
গাও মঙ্গলদাতা প্রভুর স্তব
গাও উর্দ্ধে স্বর্গের সৈন্যগণ
গাও পিতা, পুত্র, সদাত্মন। আমেন।

গৌরী চোখ বুজল। এই বোধহয় ওর শেষ উপাসনা। একবার এখান থেকে বেরিয়ে গেলে কে জানে আর কোনদিন আবার এখানে ও ফিরে আসতে পারবে কিনা। বুকের ভেতর গুরগুর করে কেঁপে ওঠে ওর। হে ভগবান, আমাকে ক্ষমা করো গো। আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি আমাকে তুমি ক্ষমা করো। যীশু-ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইলে নিশ্চয়ই উনি ক্ষমা করবেন।

চোখ বুজে থাকে গৌরী। ভক্তি দিয়ে প্রাণ দিয়ে আজকের উপাসনাটা ও করে নিতে চায়। চারদিকে এখন ঈশ্বরের জয়গান চলছে। আকাশে বাতাসে, মাটির প্রতিটি রেণুতে রেণুতে যেন ছড়িয়ে পড়ছে সেই গান। দীপ্তিমান এক সূর্য যেন অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে আসছে সামনে। বৃক্ষের শাখায় প্রশাখায় অসংখ্য ফুলের কারিকুরি, ছড়িয়ে পড়ছে। প্রজাপতি উড়ছে, নরমপ্রাণ প্রজাপতিগুলো কি খুশী, কি খুশী!

চোখ খুলতে ইচ্ছে হল না গৌরীর। চোখ খুললেই যেন এই ভাল-লাগা স্বপ্নটুকু ওর কেটে যাবে। চোখ বুজে থেকেই ও ছেলেমানুষী খেলায় মেতে উঠল, প্রজাপতি ধরার খেলায়।

ওর শাড়ির আঁচল ছুঁয়ে ছুঁয়ে পালিয়ে যাচ্ছে প্রজাপতি। ওর মা বলত, ঘরে প্রজাপতি আসা শুভ। গৌরীও জানে, প্রজাপতি গায়ে এসে বসলে বিয়ে হয়। তবে কি লক্ষ্মণদাই ওকে বিয়ে করবে! লক্ষ্মণদার সঙ্গে ওর জীবন বাঁধা হয়ে আছে!

না, অসম্ভব। আগে মার কাছে যাব। মাকে সব কিছু খুলে বলব। মা যদি রাজি থাকে তবেই লক্ষ্মণদাকে স্বামী হিসেবে মেনে নেব। তখন লক্ষ্মণদা যদি চায়, আবার এই চার্চেই ফিরে এসে বাইবেল সাক্ষী রেখে বিয়ে হবে আমাদের।

সারা গা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসে গৌরীর। মাথার ভেতর ঝিমঝিম শুরু হয়। ও এখন কোথায়! ও কি ঘুমিয়ে আছে, না জেগে। ওর এমন আচ্ছন্ন লাগছে কেন!

প্রজাপতি ধরতে গিয়ে ওর হাতের আঙুলে রেণু লেগে গেল বোধহয়। উৎসাহ ওর দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আর কি আশ্চর্য, ছুটোছুটি করতে করতে হঠাৎ এক সময় ওর খেয়াল হল, ওদের গাঁয়েই ও চলে এসেছে। হ্যাঁ, ওই তো ওদের বাড়ির পুকুর-ঘাট। দিব্যি ও দেখতে পাচ্ছে, ওদের গাঁয়ের চেনা চেনা মুখগুলি সব হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু গৌরীকে দেখতে পেয়েও কারো কোনো উৎসাহ নেই।

ওর মা। হ্যাঁ, ওই তো ওর মা পুকুরঘাটে বসে বাসন ধুচ্ছে। পুকুরে কচুরি-পানা ঠাসা। বাঁশ বেঁধে ঠেকিয়ে রাখতে হয়েছে কচুরিপানা।

পিছন থেকে এগিয়ে গিয়ে মায়ের গায়ে জল ছিটিয়ে দিলে কেমন হয়। মা ওকে দেখেই কেমন চমকে উঠবে। তারপর কত মজা।

—এই এতকাল কোথায় ছিলি? তুই নাকি খ্রীস্টান হয়েছিস খুকি?

—হয়েছি তো। ওদের মতো লোক হয় বুঝি? ফাদারকে যদি তুমি একবার দেখতে মা!

—সরে দাঁড়া বাপু! ছুঁয়ে দিসনি আবার! বেজাত হয়ে এসে অত গায় গায় কেন? ঘরে ঢুকিস না যেন।

—বারে, ঘরে না ঢুকলে কোথায় থাকব? এই কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে গাছ-তলায় বসে কাটানো যায় বুঝি?

—তাছাড়া আর উপায় কি বল। তোর জন্য তো আর আচার-বিচার সব ছেড়ে দিতে পারি না।

আবার একটা প্রজাপতি উড়ে এসে ওর চুলে বসল। মাগো, আর বসার জায়গা পায় না। মাথায় হাত বোলাতে গিয়ে বুঝল, নাহ্, নেই তো। কিচ্ছু নেই; স্রেফ ফাঁকি। এমন ভঙ্গি করছিল প্রজাপতিটা, যেন ওর চুলেই বসেছে।

গৌরী আবার হাত তুলতে যাচ্ছিল মাথায়, এমন সময় বুঝল, কে যেন ওকে ডাকছে, গৌরী, এই গৌরী।

গৌরীর সমস্ত তন্দ্রাভাবটা এবার কেটে গেল। চোখ খুলল গৌরী। ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

—কি হয়েছে গৌরী? অমন করছিস কেন?

কুন্তির দিকে তাকাল গৌরী, কৈ! কিছু না তো!

—কিছু না কি! কখন প্রার্থনা শেষ হয়ে গেল, তোর খেয়ালই নেই।

এতক্ষণ পর গৌরীর হুঁশ ফিরে এল পুরোপুরি, তাই তো! সবাই তো উঠে পড়েছে! ও যে কী সব ছাইভস্ম স্বপ্ন দেখল এতক্ষণ! ছি ছি! ঘুমিয়ে পড়াটা একদম উচিত হয়নি ওর। ভীষণ লজ্জা পেল গৌরী। সবাই কি ভাবল কে জানে।

কুন্তি বলল, যাক গে, উঠে পড়, ওদিকে মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

গৌরী উঠে দাঁড়ায়। কুন্তি ওপাশে আর এক দঙ্গল মেয়ের মধ্যে মিশে গেল। ঘরটা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। গৌরীর কেমন খারাপ লাগল, প্রার্থনার গান কিছুই শোনা হল না ওর। আজকের দিনটা শুরু থেকেই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একবার ভাবল, আর এখানে নয়, সটান আশ্রমে গিয়ে ও শুয়ে থাকবে। যে যা ভাবে ভাবুক, কিছু যায় আসে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিনটা কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচা যায়। সন্ধ্যা হতে না হতেই ও পালিয়ে ফুলতলির ঘাটের কাছে চলে যাবে, ওখানে নৌকো নিয়ে তৈরি থাকবে লক্ষ্মণদা। তারপর আর পায় কে।

—এই গৌরী! মিষ্টি নিবি না? যা।

গৌরী দেখল, আবার চিন্ময়ী এসে হাজির হয়েছে। চিন্ময়ীকে একদম সহ্য করতে পারে না গৌরী। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, না। আমার মিষ্টি লাগবে না। তুই যা।

—লক্ষ্মণদা তোর জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। যা না, তোকে খাইয়ে দেবে।

গৌরীর আপাদ-মস্তক জ্বলে গেল। কিন্তু রাগ সামলিয়ে বলল, ঠিক আছে, যাচ্ছি। হিংসে করিস না যেন।

—আমার বয়ে গেছে হিংসে করতে।

কথা বললেই কথা বাড়বে। গৌরী চুপ করে গেল। আসন ছেড়ে চলে এল বাইরে। বাইরে ভিন্ন পরিবেশ। সাজগোজ করা মানুষগুলি সব ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। অধিকাংশই চেনা মুখ। কিন্তু অনেক অচেনা মুখও আজ দেখা যাচ্ছে। বড়দিনের উৎসব দেখার জন্য অনেকেই আজ এসে ভিড় করেছে পাদরিপাড়ায়।

ওদিকে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের মিষ্টির প্যাকেট দেওয়া হচ্ছে। গৌরী একবার শুধু দেখল। আশ্রমের সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ওখানে। কিন্তু গৌরীর ইচ্ছে হল না এগোয়। কেমন যেন আজ পাদরিপাড়ায় পরবাসী হয়ে গেছে গৌরী। বুকভরা অবসাদ। শত হোক এদের মাঝখান থেকে চলে যেতে সত্যি সত্যি কষ্ট হবে ওর। অথচ না গিয়েও উপায় নেই।

গৌরী দূর থেকেই লক্ষ্মণদাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, আমায় তুমি ডাকছিলে লক্ষ্মণদা ?

—ডাকছিলাম মানে! ক'বার চিন্ময়ীকে দিয়ে খবর পাঠালাম। সেই যে কুন্তিদির পাশে বসে রইলে আর উঠলেই না।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

লক্ষ্মণ কৌতুকে তাকাল। ঘুমিয়ে পড়েছিল! উপাসনায় বসে ঘুম!

—বিশ্বাস কর লক্ষ্মণদা। আজ আমার সত্যি মনটা খুব খারাপ লাগছে।

—কেন, কেন? চল, ওদিকে খামারের দিকে যাই। ওদিকে এখন কেউ নেই।

গৌরী চারপাশে একবার তাকাল, না থাক, শেষ পর্যন্ত কেউ-না-কেউ দেখে ফেলবে। চিন্ময়ীটা সারাক্ষণ আমাকে নজরে নজরে রেখেছে।

—ধুত্, কেউ দেখবে না, চল। কি হয়েছে তোমার শুনতেই হবে।

গৌরী বলল, কিছু না। আসলে এ সব ছেড়ে আজ চলে যাব, তাই।

লক্ষ্মণ বলল, ওদিকে চল না। এসব কথা এখানে নয়।

ওরা খামারের দিকে চলে এল। গোটা চারেক বিরাট বিরাট খড়ের গাদা। ধানের গোলা। তকতকে গোবর নিকানো উঠান। একপাশে গোটা চারেক কুল গাছ। একটা পাতকুয়ো। পাতকুয়োর বাঁধানো পাড়ে এসে দাঁড়াল লক্ষ্মণ, কি হয়েছে?

এভাবে এই নির্জনে আসায় গৌরীর কেমন ভয় ভয় শুরু হল। কেউ এলে কিন্তু আমাদের সন্দেহ করবে লক্ষ্মণদা।

—করলেই বা, আমাদের বয়ে গেছে। তোমার মন খারাপ কেন?

গৌরী চোখ নামিয়ে বলল, আজ চলে যাব বলেই বোধহয়।

—তাতে মন খারাপ হবে কেন? লক্ষ্মণ পাতকুয়োর বাঁধানো পাড়ে বসে পড়ল। গৌরীর হাত ধরে টানল, বস না।

গৌরী একটু গা বাঁচিয়ে বসল, এখানে কেমন যেন মায়ায় পড়ে গিয়েছি

লক্ষ্মণদা। হাজার হোক দুর্লভদা, কি ফাদার, কি কুন্তিদি এদের মতো লোক হয় না।

—তাহলে না গেলেই তো পারি। এখানেই আমরা থেকে যেতে পারি।

গৌরী লক্ষ্মণের দিকে তাকায়, তা হয় না লক্ষ্মণদা। মাকে একবার দেখা দিয়ে না হয় আবার চলে আসব। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে রাতে আমার ঘুম হয় না।

লক্ষ্মণ চুপ করে থাকে।

—আমি কিন্তু সন্ধ্যার সময় কুলতলির ঘাটে ঠিক অপেক্ষা করব।

লক্ষ্মণ এবারও কোনো কথা বলে না।

—তুমি কিন্তু একদম দেরি করবে না লক্ষ্মণদা। তোমাকে না পেলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।

লক্ষ্মণ বলল, আর একবার একটু ভেবে দেখলে হত না গৌরী, কাজটা কি আমরা ভাল করছি ?

—ভাল খারাপ আমার কিছুই ভাবার নেই লক্ষ্মণদা। তুমি যদি না আস, আমি একাই যে দিকে পথ পাব চলে যাব।

লক্ষ্মণ বলল, আমি যখন কথা দিয়েছি তখন ঠিকই থাকব। তবে—

শীতের রোদ এসে গায়ে বিছিয়ে পড়েছে গৌরীর। মিষ্টি একটা আমেজ। চার্চের দিক থেকে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের হৈ-হল্লোড় ভেসে আসছে। কেউ হুট করে এখানে চলে এলে, কি ভাববে কে জানে।

গৌরী বলল, চল আমরা ওদিকে যাই। কেউ যেন বুঝতে না পারে আমরা পাদরিপাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমাদের এখন একসঙ্গে না বসাই ভাল।

—আমি কিন্তু তোমার জন্য একটা উপহার এনেছিলাম গৌরী।

গৌরী কৌতুকে তাকায়, সেটা আবার কি জিনিস ?

—উপহার। বড়দিনের উপহার।

ছোট্ট একটা রঙিন কাগজে মোড়া প্যাকেট এগিয়ে ধরল লক্ষ্মণ।

—কি আছে এতে ?

—খুলেই দেখ না কি আছে।

গৌরী প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখল, না, থাক এখন নয়। রাতে নৌকোয় বসে খুলব।

লক্ষ্মণ বলল, খুব সামান্য জিনিস। আমার সাধ্যে যা কুলিয়েছে তাই।

—আমার কাছে কিন্তু এটা খুব দামী জিনিস। প্যাকেটটা মুঠোয় মধ্যে ধরে

রাখতে রাখতে গৌরীর মনে হল, খ্রীস্টানদের নিয়ম-কানুনগুলো কত ভাল। বড়দিনে এরকমভাবে উপহার পাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। ওদের গ্রামের লোকেরা এসব কথা ভাবতেই পারবে না। একমাত্র কালীপুজো, দুর্গাপুজোর সময়েই ওদের গাঁয়ে যা-কিছু ধুমধাম হয়। কালীপুজোর সময় বারোয়ারিতলায় যে বলি হয়, সেই বলির প্রসাদ নিয়ে কত মারামারি, ঝগড়াঝাঁটি। ওদের গাঁয়ের লোকগুলি কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

অথচ এখানকার মানুষগুলো সব অন্য ধাতুতে গড়া। কত ছিমছাম, শান্ত। কত বেশি বুকখোলা, উদার। এখানে কত সহজভাবে একজনের কাছে এগিয়ে আসতে পারে আর একজন। নিমাইয়ের কথা মনে পড়ল। কত গোপনে গোপনে নিমাইয়ের সঙ্গে ওর দেখা হত পদ্মপুকুরের ধারে। একজন কারো চোখে পড়ে গেলেই আর রক্ষা ছিল না।

হঠাৎই সারা গায়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল গৌরীর। শেষপর্যন্ত নিমাইদা ওকে কলকাতা দেখাবার নাম করে যেমনভাবে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল, লক্ষ্মণদাও সেরকম কিছু করবে না তো। কার মনে কি আছে, কে বলবে।

—কি হল? কি ভাবছ?

—চমক ভাঙল গৌরীর। কিছু না। চল ওদিকে যাই।

—আমায় কিছু দেবে না?

—কি?

—উপহার।

—ওমা, আমি কি দেব!

লক্ষ্মণ হাসে, বড়দিনে কিন্তু আপনজনকে কিছু-না-কিছু দিতেই হয়। আর দেবার ইচ্ছে থাকলে দেওয়াও যায়।

গৌরী অসহায় বোধ করে। সত্যি সত্যি কিছুই দেওয়ার নেই ওর।

—তাছাড়া যে হাত পেতে নেয়, তাকে হাত খুলে কিছু না দিলে দোষ হয়।

গৌরী স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে আবেগে বলল, ঠিক আছে, দেব। দিন তো আর ফুরিয়ে যায়নি। দেব।

—দাও। হাত পাতে লক্ষ্মণ।

—এখন নয়। পরে।

—পরে কখন?

গৌরী বলল, দেব তো বললাম। রাতে নৌকোতে না হয় নিয়ে যাব।

লক্ষ্মণ বলল, ঠিক আছে, নৌকোতেই।

তারপর ওরা খামারের পাশ থেকে বেরিয়ে আবার চার্চের দিকে এগিয়ে এল।

আজ বড়দিন। উৎসবের দিন। খুশীর দিন। সারাদিন আজ আনন্দ গান হাসি-হল্লোড়ের দিন। সারাদিন আজ কত কাজ। সেই ভোর রাতে উঠে ক্যারল গাইতে বেরিয়েছিল সবাই। সকালবেলাটা কাটল চার্চে। দুপুরে পাদরিপাড়ার বাইরে আশ্রমবাসীরা নাম প্রচারে বেরুবে। সঙ্গে থাকবে কের্তনের দল। যীশু-নাম গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়াতে হবে গ্রামের পর গ্রাম। আশ্রমের বাইরের লোকেরাও নামপ্রচারে সঙ্গে থাকবে। ফাদার এই নাম প্রচারের ভূমিকাটাকে গুরুত্ব দেন। সাবধান, বাইরের লোকের সঙ্গে যেন একটুকু খারাপ ব্যবহার করে না কেউ। মনে রাখতে হবে, আমরা সেবক, আমরা মানুষের সেবা করার জন্য পৃথিবীতে জন্মেছি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অন্ধকার সমুদ্রে এখনো হাবুডুবু খেয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের সামনে আলো তুলে ধরাই হবে আমাদের কাজ। আমরা আজ জনে জনে যীশুর পবিত্র কথামৃত শোনাব। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবাইকে আজ আমরা ভালবাসব। আদর করে আজ কাছে টেনে নেব সবাইকে।

দুপুরের পর গৌরীও এই প্রচারের দলে বেরিয়ে পড়ল। আশ্রমের ছোট ছোট মেয়েদের পরনে নীল রঙের ফ্রক, মাথায় নীল রিবন। ছেলেদের হালকা নীল প্যান্ট নীল শার্ট। বড়রা নীলপেড়ে শাড়ি পরেছে। একসঙ্গে একই পোশাকের ছেলে-মেয়েদের দেখতে বেশ সুন্দর লাগে।

ফাদার কয়েকজনের হাতে গোছা গোছা বই তুলে দিয়েছিলেন, চটি চটি বই। কিন্তু যারা পড়তে জানে না, তাদের জন্য যীশুর ছবি নেওয়া হল সঙ্গে করে। এক পিঠে ছাপা সুন্দর যীশু মূর্তি, যীশুর ক্রুশবিদ্ধ দেহ, মাথার পেছনে দীপ্তিমান সূর্য, পায়ের নিচে রুক্ষ পৃথিবী। যীশুর এই ছবির দিকে তাকালেই শ্রদ্ধায় চোখ নত হয়ে আসে।

ছবিগুলো, বইগুলো লোক দেখে দেখে ছড়িয়ে দেওয়া হল নগর পরিক্রমার সময়। কেউ কেউ আগ্রহ দেখিয়ে হাত পেতে নিয়ে গেল ছবি, বই। কেউ আবার কাছে এগোতেই সাহস পায় না। কি জানি, ঐ খ্রীস্টানদের বই হাতে ধরলেই জাত যাবে কিনা।

গৌরী শান্তভাবে দলটার সঙ্গে ঘুরল। কখনো গলা মিলিয়ে গান গাইল ওদের সঙ্গে। আবার কখনো কেমন উন্মনা।

যখন দলের সঙ্গে ফিরে এল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। সন্ধ্যার পর ছুর্লভদার বাড়ি গিয়ে নতুন চালের পিঠে খাওয়ার কথা ছিল ওর। কিন্তু এই সন্ধ্যায় কুন্তিদির হাতে পড়লে আর বেরুনোই সম্ভব হবে না। গৌরী আর অপেক্ষা করল না। ধীরে ধীরে পুকুরঘাটে এল। হাত মুখ ধুল। না, কেউ নেই। এখান থেকে অনায়াসেই ও মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করতে পারে। চারপাশে তাকালো গৌরী। তারপর আচ্ছন্নের মতো মাঠের ভিতর দিয়েই হাঁটতে শুরু করল। এক ঝলক শীতের বাতাস এসে ওর মুখে ঝাপটা মারল।

আঠার

বুড়ো বাসুকির বয়স গোনাগুনতি নেই। সাত বুড়োর এক বুড়ো এই নদী। তবে নামটায় বেশ চমক আছে। আর নদীর ধারে একা একা এসে বসলে আর রক্ষে নেই, হিজিবিজি হাজার ধরনের চিন্তা এসে মাথায় ভর করে। যেমন এই মুহূর্তে একগাদা আজেবাজে ভাবনা এসে রজনীকে আঁকড়ে ধরেছিল।

এখন অবসন্ন বিকেল। অলসভাবে হাঁটতে হাঁটতে রজনী ভেড়ির ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল। বনের দিক থেকে কাঠুরেরা হৈহৈ করে কাছারিবাড়ির দিকে ফিরতে শুরু করেছে। শুকদেবের মাতলামি করা গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। সন্ধ্যা নামতে-না নামতেই গাঁজার কলকে নিয়ে বসে পড়বে শুকদেব। পৃথিবী রসাতলে যাক, গাঁজা যতদিন আছে ততদিন ওর ভাবনা নেই।

ঐভাবে 'কুছপরোয়া নেই' ভঙ্গি করে কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচা যেত কিন্তু রজনীর তা উপায় নেই। দিন কয়েক হল ছোটকর্তা বজরা ভাসিয়ে কলকাতার পথে পাড়ি দিয়েছেন। রজনী এখন যেন একা। এত বড় একটা দায়িত্বের ভার নিজের কাঁধে ও তুলে নিয়ে ভাল করেছে না খারাপ করেছে বুঝতে পারে না। নিজের ওপর যেন আস্থা রাখতে পারছিল না ও। আগের বার দয়াল ঘোষ যে দক্ষতায় দশজনের মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ আদায় করে নিতেন, রজনীর দ্বারা যেন তেমনটি হয়ে উঠছে না। কোথায় যেন একটা ফাঁকি থেকে যাচ্ছে ওর কাজের মধ্যে। সারাক্ষণ মনে হয়, ওর বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়নি তার বিশ্বাস কি! হয়তো এখন টের পাচ্ছে না রজনী, যখন টের পাবে তখন আর সামলে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। নাহ্, আর একটু সতর্ক হয়েই চলতে হবে ওকে।

অহেতুক কিছুটা উত্তেজিতই হয়ে পড়েছিল রজনী। হাত পা নেড়ে উত্তেজনায় বারকয়েক এপাশ ওপাশ পায়চারি করে নিল ভেড়ির ওপর। নদীতে এখন মধ্য জোয়ার। চন্দনের মতো কাদার লেই জমে আছে নদীর ঢালে। লাল কাঁকড়ার খেলা দেখতে দেখতে আবার একটু তন্ময় হয়ে পড়েছিল ও।

গতকালের ঘটনা ওর মনে পড়ল। তিন দিন হৃহু করে জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ হয়েছে। মনে হয়েছে সবাই যেন নিজের গরজেই কাজে নেমে পড়েছে। কারো পেছনেই লেগে থাকার প্রয়োজন হয়নি রজনীর। কিন্তু হঠাৎ গতকাল বিকেলে মকবুল একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসল। একটা ভারি গাছের ঝাপটা খেয়ে উল্টে পড়ল মকবুল। নিশিকান্তটা অল্পের জন্য বেঁচে গেল। মকবুলের ঝাপটা লাগল কোমরে। হাড় ভেঙেছে কিনা কে জানে!

মকবুলের এই চোট খাওয়া নিয়ে গতকাল রাতে বেশ ধকল পোহাতে হয়েছে রজনীকে। বেঁটে চৈতন্য অবধি ফণা তুলে ফোঁস করে তেড়ে এসেছিল। সবারই অভিযোগ বনদেবীর পুজো হল না কেন? যতদিন পুজো দিয়ে বনদেবীকে তুষ্ট করা না হচ্ছে, ততদিন এ ধরনের বিপদ-আপদ তো থাকবেই। ওদের আক্রমণ থেকে রজনী বুঝতে পারছিল, অভিযোগটা কেবল ওদের দু-একজনেরই নয়, মুখে প্রকাশ না করলেও এর পেছনে সায় আছে প্রায় সকলেরই। হয়তো এমনও ভাবছে ওরা, পুজো করার নাম করে রজনী ছোটকর্তার কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা হাতড়ে রেখেছে, পুজো না দিতে হলে পুরো টাকাটাই রজনী হজম করে ফেলতে পারে।

অভিযোগটা বড় মারাত্মক। তবু নিজেকে সংযত রেখেছিল রজনী। বলেছিল, বনদেবীর পুজো হবে না, এমন কথা কি আমি বলছি কখনো?

—বলনি ঠিক, তবে তার আয়োজনও করার কোনো নাম নেই তোমার।

—আয়োজন করার কি আছে। সবাই মিলে ঠিকঠাক করে আমাকে জানাও। যেদিন ঠিক হবে, সে দিনই লাগিয়ে দেব। আর এ ব্যাপারে ছোটকর্তাকেও খবর পাঠানো দরকার হবে। তা না হয়, আমি কালই যে নৌকো ছাড়বে তাতেই খবর পাঠিয়ে দেব।

—আগামী পূর্ণিমাতেই হোক। নিশিকান্তই যেন একটা দিন ঠিক করে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

মকবুল কম্বল জড়িয়ে শুয়েছিল। কোমরে টনটনে ব্যথা। পাশ ফিরলে হাড়ে হাড়ে বিদ্যুৎ খেলে। বনদেবীকে খুশী করে কাজে নামলে হয়তো এসব ঝামেলা হত না।

মকবুল এমনভাবে বলল যেন বনদেবী মুসলমানদেরও আরাধ্য দেবী।

রজনী বলল, বেশ, আগামী পূর্ণিমাতেই পুজো হবে। তবে আজ কি তিথি? পূর্ণিমা বলতে কবে?

সব তারিখের হিসেব রাখার প্রয়োজন পড়ে না। আকাশের চাঁদ দেখে হয়তো কিছুটা অনুমান করা যাবে। তবে নির্দিষ্ট করে তারিখটা বোঝা দরকার।

নিশিকান্ত বলল, পুজো করবো বললেই পুজো হয় না। আগে বিধিবিধান জানতে হবে। পুরুত যোগাড় করতে হবে। ঝামেলা তো কম নয় রজনীভাই।

—বেশ তো, ধারেকাছে যেসব আবাদ আছে সেখান থেকে পুরুত ধরে নিয়ে আয়। পুরুতঠাকুর যেভাবে বলবে সেভাবেই সব হবে।

—শুধু পুরুত আনলে চলবে না, বাজনা আনতে হবে। বেঁটে চৈতন্য তার চেরা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঢাক বাজাবার চেষ্টা করে।

—আশেপাশের আবাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করা হবে, সেই রকমই কথা হয়েছিল। সারাদিন ধরে খানাপিনা, নাচ-গান, ফুর্তিফার্তা।

—যেমন বুদ্ধি, খেয়েদেয়ে কাজ নেই, লোকে তোদের এই পুজো দেখতে আসবে। আসা মানেই নৌকো ভাড়া, পয়সা খরচ।

—বাইরে থেকে যারা আসবে, তাদের আমরা বিনি পয়সায় খাওয়াব। তারা আমাদের অতিথি।

রজনী কেবল শুনছিল। এরা তো বলে খালাস, হাজার হাজার লোক এসে হাজির হলে খরচটা একমাত্র রজনীই টের পাবে। আর খরচের হিসাব ছোট-কর্তাকে দিতে হবে ওকেই।

ফলে রজনী হালকা চালে বলল, ঢাকের দায়ে মনসা বিকোতে চাস তোরা?

—কেন, মনসা বিকোবে কেন? ছোটকর্তার কাছ থেকে টাকা নাওনি তুমি?

রজনীর মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠল, নিয়েছি কি নিইনি তোকে বলতে হবে?

নিশিকান্ত চুপ করে গেল।

চৈতন্য বলল, নিয়ে না থাকলে, চেয়ে পাঠাও।

অনেকটা যেন আদেশের ভঙ্গিতেই বলল চৈতন্য। দয়াল ঘোষের আমলে এভাবে কেউ কথা বলত না। দয়াল ঘোষ চাবুক চালিয়ে এসব কথার জবাব দিতেন। কিন্তু রজনী কোনোদিনই দয়াল ঘোষ হয়ে উঠতে পারবে না। কিছুক্ষণ থমকে থাকার পর রজনী গম্ভীরভাবে বলল, কি করব না করব সেটা আমি বুঝব। পুরুতের খোঁজে কে কে যাবি আগে সেটা বল।

নিশিকান্ত রাজি হয়ে গেল। চৈতন্য বলল, আমিও যাব নিশির সঙ্গে। তবে আশেপাশের আবাদ নয়, একেবারে কলকাতা থেকে পুরুত ধরে নিয়ে আসব।

—বেশ। রজনী রাজি! কালই তোরা চলে যা। কাল আমাদের কাঠের নৌকো ছাড়বে তাতেই তোরা চলে যা। ও নৌকো যখন ফিরবে তাতেই আবার চলে আসিস।

রজনী এরপর জটলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কাছারির বারান্দায় পায়চারি করেছিল কিছুক্ষণ। একা একা। তারপর ঘরে ঢুকলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

মেজাজটাই কেমন খারাপ হয়ে আছে সেই থেকে। বনদেবীর পুজো দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ ওর কারো চেয়েই কম নয়। অথচ পাকচক্রে এমন একটা ঘটনা ঘটল যেন রজনীই বাদ সাধছে তাতে।

নদীর ওপর পাতলা কুয়াশা ধোঁয়ার আকারে গড়াতে শুরু করেছে বোধহয়। রজনী লক্ষ্য করল, ধোঁয়া না, যেন পাতলা একখণ্ড মেঘ নেমে এসেছে নদীর ওপর। ওপারে বনের মাথায় পাখি উড়ছে। এপারে এখনো কাদার ধারে মাঝে মাঝে শামুকখোল এসে বসছে। কত নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে পাখিগুলোকে।

হাত পঞ্চাশেক দূরে হাজারমনী কাঠ বোঝাই নৌকোটা নোঙর করা। কাঠের সিঁড়ি পাতা রয়েছে নৌকার সঙ্গে। সম্পূর্ণভাবে জোয়ার না এলে ছাড়া যাবে না। মাঝি মাল্লাদের কয়েকজনকে দেখা গেল নৌকো গোছগাছে ব্যস্ত।

নিশিকান্তকেও একবার নৌকোর ওপর দেখা গেল। রজনী চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নদীর দিকে তাকাল। বহুদূর দিয়ে নদীতে কি যেন একটা বস্তু ভেসে যাচ্ছে। কি ওটা। ঠিক চিনতে পারল না রজনী। বস্তুটার ওপর বসে দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে একজোড়া শকুন। নির্ঘাত কোনো মড়াটড়া হবে। কি মড়া!

এসব নদীতে মড়া ভেসে যাওয়ায় কোনো বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু ওটা মানুষ কিনা বুঝবার জন্য ও নিশির দিকে তাকাল। দেখল, নিশি নৌকো থেকে জেটির ওপর নামছে।

রজনী হাত তুলে নিশিকান্তকে ডাকল, আঙুল তুলে নদীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কি যাচ্ছে বুঝতে পারছিস?

নিশিকান্ত এগিয়ে আসে রজনীর কাছে, কি গো?

—মড়া যাচ্ছে।

—মড়া তো যাচ্ছেই, নইলে শকুন বসবে কেন? কিন্তু কি মড়া?

—বেশ বড়সড় চেহারা মনে হচ্ছে। কিন্তু চেনা যাচ্ছে না। শকুনদুটোকে ঢিল মেরে উড়িয়ে দিলে বোঝা যেত।

সঙ্গে সঙ্গে নিশিকান্ত একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিল। ওদিক থেকে বেঁটে চৈতন্য তখন ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে, কি গো রজনীভাই? কি হয়েছে?

নিশিকান্ত ঢিলটাকে প্রাণপণ জোরে ছুঁড়ে মারল। কিন্তু বেশিদূর এগোল না। সামান্য কিছু দূরে গিয়েই ঝুপ করে জলে পড়ল।

—আমার তো মনে হচ্ছে মানুষ।

হতেও পারে মানুষ, অসম্ভব নয়। অবিশ্বাস করে না রজনী। বুড়োবাসুকির বুকের ওপর দিয়ে দুটো একটা মানুষের মৃতদেহ ভেসে আসবে এ আর বেশি কি! কে জানে কোন হতভাগা ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে।

দেহটা নদীর মাঝামাঝি দিয়ে চলেছে বলে ভাল করে বোঝার উপায় নেই। অথচ মানুষ কিনা বোঝবার জন্য বেশ উত্তেজনা বোধ করল ওরা।

এমন সময় আরো দু-একজন এসে ওদের পাশটিতে ভিড়ে গেছে। রজনী একবার মুখগুলি দেখে নেয়। রসিকলাল, শুকদেব। শুকদেবের চোখদুটো টকটকে লাল, এরই মধ্যে গাঁজা টেনে এসেছে কিনা কে জানে!

নিশি বলল, মড়া দেখা একদিক থেকে ভাল। মড়া দেখলে দিন ভাল যায়।

রসিক বলল, শকুনদুটো ছাড়া আর কিছুই কিন্তু ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। ভাল করে না দেখতে পেলে লাভ নেই।

শুকদেব মজা করার জন্য হাত তুলে মড়াটাকে যেন কাছে ডাকছে এমনি ভঙ্গি করে। এই মড়া, কাছে আয় না। তোকে একবার দেখি।

—আর দেখতে হবে না গাঁজাখোর। পালা এখান থেকে। নিশি ওকে তাড়া লাগায়।

—এ শালা সত্যি একটা জানোয়ার। রজনীও তাড়া লাগায় শুকদেবকে।

চৈতন্য বলল, মড়ার পিঠটাকে শকুনে খুঁটছে রে। হুস, হুস।

দৃশ্যটা খুবই খারাপ লাগতে থাকে। শকুনদুটো এমন দূরত্বে রয়েছে যে ওদের তাড়াবার উপায় নেই। সারা গায়ে শিরশির করে একটা ঝাঁকি খেয়ে গেল রজনীর।

শুকদেব হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ও রজনীভাই, আমি চিনেছি।

সবাই ঘুরে তাকায়, কি চিনেছিস?

—ঠিক চিনে ফেলেছি বেটাকে। ভেবেছিল আমার চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে। আমরা কিছুই বুঝতে পারব না।

—তুই থামবি? আবার ওকে ধমক লাগায় রজনী।

কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না শুকদেব, থামব কেন? যা সত্যি তা শুনতে বুঝি ভয় করে?

—কি সত্যি? কি বলতে চাস তুই?

—বলতে চাইছি, ও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল, আমি ধরে ফেলেছি।

—কি ধরে ফেলেছিস? খুলে বল না? নিশিকান্ত প্রশ্ন করে।

—কে যে ওকে ওভাবে মেরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে আমার কাছে এখন তা পরিষ্কার।

সবাই চুপ করে আরো কিছু শুনবার জন্য অপেক্ষা করে, শুকদেব বলে, এই জঙ্গলই ওকে দাঁত বসিয়ে খতম করে ভাসিয়ে দিয়েছে।

—তুই পালাবি এখান থেকে। রজনী এবার মাটির একটা ঢেলা ছুঁড়ে মারে ওর দিকে।

শুকদেব হা হা করে হাসতে হাসতে ঢিলটাকে লুফে নেয়। বিশ্বাস করলে না তো? এখনও আমি বলব এই জঙ্গল বদলা নিয়েছে গো। জঙ্গলের কীর্তি তো আর জান না, টেরটি পাবে একদিন।

মৃতদেহটা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। জোয়ারের টানে সাঁ সাঁ করে ভেসে চলেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটা দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে যাবে। চুম্বকের মতো চোখটাকে ওর দিকেই পেতে রাখে রজনী।

শুকদেব আবার চেঁচায়। চেঁচিয়ে যেন মড়াটাকেই শোনাবার চেষ্টা করে, কুছপরোয়া নেই, আমরাও একদিন জঙ্গলের বিষদাঁত তুলে ডুগডুগি বাজাব দেখে নিস।

শুকদেবকে আর বাধা দেয় না কেউ। ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। পাগলে কি না বলে! মড়াটা ক্রমশ উত্তরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ছুটে যেতে যেতে একদিন হয়তো ও কলকাতাতেই পৌঁছে যাবে।

আরো উত্তরে হঠাৎ চোখ আটকে গেল রজনীর। চমকে উঠল, ওটা কি রে? নৌকো না? ঐ দেখ, একটা নৌকো আসছে। এত দূর থেকে ছোট্ট একটা জেলে ডিঙির মতো দেখাচ্ছে।

সবাই চোখ পাতে। সত্যি সত্যি উল্টোটানে একটা নৌকো এগোচ্ছে। যত এগোচ্ছে তার চেয়ে যেন বেশি পিছিয়েই যাচ্ছে। উল্টোটানে নৌকো এগোনো যে কী কষ্টকর তা যারা চালায় তারাই বোঝে।

—কিন্তু কোথাকার নৌকো ওটা। কারা আছে ঐ নৌকোয়। যেই থাক, যারাই থাক, বাইরের জগতের লোক বলে বেশ ভালই লাগল রজনীর। কাছাকাছি যখন এগোবে, তখন ওদের ডেকে আরো কাছে আসতে বলব। কিছুক্ষণ তবু বাইরের জগতের দুটো-চারটে খবর শোনা যাবে।

মৃতদেহটা চোখের বাইরে হারিয়ে যেতে লাগল। এখন নৌকোটাই সবার দৃষ্টি টেনে নিয়েছে।

চৈতন্য বলল, এমন উজানে কেউ নৌকো টানে! পথটথ ভুল করে বসেছে বোধহয়। শুকদেব চুপ করে থাকার লোক নয়। বলল, আসলে আমাদের দিকেই আসছে গো, দলে ভারি হতে চায়।

—এবার যদি চুপ না করিস শুকদেব, তোকে কিন্তু জলে চুবিয়ে তুলব।

—আই বাপ! কী এমন দোষের কথা বলেছি?

—কোনো কথাই তোকে বলতে হবে না। যা না, তোর গাঁজা টানার সময় হয়নি?

নৌকোটাকে বেশ কসরত করে এগোতে হচ্ছিল। নদীর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে এগোচ্ছে ও।

রজনী হঠাৎ অবাক হয়ে গেল, একজন মেয়েমানুষও আছে নৌকোয়। মনে হল, ছইয়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশে যে মাঝি, তার দম ফেলার অবসর নেই। নৌকোটা ঢেউয়ের আঘাতে দোল খাচ্ছে বলে মাঝিকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মেয়েমানুষটাকে দিব্যি দেখা যাচ্ছে।

শুকদেব ভেড়ি ধরে উত্তরে কিছুটা এগিয়ে গেল, পারলে যেন জলে নেমে নৌকোর মাঝিকে কিছুটা সাহায্য করে।

রজনীর এসব বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না। আগে সবিশেষ জেনে না নিয়ে ওরকম এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কত রকম অভিসন্ধি থাকতে পারে মানুষের কে জানে।

ততক্ষণে মৃতদেহটা পুরোপুরি দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেছে। রজনী আর একবার মৃতদেহটাকে খুঁজল, পেল না। নৌকোটাও অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। একেবারে জল আর ডাঙার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোচ্ছে নৌকোটা।

রজনী উঠে দাঁড়াল। নৌকোর মাঝি আরো খানিকটা এগিয়ে গেরাফি ছুঁড়ে দিল কাদায়। নৌকোর নিচে জলের টান বেশ প্রখর। নৌকোটাকে সামলাতে বেশ একটু বেগ পেতে হল।

রজনীই শুধোল, কোথাকার নৌকো?

মাঝি ছইয়ের ভিতর দিয়ে গলিয়ে এ পাশে এসে মেয়েমানুষটার পাশে দাঁড়াল। আজ্ঞে, আমরা ঘোষবন থেকে আসছি। ঘোষবনের পাদরিপাড়া। এটাই কি চৌধুরীর আবাদ?

রঞ্জনী মাথা নাড়ে, হ্যাঁ এটাই। চৌধুরী নরেন্দ্রনারায়ণের আবাদ। কিছু দিন হল বন সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

মেয়েমানুষটা জমিদার বাড়ির পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। দু' চোখ ভরা অপার বিস্ময়। যেন এরকম একটা জায়গার সঙ্গে ওর বিশেষ কোনো স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অথচ এটাই ঠিক সেই জায়গা কিনা নিঃসন্দেহ হতে পারছে না ও।

মাঝি মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল, চোখে চোখে কি যেন কথা হল ওদের।

রঞ্জনী চোখ ফেরাতে পারছিল না মেয়েটার দিক থেকে। কেমন যেন ধাঁধায় ফেলেছে এই মুখ। এত চেনা চেনা লাগছে, অথচ—

মুখের ঐ শীলকোটা দাগগুলোর জন্যই কি এরকম মনে হচ্ছে ওর! তবে কি অপদেবীর বেশ ধরে ভাসতে ভাসতে যে মেয়েটা এখানে এসে সর্বনাশ করে গিয়েছিল, এ মেয়েটা কি সেই! ধারেকাছে তখন ঈশান বা মকবুল ছিল না। ওরা থাকলে হয়তো ঠিক চিনতে পারত ওকে।

—তা কোথায় যাওয়া হবে?

মাঝি গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বলল, বিদ্যাপুরী নামে একটা গ্রাম আছে, সেখানে যাব বলে বেরিয়েছি। আপনারা কেউ চেনেন?

—বিদ্যাপুরী! সে কোথায়? না বাপু চিনতে পারছি না।

রঞ্জনী নিশিকান্তর দিকে তাকায়।

নিশি বলল, ওরকম নাম প্রথম শুনছি।

—কোন মৌজা বলতে পারেন? রসিকলাল শুধায়।

মৌজার নাম বলল লোকটা।

মেয়েটা কোনো কথা বলছিল না। কেবল দু' চোখে আকুতি ছড়িয়ে ও তাকিয়ে আছে। অমনভাবে ও তাকিয়ে আছে কেন, কে জানে!

নাহ্, কেউ চিনতে পারল না। ঠিক বিদ্যাপুরীই নাম তো? না অন্য কিছু? নাকি আর কিছু গুলিয়ে ফেলছে হে?

রজনী শুধাল, আপনারা ঘোষবন থেকে আসছেন, ঘোষবন তো এক ভাঁটিরও পথ নয় বলে শুনেছি, কাছেই!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাছেই।

—তা, কি করা হয় ওখানে ?

মাঝি মেয়েটার মুখের দিকে একবার তাকাল। তারপর নৌকোর গলুইয়ের কাছে বৈঠায় ভর রেখে দাঁড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আমরা খ্রীস্টান, লোমাই কাত্তিক।

—পাদরিপাড়ার লোক যখন, তখন তো বুঝতেই পারছি, খ্রীস্টান। কিন্তু লোমাই কাত্তিক কি ?

মাঝি কিছু বলবার আগেই মেয়েটা বলে ওঠে, রোমান ক্যাথলিক গো। নাম শোনেননি আপনারা ?

রজনী লোমাই কাত্তিকও বুঝল না রোমান ক্যাথলিকও না। কিন্তু মেয়েটার এই মুখই কি সেই মুখ। সেই ডাইনীর বেশধারী মেয়েটাই কি আবার এসে হাজির হল।

ঈশাণকে কাছে পেলেই বোঝা যেত।

—ঈশান, সে তো জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল দেখেছিলাম। নিশি বলল।

—ফিরেছে কিনা দেখ না ?

নিশিকান্ত এমন একটা লোভনীয় দৃশ্যের কাছ থেকে সরে যেতে চাইছিল না। কিন্তু প্রয়োজনটা বেশ জরুরী মনে করেই ও ভেড়ি থেকে নেমে কাছারি-বাড়ির দিকে এগোতে শুরু করল।

রজনী শুধাল, বিদ্যাপুরী খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন ? কি আছে ওখানে ?

মাঝি একটু ইতস্তত করে, আসলে ইয়ে, আমরা একটা বিপদে পড়ে গেছি। আপনারা যদি সাহায্য করতে রাজি থাকেন তো খুলে বলি।

রজনী তাকিয়ে থাকে, কি সাহায্য রে বাবা। শেষটায় আমাদের সঙ্গেই ভিড়তে চাইবে না তো আবার। কিন্তু গলা নরম করে বলল, কি করতে হবে শুনি ?

মাঝি বলল, বিপদ বলতে এই মেয়েটাকে দেখছেন, একে নিয়েই বিপদ। পাদরিপাড়ার আশ্রমে থাকে, দেশবাড়িতে মায়ের কাছে যাবে। কিন্তু পথটথ আমরা কিছুই চিনি না।

শুকদেব বলল, মায়ের কাছে মানে ঐ বিদ্যাপুরীতে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মা থাকে বিদ্যাপুরীতে, আর মেয়ে থাকে পাদরিপাড়ায়, কেমন একটু গোলমেলে শোনাচ্ছে না ?

মেয়েটাও গলুইয়ের কাছে এগিয়ে এসেছিল, আজ্ঞে আমি বিদ্যাপুরীতেই থাকতাম। আমার কপালের দোষ মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছি।

রজনী শুধাল, মাঝি তোমার কে হয় ?

—আজ্ঞে আমরা দুজনেই পাদরিপাড়ায় আশ্রমে থাকি। পাদরিপাড়া থেকে আমরা পালিয়ে এসেছি।

—কেন, পালালে কেন?

—না পালালে ওরা আমাকে বিদ্যাপুরী কোনো দিন যেতে দিত না।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটা একবার বুঝে নেবার চেষ্টা করে রজনী। কেমন যেন এলোমেলো মনে হচ্ছে সব।

রজনী চুপ করে আছে দেখে মেয়েটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কিষাণ নামে কেউ কি এখানে থাকে?

কিষাণ! রজনী চমকে উঠল। ঈশানের নামই কি ও ভুল শুনল! আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার কারণ নেই, সেই মেয়েটাই। পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমারই কি তা হলে মায়ের দয়া হয়েছিল?

মাঝি বলল, আজ্ঞে হঁ্যা। বাঁচবে বলে আশা ছিল না।

—একা একা ভাসতে ভাসতে এই ঘাটে একদিন তাহলে তুমিই এসেছিল?

মেয়েটা শুকনো মুখে ধীরে ধীরে বলল, কোন ঘাট জানি না, জঙ্গলের ধারে একটানা দু-তিন দিন পড়েছিলাম। ভগবান যীশু আমায় বাঁচিয়েছেন।

রজনীর চোখেমুখে কালো ছায়া নেমে এল, তাহলে মরতে আবার এখানে এলে কেন? বেশ তো যীশুর কাছে ছিলে!

মাঝি রজনীর ভঙ্গি দেখে কেমন হকচকিয়ে গেল।

গৌরী বলল, থাকব বলে আসিনি। সেই লোকটাকে একবার একটু চোখ ভরে দেখব গো। কিষাণ না ঈশান কি নাম যেন, সে থাকে এখানে?

রজনী বলল, না, দেখা হবে না। তোমরা এখন যেতে পার। বলেই ও মুখ ঘুরিয়ে নিল।

পাতলা কুয়াশা এখন নদীর অনেকখানি আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। জঙ্গলের ও পিঠে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে সূর্য। অন্ধকার নামতে আর দু-এক দণ্ড যা সময়। এই অসময়ে এই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হল, না জানি কি আছে আবার কপালে! হঠাৎ শুকদেবের দিকে তাকিয়ে একটা ধমক লাগাল, তোরা হাঁ করে দেখছিস কি শুনি? রাত হয়ে আসছে না? কাজ নেই তোদের?

শুকদেব ধমকের গুরুত্বটা বোধহয় বুঝতে পারল না। বলল, তুমি যাও না বাপু। আমরা বসে গল্পসল্প করি। বিদেশী মানুষ বড় একটা কেউ তো আসে না।

রাগে রজনীর হিংস্র দাঁতগুলো যেন বেরিয়ে আসছিল, কিছু একটা বলার জন্য

ও ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, ওদিকে কাছারিবাড়ির দিক থেকে আরো অনেকেই এদিকে ছুটে আসছে।

খবরটা সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে যাওয়ার কথা। নতুন লোক এসেছে ঘাটে, যাও দেখে এসো গে, সঙ্গে ডাঁটো একটা মেয়েমানুষ আছে।

পড়ি-মড়ি করে সবাই তাই ঘাটের দিকেই ছুটতে শুরু করেছিল। রজনী চিৎকার করে সবাইকে থামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। রজনীকে কেউ কোনো গ্রাহ্যই করল না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে রজনী কাছারির দিকে সরে এল।

মকবুলও চোট খাওয়া কোমর নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছে, কি হয়েছে? কি হয়েছে ওখানে?

রজনী অসহায়ভাবে মকবুলের কাছে ছুটে আসে, সর্বনাশ হয়েছে মকবুল, আবার এসে হাজির হয়েছে।

—কে? কে হাজির হয়েছে? কিছুই বুঝতে পারছিল না মকবুল।

—কে আবার। শোননি, সেই অপদেবীটা ভেসে এসে ঈশানের খোঁজ-খবর শুরু করে দিয়েছে।

মকবুলের বিস্ময় চরমে উঠল, সেই অপদেবী মানে? কি হয়েছে বল না?

রজনী আবার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল, সেবার সেই মায়ের দয়ার রূপ ধরে এয়েছিল মনে নেই? যাকে নিয়ে অতসব কাণ্ড হল। সেই মেয়েটা।

—কোত্থেকে এল? মরে যায়নি?

—মরবে কি। ওকি মরার জিনিস। সবটাই ছিল ওর ছদ্মবেশ। যা না, জিজ্ঞেস করে বাজিয়ে আয় না।

মকবুল বাঁশের খুঁটি ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। মেয়েটা যদি সত্যি সত্যি এসে থাকে, যদি সেই মেয়েটাই হয়, তা হলে এবার মকবুলের আর রেহাই নেই। মকবুল আর জগন্নাথই রাতের অন্ধকারে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে নৌকোটা আবার জলে ঠেলে দিয়েছিল। মেয়েটা কি তারই প্রতিশোধ নিতে এসেছে!

রজনী বলল, মেয়েটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চিনেছি। সেই মুখে এখনো দয়ার দাগগুলো মিলিয়ে যায়নি! দেখলেই গা শিরশির করে ওঠে। তুই বল মকবুল ও যদি মানুষই হবে, এমন দয়ার পরও কেউ বেঁচে থাকতে পারে?

মকবুল কথা খুঁজে পায় না। কোমরের যা অবস্থা, তাতে এগিয়ে গিয়ে যে দেখে আসবে তেমন উপায়ও নেই। শুধাল, কি বলতে চাইছে মেয়েটা?

—কি আবার। খোঁজ শুরু করে দিয়েছে ঈশানের।

—খোঁজ করছে কেন?

—কেন তা ওই জানে।

মকবুল আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, একা এসেছে?

—একা নয়, সঙ্গে এবার একটা লোক আছে। লোকটারও ভাবগতিক আমার খুব ভাল লাগল না।

—ঈশানের খোঁজ করছে কেন? কি বলছে?

—ঈশানের সঙ্গেই তো ওর পিরিত জমেছিল, মনে নেই? সারারাত মেয়েটার সঙ্গে নৌকোয় কাটানো। সেখান থেকে রোগ তুলে এনে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

—তা, ঈশান নেই ওখানে?

—ঈশান থাকলে কি আর আমি ছটফট করি। স্রেফ বলতাম, তুই মেয়েটার সঙ্গে যেখানে যেতে চাস যা আমরা বাঁচি। আবার আমাদের মারিস না ঈশান।

—ঈশান কোথায়? ও এবার আগেভাগেই ভয়ে গা ঢাকা দিল না তো?

রজনী বলল, ব্যাটা খুব লায়েক হয়ে গেছে। দুপুরে আমার বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে, তারপর থেকে আর পাত্তা নেই।

—ঈশান জঙ্গলে ঢুকেছে! একা একা! মকবুল কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে। কোনো বিপদ-টিপদ ঘটেনি তো? খোঁজ করেছ তোমরা?

—কোথায় খোঁজ করব শুনি? রজনীর বিরক্তি এবার চরমে উঠল, কেউ কারো কথা শোনে! মরবার পাখা গজালে আমি কি করতে পারি।

মকবুল ভেড়ির দিকে তাকায়। ওর নড়বার ক্ষমতা নেই। থাকলে ঐ লোকগুলির মতো মকবুলও এখন ভেড়ির দিকে ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসত। কাছারিবাড়িটা ফাঁকা। সবাই ওদিকেই ছুটে গেছে।

—কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একটু জঙ্গলের ধারে খুঁজে দেখ না রজনীভাই। লক্ষণটা আমার ভাল লাগছে না।

—অন্ধকার হয়ে আসছে। জঙ্গলের ধারে কোথায় খুঁজব?

—হাঁটবার ক্ষমতা থাকলে আমি একাই যেতাম রজনীভাই। কয়েকটা মশাল-কশাল জ্বালিয়ে একটু ঢুকে দেখ না। আমাদের কিন্তু দেখা উচিত।

রজনী অসহায়ভাবে বলল, ঠিক আছে, দেখি। যত জ্বালা শালা আমারই। বলতে বলতে আবার ও ভেড়ির দিকে তাকায়. লোকগুলি এখন পিলপিল করছে ওখানে। এতবড় একটা মজার ঘটনা যেন আর কোনোদিন ঘটেনি।

উনিশ

জঙ্গলের মধ্যে একা ঢোকার ঝুঁকি কেউ বড় একটা নিতে চায় না। জন্তু-জানোয়ারের ভয় তো আছেই, পথ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ও বড় একটা কম নয়। ঈশানের মাথায় দুর্বুদ্ধি চেপেছিল, ঈশান রঞ্জনীর কাছ থেকে বন্দুক চেয়ে নিয়ে একা একাই জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল।

তখন বিকেল হয়ে এসেছে। কাছারিবাড়ি থেকে শ'তিনেক হাত দূরে জঙ্গল সাফাইয়ের হৈ-হল্লা পুরোদমে চলেছে। ঈশান ভোর থেকেই জঙ্গল সাফাইয়ের কাজে লেগে গিয়েছিল, দুপুরের পর খানিকটা গড়িমসি করল, তারপর কি খেয়াল হল জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। জঙ্গলে ঢোকার সময় শুকদেবের কথা মনে পড়েনি কিন্তু কিছুদূর এগোতেই মনে হল, শুকদেবকে নিয়ে আসা উচিত ছিল ওর। এভাবে একা আসাটা বোধহয় ঠিক হল না। অবশ্য শুকদেবের মতো অপয়া আর দুটি নেই। ও সঙ্গে থাকলে হরিণ পাওয়া তো দূরে কথা, হরিণের পায়ের ছাপ অবধি চোখে পড়বে না। অথচ যতক্ষণ না হরিণ একটা মারা যায়, ততক্ষণ যেন স্বস্তি নেই।

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে হাঁটছিল ঈশান। শুলো কাঁটা বাঁচিয়ে সাবধানে হাঁটছিল। বাঘ যদি পিছু নিয়ে থাকে, চট করে বোঝার উপায় থাকবে না। সুন্দরবনের বাঘ নাকি অনেকটা ছায়ার মতো। শিকারের পেছন পেছন নিঃশব্দে হাঁটে। যতক্ষণ না আওতার মধ্যে আসে ততক্ষণ টেরই পেতে দেয় না সে পিছু নিয়েছে। ঈশান মাঝে মাঝে সতর্ক হয়ে পিছনে লক্ষ্য রাখছিল। আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব পাখির শব্দে চমকে চমকে উঠছিল। পাখি যে অমন শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠতে পারে, কানে না শুনলে বিশ্বাসই করা যায় না। কখনো কখনো মনে হচ্ছিল মানুষের কান্নার শব্দ। কেউ যেন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে বসে কাঁদছে। ভীষণ সতর্ক হয়ে কান্নাটা লক্ষ্য করছিল ঈশান।

জঙ্গলের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। ফলে কাছারিবাড়ি বা নদী থেকে কতটা যে ও ভিতরে ঢুকে পড়েছে কে জানে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল পাখির ঐ অদ্ভুত শব্দগুলোই ওর এখানকার সঙ্গী। শব্দগুলোই ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল ঈশান তুমি একা। সাবধান ঈশান, তুমি একা। তোমার হাতের ঐ বন্দুকটা কিন্তু যথেষ্ট নয়, তুমি একা।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ঈশান, একটু থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ ওর খেয়াল হল, আদিগন্ত ছড়ানো কেওড়াগাছের জঙ্গলের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। একসঙ্গে এত কেওড়াগাছ এর আগে ও কোথাও দেখিনি। এত কেওড়াগাছ যেখানে, সেখানে কি হরিণ থাকবে না। নির্ঘাত হরিণ থাকবে এ জঙ্গলে। কিছুটা উত্তেজনা বোধ করে ঈশান।

আকাশের দিকে তাকাল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নিস্তেজ সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এখনো ঘন্টাখানেক জঙ্গলের ভেতর কাটানো যায়। একটা গাছে উঠে বসলে কেমন হয়। যা ভাবা, আর অপেক্ষা করে না ঈশান। বন্দুকটা সামলে ধরে একটা শক্ত মতো গাছ বেয়ে বেশ খানিকটা উপরে উঠে এল। আর একটু উপরে একটা তে-কোণা ডাল, সেখানে জুত করে বসার সুযোগ পেয়ে গেল ঈশান। পিঠের দিকে মূল কাণ্ডটা রেখে পাদুটো সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিল। ডান পাটা সামনের দিকে আটকে রাখতে অসুবিধা হল না কিন্তু বাঁ পাটাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে হল। তা হোক, এর চেয়ে ভাল জায়গা এ গাছে নেই।

চারপাশে সতর্কভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ঈশান। নিচে অনেকদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ ওর মনে হল, হরিণের খোঁজে যেমন ও এসেছে, তেমনি বাঘও তো এসে কোথাও ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। সুন্দরবনের বাঘ গাছেও উঠতে পারে কিনা কে জানে! বন্দুকটা শক্ত করে বাগিয়ে তৈরি হয়ে থাকে ঈশান।

আবার কয়েকটা পাখি মড়াকান্নার মতো একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু শব্দটা এখন আর তেমন খারাপ লাগে না ঈশানের। জঙ্গলের মধ্যে অনেকক্ষণ কাটিয়ে কাটিয়ে এখন যেন কিছুটা ও সড়গড় হয়ে উঠেছে। পেছন দিকের ডালটায় পিঠটাকে বেশ করে সেঁটে রাখে ঈশান। ঘাড়টা ঝুলিয়ে দিতে আকাশের দিকে চোখ পড়ে। গাছপাতার ফোকর দিয়ে ঝিমমারা আকাশের চেহারায় কোনো বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু পশ্চিম দিকে হেলে-পড়া সূর্য আলোর ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে দিয়েছে জঙ্গলের ভিতর। অনেকক্ষণ সেই আলোর কণার দিকে তাকিয়ে থাকলে সূর্যেরও যে গতি আছে তা বোঝা যায়।

ঈশান একটু উন্মনা হয়ে পড়েছিল বোধহয়, ছোটকর্তার কথা মনে পড়ল। গতজন্মের অশেষ পুণ্যি ছিল লোকটার। রাজার ঘরে জন্মেছেন, রাজার মতোই দাপট নিয়ে বেঁচে আছেন। খেয়াল-খুশি মতো জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ভাগ্য কজন মানুষের জোটে। সুন্দরবনে দু'দিনের জন্য এলেন, ফুর্তিফার্তা করলেন, চলে গেলেন। ভগবান যেন সবকিছুই সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন ওঁর জন্য।

কিন্তু ঈশানের ব্যাপারে ভগবান এত কৃপণ কেন। শুধু ঈশান বললে ভুল হবে, এখানে যারা ঈশানের সঙ্গী হয়ে এসেছে, তাদের বেশির ভাগই তো হতভাগা। জঙ্গল পুরোপুরি সাফ করে আবাদ বানাতে পারলে নাকি ভাগ্য খুলবে। এখানকার সবাইকেই জমি দেওয়া হবে। চাষের জমি, বাসের জমি। তখন যে যার ইচ্ছেমতো নিজের জমিতে ঘরদোর বানিয়ে নিতে পারবে। হ্যাঁ একমাত্র এই আশাতেই এতগুলো লোক এসে হাজির হয়েছে এখানে। ঘর তোলার পর ঘরনী আনবে কেউ কেউ। ঈশানের এমন কেউ নেই যে আদর করে এখানে এনে বসাতে পারবে।

কেউ নেই ঈশানের। ঈশান একা। বিশ্বসংসারে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে এমন একজনও নেই যাকে ও আপন করে কাছে টেনে নিতে পারে।

কথাটা মনে আসতেই ঈশানের খারাপ লাগল। হাতের বন্দুকটাকে ও আবার শক্ত করে ধরে জঙ্গলের দিকে চোখ পাতল। আর এ সময়ই ও চমকে শক্ত হয়ে উঠল, কি ওগুলো। দূরে, ঐ যে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কি রে বাবা।

প্রথমে ও বিশ্বাসই করতে পারে না ওগুলো হরিণ। গাছের পাতায় পাতায় মিশে অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওদের। একসঙ্গে এক ঝাঁক এমনভাবে যে এসে হাজির হবে কল্পনাও করতে পারেনি ও।

ঈশান কি স্বপ্ন দেখছে। না, এই তো ও ইচ্ছেমতো হাত-পা নাড়তে পারছে। স্বপ্ন না। ঈশানের উত্তেজনা বেড়ে গেল।

একটুও আর নড়ল না ঈশান। শব্দ পেলেই ওগুলো পালাবে। নিঃশব্দে বন্দুকের নলটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ও হরিণগুলোর দিকে তাক করল। কিন্তু না, আর একটু না এগোলে গুলি ছোঁড়া উচিত হবে না। মনে মনে ও ভগবানকে ডাকল, হে ভগবান, দোহাই তোমার, আর একটু ওদের কাছাকাছি এগিয়ে দাও ভগবান।

স্তব্ধভাবে হরিণগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে ঈশান। হলুদ উজ্জ্বল রঙের বড় বড় চিতা ছাপ। অনেকটা নেকড়ের মতো। রোদ লেগে গায়ের রং আরো ঝলসে উঠেছে। কয়েকটার সিং আছে, দেখতে পেল ঈশান। কয়েকটা নেহাতই শিশু। পাগুলো সরু সরু। কী নিশ্চিন্তে ওরা এখানে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। অলস গা-ভাসানো ভঙ্গি। মাটি শুঁকছে কেউ কেউ। কেউ আবার কচি সবুজ পাতায় মুখ ডুবিয়ে খিদে মেটাবার চেষ্টা করছে।

নাহ্, আর একটু কাছে না এগোলে গুলি ছোঁড়া উচিত হবে না। অপেক্ষা

করল ঈশান। হে ভগবান, আর একটু এগিয়ে দাও না ওদের। অন্তত ঐ ঝোপটার পাশ থেকে একটু এপাশে সরিয়ে দাও না গো।

হরিণগুলো এখনো নিশ্চিন্ত। ইচ্ছেমতো ঘুরছে, খেলা করছে, পাতা চিবোচ্ছে। ঝোপের ভিতরেই কয়েকটা বোধহয় ঢুকে পড়ল। না না, ঐ তো ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। হ্যাঁ, এগোচ্ছে এবার। ঈশান বন্দুকের নলটা উঁচু করে ধরল, বাঁটটাকে কাঁধের সঙ্গে চেপে তৈরি হল। এবার গুলি ছুঁড়লে একটা আধটাকে নির্ঘাত ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু তবু আর একটু অপেক্ষা করল ঈশান।

লম্বা সিংঅলা একটা হরিণের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল। ওটাই কি ওদের দলপতি! ওর কথামতোই কি দলের সবাই চলাফেরা করে! হ্যাঁ, এমন ভাব করছে ও, যেন পুরো দলটাকে ও-ই চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে লক্ষ্য রেখেই হরিণগুলো এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে।

জয় মা কালী। টিগারে চাপ কষে দিল ঈশান। আর সঙ্গে সঙ্গে বনের চেহারাটা মুহূর্তেই পালটে গেল। আর্ত চিৎকার করে সমস্ত বনভূমি ককিয়ে উঠল। হাজার হাজার পাখির ডানায় ছেয়ে গেল আকাশ। কী চিৎকার! বনের সমস্ত নির্জনতা মুহূর্তেই ভেঙেচুরে খানখান হয়ে গেল।

হরিণগুলোর তখন ভিন্ন অবস্থা। হকচকিয়ে কি যে করবে কিছুই বুঝতে পারল না প্রথমে। পরমুহূর্তেই তীরের ফলার মতো ছত্রখান হয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটতে শুরু করল।

ঈশানও প্রথম চোটে কেমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। জঙ্গলের চিৎকারে ওরও ভয় পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঘোরটা কেটে যেতেই ও দেখল, সবকিছু আবার স্বাভাবিক।

কিন্তু কই, একটা হরিণও নেই যে! সব ফাঁকা। তবে কি ফসকে গেল গুলিটা! না, হতেই পারে না। গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা হরিণকে অন্তত ও লাফিয়ে উঠতে দেখেছিল। হরিণটা চোট না পেলে অমনভাবে লাফাবে কেন! আর সত্যি সত্যি যদি চোট পেয়ে থাকে, দু-দশ হাত হয়তো এগোতে পারে, কিন্তু তারপর!

আর অপেক্ষা করা যায় না। তরতর করে গাছ থেকে নেমে পড়ে ঈশান। নেমেই গুলো ডিঙিয়ে ঝোপটার দিকে এগিয়ে এল। কী আশ্চর্য। একটাও নেই! কেমন যেন বোকা হয়ে গেল ঈশান। এত করে হাতের মুঠোয় পেয়েও যে শেষ পর্যন্ত ফসকে যাবে ভাবাই যায় না।

আর একটু এগিয়ে ঝোপের গায় গায় আসতেই ও চমকে উঠল। আরে, ঐ তো, ঐ। ঝোপের মধ্যে ঐ তো একটা ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে।

লাফিয়ে লাফিয়ে ঝোপের কাছে এগিয়ে আসে ঈশান। হরিণটার আর পালাবার উপায় নেই। চোট খাওয়া পাটাকে ভাঁজ করে বসে পড়েছে। ঝোপের মধ্যে যে ঢুকবে সে ক্ষমতাও আর নেই যেন।

ঈশান দেখল, নেহাতই বাচ্চা হরিণ। মাথা থেকে লেজ বড়জোর হাত তিনেক হতে পারে। চমৎকার চকচকে গা, কিন্তু চোখদুটো কেমন সজল, কেমন করুণ।

ঈশান ওর গায়ে হাত রাখল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা ছটফট করে কেঁপে উঠল।

—তবে রে শালা! আমার হাত থেকে পালাবি! আহ্ আহ্ ঈশান ওকে দু'হাতে চেপে ধরল।

বাচ্চাই হোক, আর বুড়োই হোক, হরিণ তো! মখমলের মতো গা। এই, এই—দাঁড়া, কোথায় গুলি লেগেছে আগে দেখে নিই।

হরিণের একটা পা ধরে উলটে ফেলল ও। সঙ্গে সঙ্গে হরিণের পায়ের কাছে এক চাপ তাজা রক্ত ওর চোখে পড়ল। চারপাশে আরো খুঁজে দেখল, নাহ্ কেবল পায়েই জখম হয়েছে। ফেনার মতো রক্ত উপচে বেরুচ্ছে ওখান থেকে। হাতের চেটো বুলিয়ে রক্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করে ঈশান। কিন্তু আরো রক্ত। রক্ত মুছে মুছে ক্ষত জায়গাটা ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। গুলির টুকরোটা কি ভিতরেই রয়ে গেল, বোঝা যাচ্ছে না। নাহ্, সামান্য একটু চামড়া যেভাবে ঝুলে আছে, তাতে মনে হয় না ভিতরে কিছু আছে। হয়তো যত্ন করলে ক্ষতটাকে সারিয়ে তোলা যাবে। হরিণটা যে প্রাণে বেঁচেছে এই তো ঢের। রোমাঞ্চ বোধ করে ঈশান। কি ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত একটা জ্যান্ত হরিণই ওর হাতের মুঠোয় এসে গেছে। হুররে, কী মজা!

হরিণটা এলোপাতাড়ি পা ঝাপটাচ্ছিল। আহ্ আহ্—ঈশান ওকে শান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু শান্ত হওয়া দূরের কথা, খোঁড়া পায়েই যেন ছুটে পালাবে। আহ্—ঈশান ঝট্ করে হরিণটাকে কাঁধে তোলার চেষ্টা করল। কাঁধে ফেলেই এখন ছুটতে হবে। জঙ্গলের ভিতর আর সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না ওর।

হরিণটাকে কাঁধে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই পা দিয়ে ওর ঘাড়ে আঁচড় বসিয়ে দিল জন্তুটা। আবার ওকে মাটিতে আছড়ে ফেলতে হল। চিত হয়ে পড়ল হরিণটা।

পা জোড়া লতা দিয়ে বেঁধে নেওয়ার কথা মনে এল এ সময়। ঝোপ থেকে একমুঠো লতা টেনে নিয়ে ও হরিণের দু-জোড়া পা-ই বেঁধে ফেলল। তারপর পিঠে হাত বুলিয়ে হরিণটাকে অভয় দেবার চেষ্টা করল। আহ্‌ আহ্‌, চটছিস কেন। কথা দিচ্ছি, তোকে প্রাণে মারব না। না হয়, যতকাল বাঁচিস আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবি। তোকে আমি আপনজনের মতো পালন করব। বুঝলি, তোকে আমি ভালবাসব। আমি তোকে আগলে আগলে রাখব। দেখিস, কেউ তোকে কিছু বলবে না।

ঈশান ওকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল ; জানিস, এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। তোকে নিয়েই আমি থাকব, কেমন। চল, এবার আমরা ফিরে যাই।

ঈশান বিড়বিড় করতে করতে হরিণটাকে আবার কাঁধে তুলল। বন্দুকটাকে সুবিধামতো বাগিয়ে ধরে চারপাশে একবার দেখে নিল। নাহ্‌ সূর্যের আলো আর লেশমাত্র দেখা যাচ্ছে না। স্যাঁতসেঁতে জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে শীত এসে স্রোতের মতো ভাসতে শুরু করেছে। জমিয়ে শীত পড়বে আজ রাতে। জঙ্গলের ভিতরে এই শীতের প্রকোপটা যেন আরো বেশি।

বেশ ওজন আছে বলে মনে হল ওর। কাঁধের ওপর একতাল উষ্ণ মাংসপিণ্ড যেন বসিয়ে রাখা হয়েছে। হরিণের গায়ের তাপ চুইয়ে চুইয়ে ওকেও উষ্ণ করে তুলতে লাগল।

এই সময় পথভুলের ভয় হয় ওর। কি জানি, এই পথেই এসেছিলাম কিনা। হ্যাঁ, এই পথেই। ঐ তো পায়ের ছাপগুলো স্পষ্ট এখনো চোখে পড়ছে। ঈশান পায়ের ছাপ লক্ষ্য করতে করতে এগোতে থাকে।

হরিণটাকে নিয়ে যখন কাছারিবাড়ির ডেরায় পৌছাব, তখন হৈ চৈ পড়ে যাবে। শুকদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, কি করে পেলি ভাই ? কোথা থেকে ধরলি ? শুকদেব এবার বুঝতে পারবে, সত্যি সত্যি ও অপয়া। ও জঙ্গলে ঢুকলে হরিণের কোনো চিহ্ন থাকে না।

ছোটকর্তা এখন এখানে নেই। না থাকাতেই ভাল হয়েছে, মনে মনে স্বস্তি বোধ করে ঈশান। ছোটকর্তা থাকলে নির্ঘাত খাওয়ার জন্য এটাকে মেরে ফেলতে হত। এতবড় একটা নিষ্ঠুর কাজ হয়তো ওকেই শেষপর্যন্ত করতে হত। অথচ হরিণটার চোখের দিকে তাকালে কার বুকের পাটা আছে যে একে মারবে। ঈশানের গুলির ঘায়ে প্রথম চোটেই যদি মরে যেত তা হলে এক কথা ছিল।

ক্রমশ দ্রুত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করে ঈশান। রাস্তা ভুল হচ্ছে না তো। বারবার সতর্ক হয়ে পায়ের ছাপের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে ওকে। ধীরে ধীরে

জঙ্গলের ভিতর অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। চমকে উঠল, ওগুলো কি ওপাশে। এক ঝাঁক আলোর ফুল যেন উড়ছে। না, জোনাকি। চিনতে পারল ঈশান। জোনাকি। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগেই জোনাকি উড়তে শুরু করেছে। আকাশে পাখপাখালির চিৎকার ক্রমশ বাড়ছে। প্রতিদিন পাখির চিৎকারের ভিতর দিয়েই সন্ধ্যা নামে। আজও সেইভাবেই নামছে। কিন্তু আজ এই সন্ধ্যাটার যেন কিছু নতুনত্ব আছে। প্রতিদিন ভেড়ির ওপর থেকে কিংবা কাঠুরেদের ডেরায় বসে পাখিদের ভাবভঙ্গি দেখে ঈশান, আজ এখন চারপাশ ঘিরেই পাখির রাজ্য।

ও কি, ঐ ঝোপটা অমনভাবে নড়ে উঠল কেন। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ঈশান। বন্দুকের নলটা ঝোপের দিকে তাক করে। কিন্তু না, কিছু না। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। যদি কিছু জন্তুজানোয়ার লুকিয়ে থাকে, কিছু করার নেই ঈশানের। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ঈশান আবার হাঁটতে শুরু করে। পায়ের দাগ আর চেনার উপায় নেই। বিলকুল অন্ধকার নেমে এসেছে। হরিণটা কি অন্ধকারের জন্যই ওর কাঁধে বুঁদ হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে, না কি পায়ের যন্ত্রণায় আর ভয়ে অচৈতন্য হয়ে আছে ও। যেভাবেই থাক। হরিণটা জ্যান্ত। ওর দেহের উত্তাপ এখনো চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে আসছে সারা গায়ে।

আরো দ্রুত পা চালাবার চেষ্টা করে ঈশান। হরিণটাকে কাছারিবাড়ির উঠোনে নিয়ে গিয়ে দশজনের মধ্যে না ফেলা অবধি যেন স্বস্তি নেই। হৈ-হৈ পড়ে যাবে আজ কাঠুরেদের মধ্যে। ঈশান রসিয়ে রসিয়ে ঘটনাটা শোনাতে পারবে ওদের। সাহস আর বুদ্ধি থাকলে বাঘও ধরে আনা যায়।

উত্তেজনা ক্রমশ প্রখর থেকে প্রখর হচ্ছিল। কতক্ষণ যে ঈশান হরিণ কাঁধে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটল কে জানে। এক সময় ও দূর থেকে কাছারিবাড়িটাকে দেখতে পেল। দেখতে পেয়েই ও ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল। হাঁপিয়ে পড়ল ঈশান।

কাছারিবাড়িটাকে ঘিরে কেমন একটা অবসাদ ছড়িয়ে আছে। প্রতিদিন এই সন্ধ্যায় এখানে সোরগোল চলে, আজ কেমন নিস্তব্ধ—

কেমন যেন সন্দেহ হল ঈশানের। কী ব্যাপার, গেল কোথায় সব। হরিণটাকে কাঁধ থেকে নামাল, আহ্, ঝামেলা করিস না। দাঁড়া। এমন সময় মকবুলের দেখা পেল ঈশান।

—কি হয়েছে মকবুল ভাই? গেল কোথায় বাবুরা?

মকবুল পালটা প্রশ্ন করল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি শুনি? তোকে খুঁজতে আবার লোক ছুটেছে। ওটা কি?

—হরিণ। আমি পুষব। ঈশান খুশিতে আটখানা।

হরিণটা খোঁড়া পায়েই লাফাবার চেষ্টা করল, ঈশান ওকে পা দিয়ে কাঁচি মেরে ধরে রাখল।

—একা একা জঙ্গলে ঢুকে এই রাত পর্যন্ত কাটিয়ে এলি। মরবি শালা। একদিন বুঝতে পারবি মজাটা।

—কি হয়েছে বল না? কাউকে দেখছি না?

—ভেড়ির দিকে যা, সব দেখতে পাবি।

—কি হয়েছে ওখানে?

—ঘাটে আবার বনবিবির নাও এসেছে।

—মানে? গা-হাত-পা কেমন অবশ হয়ে আসে ঈশানের। বনবিবির নাও মানে?

—যা না, গেলেই দেখতে পাবি। ঘাটে একটা ডিঙি এসেছে। আর ডিঙিতে নাকি সেই মেয়েটা।

যাহ্। ঈশান যেন অবিশ্বাস্য কিছু শুনল। হতেই পারে না।

—তবে সেই মেয়েটা এবার একা নয়। সঙ্গে একটা মরদও আছে।

—কে সে?

—আমি কি করে বলব! আমি ভাঙা কোমর নিয়ে দেখতে গেছি নাকি!

হরিণের বাচ্চাটা আবার লাফিয়ে উঠেছিল। ঈশান ওর বেয়াদপি দেখে একটা লাথ কষাল। শালা, যত বলছি চুপ করে থাক, শোনে না।

হরিণটা খানিকটা দূরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। আবার ওটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এল ঈশান। দেখ তো মকবুল ভাই, পায়ে সামান্য একটু চোট পেয়েছে বেচারি, বাঁচবে কিনা? টেনে হরিণটাকে মকুবলের কাছে নিয়ে এল।

ইতিমধ্যে হৈ-হৈ করে রজনী দু'চারজনকে নিয়ে এসে হাজির। ঈশানকে দেখেই খ্যাপা কুকুরের মতো চেঁচিয়ে উঠল রজনী, এই হারামজাদা রাজপুত্তুর, কোথায় থাকিস?

—বাই বাপ, এ যে জ্যান্ত হরিণ গো! হরিণটার গায়ে হাত রাখল মহাদেব।

ঈশান বলল, হ্যাঁ, জ্যান্ত হরিণই। ধরব বলেছিলাম, ধরে নিয়ে এলাম। এটা আমার, একে আমি পুষব।

রজনী বলল, পরে পুষিস। আগে ওদিকে সামলে আয়, সেই ডাইনীটা আবার এসে হাজির হয়েছে।

নিশিকান্ত বলল, এসেই তোর খোঁজ শুরু করে দিয়েছে ঈশান। তোকে ভোলেনি। কি নাকি কথা আছে তোর সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে, কি কথা?

—কি কথা, তা নাকি তোকেই বলবে।

ঈশানের দেহটা কেমন ভারহীন হয়ে যেতে শুরু করলেন। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ভয়ানক রাত্রিটার কথা। গলুইয়ে চিৎ হয়ে ও শুয়েছিল। চোখের সামনে ছিল নক্ষত্রের চাঁদোয়া জড়ানো একটা আকাশ। অমন জঘন্য অসুখের পরও যে কেউ বেঁচে থাকতে পারে বিশ্বাসই করা যায় না।

ঈশান বলল, কে না কে এসেছে, আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ।

রজনী আদেশের ভঙ্গিতে বলল, ব্যাজর ব্যাজর না করে এবার ঘাটে যা, দেখে আয় তবে। আগেভাগেই আমি বলে রাখছি, অত মাথামাথি করা চলবে না এবার। দয়ালবাবু যা সহ্য করেছিলেন, আমি কিন্তু তা করব না আগেই বলে রাখছি। আমরা এখানে কেউ মরতে আসিনি।

হরিণটাকে নিশিকান্তর হাতে ছেড়ে দিল ঈশান। জখমি পাটা কি করা যায় দেখ না ভাই। একটু চুনহলুদ লাগিয়ে বেঁধে দিবি?

—আমি দেখছি, তুই যা।

মকবুল বলল, কি বলতে চাইছে ও, কেবল শুনেই চলে আসিস। বাড়তি ঝামেলা করা কিন্তু চলবে না।

—হ্যাঁ, একদম লাই দিবি না! কি অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে কে জানে!

ঈশান হরিণটাকে ছেড়ে দিয়ে ভেড়ির দিকে হাঁটা দিল। ভেড়ির দিকে তখনো কাঠুরেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখেই উত্তেজনা। সবার চোখেই বিস্ময়।

ঈশান লাফিয়ে এসে ভেড়ির ওপর উঠল। দেখল, সত্যি সত্যি একটা ছোট্ট জেলে ডিঙি, নোঙর করা। অবিকল সেই নৌকোটা। কিন্তু মানুষজন কাউকেই দেখতে পেল না ও। তবে কি ছইয়ের ভেতর রয়েছে।

ঈশান ভেড়িতে উঠতেই একটা সোরগোল উঠল। ঈশান এসেছে, ঈশান।

একটা অপরিচিত মুখ এগিয়ে এল ঈশানের কাছে, আপনি কিষান?

—কিষান না ঈশান।

লোকটা ছইয়ের কাছে এগিয়ে গেল, ছইয়ের উদ্দেশে মুখ করে ডাকল, গৌরী, গৌরী—

ছইয়ের ভিতর থেকে একটা নারীদেহ বেরিয়ে এল।

ঈশান দেখল, অপরূপ সুন্দরী একটি মহিলা! হ্যাঁ, এই মেয়েটাই তো! অন্ধকারে মুখের সেই গুটি চিহ্নগুলো চেনা গেল না। এখনো তা হলে বেঁচে আছে ও, কী আশ্চর্য!

অপরিচিত লোকটা বলল, আপনাকে একবারটি ও দেখতে চায়। আর সেই জন্যই গৌরীকে নিয়ে আপনাদের এখানে আসতে হল।

ঈশান কথা খুঁজে পেল না। হ্যাঁ, এতকাল তো ঈশানও ওকে একটিবারের জন্য দেখতে চেয়েছিল। বিশ্বাসই করা যাচ্ছে না, সেই মেয়েটাই এখন ছইয়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর নাম যে গৌরী এই প্রথম জানতে পারল ঈশান।

কুড়ি

আসলে আকাশের চেহারাটাই আজ অন্যরকম। কখন, কোন ফাঁকে যে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছিল কেউ লক্ষ্য করেনি। দিনের বেলা খটখটে রোদ গেছে বলে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে মেঘ ছেয়ে যাবে। শীতকালে এ-রকম বড় একটা হয় না, কিন্তু আজ বিশেষ দিন, আজ ভূমিকম্প হলেও বলার কিছু নেই।

জলভরা বাতাসের একটু ঝাপটা গায়ে লাগতেই রজনী চমকে উঠল। আকাশের দিকে তাকাল, একটা নক্ষত্রও দেখা যাচ্ছে না, চাঁদও ওঠেনি। চাঁদ ওঠেনি বলেই ওর সন্দেহ হল, আর আকাশে মেঘের আগমনের কথা জলভরা বাতাসই জানিয়ে দিয়ে গেল।

রাতে যদি সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামে, দিকদারির আর সীমা থাকবে না। প্রথমত তাড়াহুড়ো করে যে কাঠুরে ডেরা বানানো হয়েছে, সেগুলো ঝড়ে জলে কতটা যে মজবুত এখনো তা পরীক্ষা হয়নি। দ্বিতীয়ত সারা জঙ্গলেই প্যাচপেচে কাদা। কাদার মাত্রা আরো বাড়বে। কাদা ঘাঁটতে ঘাঁটতে পায়ের আঙুলগুলোয় এবার থেকে ঘা হতে শুরু করবে।

রজনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আকাশটাকে পরীক্ষা করল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চেনা যায় না। এমনিতেই বিকেল থেকে আজ দুশ্চিন্তার শেষ নেই, তার উপর আবার আকাশের ভাবসাব ওর মেজাজটাকে খাট্টা করে রাখল।

চারপাশের তদারকি ছেড়ে রজনী কাছারির উঠোনে এসে দেখল, থোকায় থোকায় চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। উঠোনের এক-পাশে খুঁটি পুঁতে হরিণটাকে

বেঁধে রাখা হয়েছে। হরিণকে ঘিরে তখনো জটলা কমেনি। ভূতের মতো কালো কালো চেহারার লোকগুলির উপরই রাগটা আছড়ে পড়ল ওর।

রজনী হাঁক ছাড়ল, তোদের হরিণ দেখা শেষ হবে না ? জীবনে কখনো হরিণ দেখিসনি ?

লোকগুলি মুখ ঘুরিয়ে রজনীকে একবার দেখল। গলা আছে চেঁচাচ্ছে, গ্রাহ্য করল না।

দুটো-একটা কুপি জ্বলছে কুলি ডেরায়। কাছারিঘরের বারান্দায় একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় অন্ধকার কমার বদলে আরো যেন দাঁত কামড়ে চেপে বসেছে। থমথমে ঝড়ের পূর্বাভাস নিয়ে পরিবেশটা যেন অপেক্ষা করছে।

ঈশান এখনো ফেরেনি। নদীর ঘাটে নৌকোয় গিয়ে ঢুকে বসেছে। ভগবানই জানে, কি অত কথা থাকতে পারে ওদের। ঈশান ফিরে না আসা পর্যন্ত রজনীর অস্থিরতা আজ কমবার নয়।

এপাশে ওপাশে কিছুক্ষণ পায়চারি করল রজনী। হরিণটাকে নিয়ে কি সব ছাইপাঁশ তর্ক জুড়েছে ওরা। চট করে আবার রক্ত উঠে এল মাথায়। দুপ-দাপ করে রজনী এগিয়ে এল, তোদের কি আর কিছু করার নেই ? এদিকে বৃষ্টি আসতে পারে খেয়াল আছে ?

কেউ কেউ নির্বিকারভাবে আকাশের দিকে চোখ পাতল। বৃষ্টি যদি আসেই, কি করতে পারে ওরা। বৃষ্টিকে তো আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, মাথা গরম করে কি লাভ।

রজনী বলল, তাড়াতাড়ি রান্না-বান্না সেরে খাওয়ার পাট তো চুকিয়ে ফেলা যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত আর গজল্লা করবি শুনি ?

কে একজন হিঁ হিঁ করে হেসে উঠল, তা যা বলেছ, ঘাটে এসে পেত্নী উপস্থিত হয়েছে। কখন কার ঘাড় মটকে দেবে, তার আর খাওয়াই হবে না।

আর একজন কে টেক্কা দিয়ে প্রশ্ন করল, তা, ওই মেয়েটার সঙ্গে ঈশানের কি ব্যাপার গো রজনীভাই ?

রজনী লোকটার আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ঈশানই জানে, কি ব্যাপার। ও হারামজাদা নবাব হয়ে গেছে। নবাব আলিবর্দী খাঁ। জানিস ? ওশালা নবাব আলিবর্দী খাঁ।

উত্তরটা খুব জুতসই লাগল না। ঘষা পাথরের মতো ভোঁতা চোখ তুলে কেউ কেউ তাকিয়ে থাকল।

রজনী বলল, সেবার আমাদের সর্বনাশ ওই মেয়েটাই করে গিয়েছিল মনে আছে। আবার যদি সেরকম কিছু হয়, আমি ঈশানের ছাল-চামড়া তুলে নেব। আমি নরমের নরম, শক্তের শক্ত।

—কি সর্বনাশ করেছিল সেবার?

—রজনী বুঝলো লোকটা সেবার সঙ্গে ছিল না। নতুন এসেছে এবার। পুরনো ঘটনার তাই জের না টেনে বলল, যখন করবে, তখনই টের পাবি। যাগ গে, ও-সব কথা ছাড়, আজ এখনো আগুন জ্বলেনি চারপাশে খেয়াল আছে? বিনা আগুনেই আজ রাত কাটাবি?

আগুন জ্বালবার কথাই কারো মনে আসেনি এতক্ষণ।

দুটো-চারটে যদি আগুন না জ্বালিয়ে রাখিস, বেঘোরে মরবি। আমার কথা শুনছিস না, ঠিক হাতে হাতে ফল পাবি, দেখিস।

আগুন জ্বালাবার দায়িত্ব যাদের ওপর তাদের কয়েকজনকে দেখা গেল আর এক কোণে। গাঁজার কলকে নিয়ে বসেছে। শুকদেবই আজ ওদের মধ্যমণি। শুকদেবকে দেখা গেল, কোমর পাছা দুলিয়ে প্রলয় নৃত্য শুরু করেছে।

রজনী জানে গেঁজেলদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। ফলে গেঁজেলদের দিকে ও এগোল না। যারা হরিণের কাছে বসে গুলজার করছিল, তাদের তাড়া লাগাল, যা না বাপু, চটপট অন্তত আগুন কটা লাগিয়ে আয়।

—আগুন লাগিয়ে লাভ আছে? যদি বৃষ্টি নামে?

রজনী আবার আকাশের দিকে তাকাল। কেন যে আজ হঠাৎ আকাশটা এমন হয়ে গেল কে জানে। মেয়েটাই কি সঙ্গে করে মেঘ নিয়ে এল! অসম্ভব নয়। সব পারে ওরা।

রজনী বলল, বৃষ্টি যে আসবেই এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু আমাদের কাজ-টুকু আমরা করব না কেন। যা না বাপু, এই বল্লভ, যা না।

কয়েকজনের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আগুন জ্বালাতে পাঠিয়ে দিল রজনী। পরে আরো একটু এপাশ ওপাশ ঘুরঘুর করে মকবুলের ঘরে এসে স্থির হয়ে বসল। একটা তেলের ডিবে জ্বলছে ওখানে। মকবুল কম্বল জড়িয়ে অসুস্থ রুগীর মতো শুয়ে আছে।

রজনী ধীরে ধীরে ডাকল, মকবুল ঘুমুলি?

মকবুল তাকাল।

—আকাশের চেহারাটা একদম ভাল দেখাচ্ছে না রে মকবুল। বৃষ্টি হতে পারে।

মকবুল একটু কাত হয়ে উঠে বসল। কোমরের ব্যথাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। এত ব্যথার মধ্যেও রজনীকে ও আশ্বাস দিল, শীতকালের মেঘ, দু-এক পশলা যদি নামেও ক্ষতি হবে না।

—ক্ষতি হবে না কি রকম। রজনীর গলা থেকে একটু ঝাঁঝ ছিটকে এল। সব তো নবাব বাদশা নিয়ে কারবার আমার। এমনিতেই কেউ কাজ করতে চায় না, বৃষ্টি হলে সারাদিন কেবল বসে গাঁজা টানবে।

মকবুল কিছুক্ষণ শূন্যচোখে তাকিয়ে থাকে, রজনীর এত দুশ্চিন্তার কোনো কারণ খুঁজে পায় না ও। তবু সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলল, অত ভাবছ কেন বুঝতে পারি না। যা হবার তা হবেই। ঈশান ফিরেছে?

রজনী এই প্রশ্নটা শোনার জন্যই যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, ক্রোধ উগরে ফেলল, ও ব্যাটাকে এখান থেকে বিদেয় না করলে কারো মঙ্গল নেই। অত করে বলে দিলাম, যাবি আর চলে আসবি। তা শুনলে তো।

মকবুল রসিকতা করল, তাহলে একটা কাজ কর না, মেয়েটার সঙ্গে ওর সাদি দিয়ে দাও। আপদ চুকে যাক। ও ব্যাটার এখন মেয়েছেলে দরকার।

—না না, ঠাট্টার সময় নয় রে মকবুল। চারদিক থেকে আবার যে একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ফের যদি আগের বারের মতো এখান থেকে আমাদের পালাতে হয়, কি করে মুখ দেখাব বল তো।

মকবুল তাচ্ছিল্য দেখাল, না না, পালাব কেন। কিচ্ছু হবে না, দেখে নিও। সেবার অন্য ব্যাপার ছিল।

—কি ব্যাপার?

—সেবার ওর মায়ের দয়া হয়েছিল।

—এবার ও কিসের দয়া নিয়ে এসেছে কে জানে।

মকবুল বলল, আমার একটা কথা শুনবে?

—কি?

—আমি বলি, এখানে যত মেয়েছেলে আসবে সবাইকে ধরে রাখ। মেয়েছেলে না থাকলে মনে ফুর্তি থাকে কারো। ঘুমিয়ে জেগে সারাক্ষণ কেবল ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া পুরুষের মুখ।

রজনী কিছুক্ষণ থমকে রইল। পরে গম্ভীর গলায় বলল, মেয়েছেলে আনলে

সব ব্যাটা জঙ্গলের কাজ ফেলে এঁটুলির মতো ওদের গায়ে লেগে থাকবে। সোনায় সোহাগা হবে তাহলে।

—তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু সত্যি নয় রজনীভাই। মেয়েছেলের সঙ্গে একটু ফুর্তিফার্তা করতে পারলে দেখবে দশজনের কাজ একজন করছে।

—তার আগেই ছোটকর্তার কাছে খবর পৌঁছে যাবে। ছোটকর্তা তার খরচ যোগাবেন কেন? টাকা তো আর খোলামকুচি নয়।

—তাহলে এই যা কাজ হচ্ছে, এ-রকমই হবে রজনীভাই। মানুষের মনে ফুর্তি না থাকলে কাজ হয়?

রজনী দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল, বাইরে অন্ধকার। পাতলা একটু বাতাসের শব্দ ওর কানে এল। বলল, সন্ধ্যাবেলা রোজ আগুন জ্বালাবার কথা, কিন্তু তাড়া না লাগালে কেউ আগুন লাগায় না। আরএকদিন যখন কাউকে তুলে নিয়ে যাবে বাঘে, তখন টের পাবে সবাই।

মকবুল আর কথা বাড়াল না।

—তাছাড়া ছোটকর্তার মনোভাব তোরা জানিস না। আমি জানি।

—কি মনোভাব? মকবুল জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

—ছোটকর্তার ইচ্ছে, সেই দয়াল ঘোষকেই আবার এখানে পাঠিয়ে আমাদের মাথার ওপর বসিয়ে দেন। দয়াল ঘোষ এলে কার ভাল হবে শুনি? এত স্বাধীনতা কে পাবে তখন?

—কেন, দয়াল ঘোষকে পাঠাবেন কেন?

—বুঝিস না, কেন! আমরা চলে আসার পর দয়াল ঘোষ তো আর চুপ করে বসে থাকার লোক নয়, ও নির্ঘাত ছোটকর্তার কানে মন্ত্র ঢালছে।

মকবুল এসব কথা কখনো ভেবে দেখেনি। এখানে মাথার ওপর রজনীই থাকুক আর দয়াল ঘোষই থাকুক ওর কিছু যায় আসে না। কিন্তু রজনীর যে এর জন্ত একটা উৎকণ্ঠা থাকতে পারে, এটা ওর মাথায় আসেনি কোনোদিন। ফলে হাওয়া বুঝে ও বলল, উড়ে এসে আর কেউ এখানে জুড়ে বসতে পারবে না রজনীভাই। মিছিমিছি তুমি ভাবনা করছ।

—তুই তো বলে খালাস। এলে ঠেকাতে পারবি?

—আসবেই না।

—যদি আসে?

—ঠিক আছে, যদি আসে তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

—কি ব্যবস্থা?

রজনীর মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে দেখায়। মকবুলের মায়া হয়। বলে, আমার কাছে ওষুধ আছে। যদি দরকার হয়, দেব।

—কি ওষুধ ?

মকবুল বলল, সে সব সময় মতো দেওয়া যাবে। আর দুশ্চিন্তা কোরো না দেখি। ঈশান এল কিনা একবার খোঁজ নাও।

—বল না বাপু ? কি ওষুধ ? জেনে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।

মকবুল একটুক্ষণ থমকে রইল। পরে বলল, আমাদের মধ্যে রসিকলাল আছে। ওকে দিয়েই তুকতাক করাব। এমন বাণ মারব যে দয়াল ঘোষ মুখে রক্ত তুলে তুলে মারা যাবে।

রজনী কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ল, ধুৎ। ও বেটার ঘটে কিছু নেই। বাঘবন্দী নিয়ে কি করল দেখলি না।

—ওর মধ্যে কি আছে না আছে আমি টের পেয়ে গেছি রজনীভাই। দেখো সময় মতো ঠিক কাজে লাগাব ওকে।

পাশ ফিরতে গিয়ে মকবুল কোমরে হাত রাখল, ওরে বাপ, হাড়গুলো বোধহয় গুঁড়োই হয়ে গেছে।

রজনী বলল, মালিশ করিয়ে নে না, কাউকে ডাকব ?

মকবুল হাসে, না দরকার হবে না। তুমি একটু নিশ্চিন্ত হও তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আরো কিছুক্ষণ বসে রইল রজনী। তারপর বলল, ঠিক আছে। তুই ঘুমো। তবে দরকারের সময় যেন সঙ্গে থাকিস মকবুল। বিদেশ-বিভুঁইয়ে তুইও যা আমিও তা। ভুলে যাস না যেন।

মকবুল চোখ বুজল। ঠিক আছে। এবার যাও।

রজনী ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। বাইরে ততক্ষণে তিন-চারটে কুণ্ডলিতে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। এপাশ ওপাশ খোঁজ নিয়ে জানল, ঈশান এখনো ফেরেনি। ঈশানটা যে আবার একটা বিপদ ডেকে আনতে চাইছে তাতে সন্দেহ নেই। রজনী অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে ভেড়ির দিকে।

একুশ

ঈশান ভেড়ি ডিঙিয়ে আরো নিচে গৌরীর নৌকোয় ততক্ষণে উঠে বসেছে। গৌরীকে যে দু'চোখ ভরে আবার কোনোদিন ও দেখতে পাবে কে ভেবেছিল।

নিজের চোখকেই যেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না। হ্যাঁ, অবিকল সেই চোখ, হুবহু সেই মুখ। তফাত কেবল সেদিন ঐ চোখদুটো ছিল সজল, যন্ত্রণায় কাতর, আর আজ কত উজ্জ্বল। কত খুশি খুশি দেখাচ্ছে আজ গৌরীকে। এই রকম একটা পরিবেশ ছেড়ে কাছারিবাড়ির দিকে ফিরে যাওয়ার কথা মনেই এল না ওর।

ঈশান আপনজনের মতো গুছিয়ে ওদের সঙ্গে নৌকোয় গিয়ে গ্যাট হয়ে বসে পড়ল। কিন্তু গৌরীর সঙ্গে এই নতুন মানুষটা যে কে ধরতে পারছে না ঈশান। কোত্থেকে যে এই লোকটা গৌরীর সঙ্গে জুড়ে বসেছে, আর একটু পরিষ্কারভাবে না জানা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই। অথচ খোলাখুলিভাবে গৌরীকে এ ব্যাপারে প্রশ্নও করা যাচ্ছে না। লোকটা এঁটুলির মতো সঙ্গে লেগে আছে গৌরীর। প্রথম থেকেই লোকটা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন গৌরীর ওপর ওর খোদকারি করার অধিকার আছে।

চারপাশে এখন ঝিমঝিমে রাত। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, নদীর জলে ফসফরাস জ্বলছে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে ফসফরাস। আগুনের টুকরোগুলি বুদ্বুদ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার ঝকঝক করে জ্বলে উঠছে। এ এক অদ্ভুত খেলা নদীর।

গৌরীকে দেখে দেখে আশ মিটছিল না ঈশানের। গৌরী রান্নার যোগাড় করে নিয়েছিল নৌকোতেই। ঈশানকে পেয়ে ওরও যেন খুশির অন্ত নেই। ঈশানকে নেমন্তন্ন করে বসল গৌরী, আজ কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেয়ে যেতে হবে ঈশান ভাই। সামান্য নুন ভাত, তবে গরম গরম খাওয়া যাবে, এই যা।

ঈশান এক কথাতেই রাজি। নুন-ভাতই অমৃত। কাল বরং মাছটাছ মেরে এনে গৌরীকে দেওয়া যাবে।

উনোনে বাতাস করতে করতে চোখমুখ লাল করে ফেলেছিল গৌরী। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মিষ্টি করে হাসল, সত্যি সত্যি তুমি আমার দাদার মতো, তোমার সঙ্গে আবার যে একদিন দেখা করতে পারব স্বপ্নেও ভাবিনি। কী ভাল যে আজ লাগছে, কি বলব তোমাকে।

ঈশানের সারা গায়ে সুখের কাঁটা দিয়ে উঠল। নিজের কানকেই যেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না। মেয়েটা অকৃতজ্ঞ হলে নির্ঘাত ওকে ভুলে যেত। ওর দুর্দিনে এমন কিছুই করতে পারেনি ঈশান। কোনো কিছু করাও সম্ভব ছিল না, তবু যে ভুলে যায়নি ওকে এই তো যথেষ্ট। ঈশান উনোনের দিকে তাকিয়ে থাকল। কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলাম!

—কি ভাবছ? প্রশ্ন করে গৌরী।

ঈশান চমকে উঠল, কই কিছু না তো, কিছু না।

লক্ষ্মণ কিছুটা রসিকতা করার চেষ্টা করল এ সময়, বাবুর বিয়ে-থা হয়নি, এই বয়সে বিয়ে-থা না হলে একটু উদাস উদাস ভাব থাকবেই।

ঈশান কেমন ক্যাকাসে হয়ে গেল, না না, সে সব না।

—সে সব না মানে? আমি শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চিনতে পারি।

—মাইরি বলছি, সে সব না। এই জঙ্গলে সাপ বাঘের সঙ্গে বাস করে বিয়ে করার কথা ভাবাই যায় না। কবে আছি কবে নেই কে বলবে।

—ওরে ব্বাস! এ যে সন্ন্যেসীর মতো কথা বলে গো। হা হা করে হাসল লক্ষ্মণ।

—বিশ্বাস হল না তো। কয়েকদিন আগে আমাদের একজনকে বাঘে নিয়ে গেছে জানো। কদিন পরে লোকটাকে যখন খুঁজে বার করলাম, তখন চেনাই যায় না। বাঘ তো আমাকেও নিয়ে পারত।

গৌরী উনুনের দিক থেকে চোখ ফেরাল। এই রাত করে বুঝি ওসব কথা বলতে আছে!

—বিশ্বাস কর, একটুও বানিয়ে বলছি না। এক নৌকো বোঝাই লোকের ভিতর থেকে টুক করে একজনকে ঠিক তুলে নিয়ে গিয়েছিল বাঘে।

—ফের ওই কথা। দোহাই ঈশানদা, খারাপ কথা আর শুনতে ভাল লাগে না। এবার অন্য কথা বল।

লক্ষ্মণ টিপ্পনি কাটল, বাঘ কিন্তু মানুষ চেনে। সবাইকে ছোঁয় না।

ঈশানের হাত-পা কেমন নিশপিশ করে উঠল। লোকটার চোয়াল জুড়ে একটা ঘুষি চালিয়ে দিলে যেন শান্তি হয়। বলল, রাতে দুবার একবার বাঘের ডাক শোনা গেলেই বোঝা যাবে হিম্মত কত।

গৌরী মাটির হাঁড়ির ঢাকনা খুলল, ভাত ফুটেছে কিনা দেখার জন্য হাতা ডোবাল।

ঈশান আবার প্রশ্ন করল, তোমাদের ঘোষবনে বাঘ পড়ে না কখনো?

লক্ষ্মণ একটা বিড়ি ধরাল, আমাদের পাদরিপাড়ায় যদি ভুলে বাঘ ঢুকে পড়ে আমরা তাকে খ্রীস্টান বানিয়ে ছাড়ব।

—তা অবশ্য তোমরা পার। গৌরী হাসতে হাসতে বলল, তোমরা যাকে ছোঁবে, সেই শেষ পর্যন্ত খ্রীস্টান হয়ে ফিরে আসবে।

কথাটার মধ্যে কিছুটা শ্লেষ মেশানো আছে কিনা ধরা গেল না। লক্ষ্মণ সঙ্গে

সঙ্গে পাল্টা দিল, খ্রীস্টান তো আর খারাপ কিছু না, তুমি যে খ্রীস্টান হয়েছ, এতে তোমার লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে ?

—বুঝতে পারি না। কেমন অসহায় ভঙ্গিতে তাকায় গৌরী।

লক্ষ্মণ থ হয়ে তাকিয়ে থাকে। পাদরিপাড়া থেকে বেরিয়ে এসেই বলছ, বুঝতে পার না। অথচ ঐ পাদরিপাড়ার জন্যই তোমার জীবন বেঁচেছে। এখনো তোমার বুকে যীশু খ্রীস্টের ক্রুশ আঁকা লকেটটা চকচক করছে।

নিজের অজান্তেই বোধহয় লকেটের উপর আঙুল উঠে এল গৌরীর। কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ও। লকেটটা বড়দিনের উপহার হিসেবে লক্ষ্মণই ওকে দিয়েছে।

লক্ষ্মণ যেন আরো কিছু কথা শোনাতে পারলে খুশি হয়, বলল, ভাগ্যিস তুমি দুর্লভদার মতো মানুষের হাতে পড়েছিলে! ভাগ্যিস ভগবান যীশু তোমার উপর সদয় ছিলেন, নইলে কে তোমায় বাঁচাত বল দেখি।

—দুর্লভদার মতো মানুষ হয় না। বিড়বিড় করে গৌরী।

—আর ফাদার ?

ফাদারও খুব ভাল। তুলনা হয় না।

ঈশান চুপ করে বসে থাকে। বুঝতে পারে ওর এক্তিয়ার-বহির্ভূত কথা হচ্ছে। ফলে নীরব হয়েই থাকতে হয় ওকে।

লক্ষ্মণ পরিস্থিতিটা সহজ করার জন্য বলল, ঠিক আছে, ঈশানভাইকে একবার পাদরিপাড়া দেখিয়ে আনব, তাহলেই হবে। ঈশানভাইয়ের কেমন লাগে তখনই জানা যাবে।

ঈশান বলল, আমার কিন্তু সত্যি সত্যি একবার দেখে আসতে ইচ্ছে করছে। এই জঙ্গলের ভিতর দিনের পর দিন আর ভাল লাগে না।

লক্ষ্মণ বলল, ঠিক আছে, আমরা বিষ্ণাপুরী থেকে ফেরার পথে না হয় তোমাকে তুলে নিয়ে যাব এখান থেকে। কি বল গৌরী, সেটাই ভাল হবে না ?

গৌরী বলল, এখনই ওকে নিয়ে যাওয়া যায়। মা ওকে দেখলে খুব খুশি হবে।

ঈশানের চোখমুখ উৎসাহে ঝলসে উঠল।

লক্ষ্মণ বলল, বিষ্ণাপুরী গেলে তোমার মা যে আমাদের ভাল চোখে দেখবে, এমন নাও হতে পারে। তার উপর আবার তুমি খ্রীস্টান হয়ে গেছ।

গৌরী বলল, তাতে কি ?

—তাতে কি মানে। তোমাদের ওটা হচ্ছে হিন্দু গাঁ। যতই বলো বাপু, আমাদের ভাল চোখে দেখার কথা নয়।

গৌরী বলল, মা আমাকে দেখলে খুব খুশি হবে। আর তোমরা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ জানলে তোমাদের ওপরও খুশি হবে।

—হলেই ভাল। তবে ঈশানভাইকে আবার এই ঝামেলার মধ্যে না টানাই উচিত। আমরা ওখান থেকে ফেরার পথেই বরং ওকে পাদরিপাড়ায় নিয়ে যাব।

ঈশানের বলতে ইচ্ছে হল, না না, আমিও সঙ্গে যাব তোমাদের। বিপদ হয় আমারও হোক। কিন্তু বলতে পারল না। ওরা না চাইলে গায় পড়ে যাওয়াটাও উচিত নয়। পরমুহূর্তেই ওর মনে হল, এই লক্ষ্মণই ওদের মাঝখানে জুটে গিয়ে সবকিছু ভণ্ডুল করে দিতে চাইছে। গৌরীর ইচ্ছে থাকলেও লক্ষ্মণই আপত্তি তুলছে ওকে সঙ্গে নেওয়ায়। লোকটার মতলব যে কি কে জানে।

লক্ষ্মণ বলল, আমরা কষ্ট পাই, ঝাঁটা-লাথি খাই, কিছু যায় আসে না, কিন্তু ঈশানভাইকে তার মধ্যে মিছিমিছি না জড়ানোই উচিত।

গৌরী আর তর্ক করতে চাইল না। এই মাস দুই ও মা-ছাড়া। কি কুক্ষণেই যে ও বেরিয়ে পড়েছিল। মায়ের জন্য যে একদিন এমন করে ওর মন পুড়বে কে ভাবতে পেরেছিল তখন। মাও নিশ্চয়ই গৌরীর জন্য সারাদিন সারারাত আকুল হয়ে কাঁদে। যাকে তো কোনোদিন দেখেনি এরা, চিনবে কি করে। বুঝবে কি করে মায়ের কথা। গৌরী বাড়ি ফেরায় গ্রামের লোকগুলি যদি ঝগড়া করতে আসে। গ্রামের লোকগুলি যা হিংসুটে, সত্যি সত্যি ওরা যদি টিকতে না দেয় ওকে। চলে আসবে গৌরী। চাই কি আবার পাদরিপাড়াতেই ফিরে যাবে। ফাদারকে গিয়ে সবকিছু খুলে বলবে গৌরী।

—কি হল ? চুপ করে গেলে যে ? লক্ষ্মণ প্রশ্ন করল।

গৌরী বলল, কি বলব ?

—বলব মানে, আমি তোমাকে এখনো সব কিছু ভেবে দেখতে বলছি গৌরী। বিষ্ণুপুরী গেলে কপালে কি আছে তা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

গৌরী বলল, আমরা পাদরিপাড়া ছেড়েছি বিষ্ণুপুরী যাব বলে। তুমি না যেতে চাও আমি ঈশানদাকে বলব আমাকে নিয়ে যেতে।

লক্ষ্মণ ঈশানের দিকে তাকায়। শোন কথা, আমি কি যাব না বলেছি নাকি ? আমি কেবল খারাপ দিকগুলো মনে করিয়ে দিলাম। যাক গে, ওসব কথা থাক

গৌরী বলল, আমার কাছে ভালও যা খারাপও তা।

ঈশান বলল, দরকার হয় আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি গৌরী। আমার তো সারাক্ষণ বিপদ নিয়ে বেঁচে থাকা, আমার ক্ষতি হবে না।

—না না, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না ঈশানভাই। পাদরিপাড়া ছেড়ে

যখন বেরিয়ে পড়েছি তখন আমিই পারব। পরমুহূর্তেই লক্ষ্মণের মনে হল এসব আলোচনা এ সময় না করাই ভাল। শত হোক ঈশান বাইরের লোক। দুজনের মধ্যে ঈশান এসে জুড়ে বসবে এটাও উচিত নয়। হেসে প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য বলল, আমরা বরং দু-একদিন এখানে থেকে বিশ্রাম করে যেতে পারি। কি? আপত্তি নেই তো ঈশানভাই?

ঈশান বলল, দু'দিন কেন, যতদিন ইচ্ছা থাক না, তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

লক্ষ্মণ বলল, তাছাড়া বিদ্যাপুরী যেতে হলে কোনদিকে যেতে হবে সেটাও আগে জেনে নেওয়া দরকার। বিদ্যাপুরী কোথায় কেউ জানে কিনা আগে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

গৌরী বলল, এখান থেকে দিন তিনেকের পথ। আগেরবার তিনদিনের মধ্যেই এখানে এসে হাজির হয়েছিলাম।

—চেনা থাকলে তিনদিনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসা যায়, চেনা নেই বলেই ঝামেলা।

—পাদরিপাড়া থেকেই খোঁজখবর করে বেরোনো উচিত ছিল তোমাদের। আমাদের এখানকার কেউ এসব অঞ্চলের খুব একটা খোঁজ রাখে না।

গৌরীর চোখদুটো কেমন ম্লান হয়ে এল, পাদরিপাড়ায় খোঁজ নেওয়ার কোনো উপায় ছিল না ঈশানদা। আমরা কিভাবে বেরিয়েছি, তা আমরাই জানি।

—কেন, আসতে দিচ্ছিল না বুঝি?

—সে সব কথা এখন থাক ঈশানদা। ভাত নেমে গেল, এবার খেয়ে নাও দেখি। কাল বরং তোমাকে সব বলব। হঠাৎ জলের কুঁজোয় চোখ পড়তে গৌরী বলল, এই রে, জল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কাল কিন্তু এক কুঁজো জল দিতে হবে ঈশানদা।

ঈশান একটা পাতা বিছিয়ে বসে পড়ল, নিশ্চয়ই দেব। আমাদের মিষ্টি জলের গড় আছে। ওখানেই কাল তোমরা স্নান-টান সেরে নিতে পার। আমি যতক্ষণ আছি এ জায়গাটাকে নিজেদের মতো করে ভেবে নিও।

লক্ষ্মণ রসিকতা করার চেষ্টা করে, তার মানে এখানেই আমরা পাকাপোক্ত ঘরবাড়ি বানিয়ে বসে পড়তে পারি আর কি, কি বল।

গৌরীর এই প্রসঙ্গটা একেবারেই ভাল লাগছিল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

ঈশান বলল, আপত্তি নেই।

কিন্তু বুকের ভেতর একটা কাঁটার মতো বিঁধতে শুরু করল, এই শালা লক্ষ্মণ লোকটাকে যে কিভাবে যোগাড় করল গৌরী কে জানে। ওরা কি স্বামী-স্ত্রী। যদি স্বামী-স্ত্রীই হবে কপালে সিঁদুর নেই কেন?

গৌরীর সিঁথির দিকে চোখ পাতে ঈশান। স্পষ্ট সিঁথির রেখা দেখা যাচ্ছে, কোনো কালে ওখানে যে সিন্দুর ছোঁয়ানো হয়নি তাতে ভুল নেই। তবে কি খ্রীস্টানরা সিন্দুর পরে না। কোনো একটা খ্রীস্টান বউয়ের মুখ মনে আনার চেষ্টা করল ঈশান, মনে পড়ে না।

—আমাদের এখানে লোকেরও অভাব আছে। জঙ্গলের সঙ্গে কষ্ট করে কেউ যদি থাকতে চায় অনায়াসে থাকতে পারে।

গৌরী বলল, তুমি লক্ষ্মণদা থাকতে চাও, থাক; আমি নেই। বিন্ধ্যাপুরী আমি একাই যাব।

লক্ষ্মণ হোহো করে হাসল, তা যা বলেছ।

ঈশান আবার তাকাল গৌরীর দিকে। স্বামী-স্ত্রী হলে একজন আর একজনকে দাদা ডাকবে কেন। কেমন ঘোলাটে হয়ে এল দৃষ্টি। তবে কি ওরা অভিনয় করছে, কি জানি।

বাইশ

রাত্রি তখন কয়েক প্রহর অতিক্রান্ত। ডিঙি নৌকোয় চতুর্দিকে প্রচণ্ড এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ঈশান ডিঙি ছেড়ে অলস ভঙ্গিতে নেমে কাছারিবাড়ির দিকে চলে গেছে বহুক্ষণ আগে। যতক্ষণ ঈশান এখানে বসে গল্প করে গেছে, গৌরী যেন নিশ্চিন্ত ছিল। ঈশান চলে যাওয়ার পর গৌরী মনে করতে পারল, আজ দ্বিতীয় রাত। গতকাল সন্ধ্যার পর পাদরিপাড়া থেকে গোপনে নৌকোয় এসে উঠেছিল ওরা। সমস্ত শরীরে তখন প্রচণ্ড এক অবসাদ। না জানি আবার কোন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে গা ভাসাতে হল। ভয়ে আতঙ্কে সারাটা রাত ওর বিভীষিকার মধ্যে কেটেছে। নৌকোয় উঠে ছইয়ের এক পাশে কম্বল চাপা দিয়ে জবুথবু হয়ে বসে পড়েছিল গৌরী। সেইভাবে ঠায় সারাটা রাত বসে থাকল। বসে বসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে দেহের অবসাদ যতটা পারল কাটিয়ে নিল। লক্ষ্মণ অতি আগ্রহে কতবার এগিয়ে এসেছে, গৌরী অজানা এক উত্তেজনায় ভাল করে কথাও বলতে পারেনি ওর সঙ্গে।

লক্ষ্মণ বলেছে, ভয় পড় না গৌরী, বেরিয়ে যখন পড়েছি আর তো ফেরার উপায় নেই, এখন আর ভাবনা করে লাভ কি।

গৌরী বলেছে, আমার ঘুম পায়নি। ঘুম পেলেই আমি শোব। পরক্ষণেই বলেছে, ফাদার নিশ্চয়ই এতক্ষণ আমাদের খোঁজ শুরু করে দিয়েছেন, তাই না লক্ষ্মণদা?

লক্ষ্মণ নৌকো বাইতে বাইতে হেসেছে, পাদরিপাড়ার জন্য যদি এতই দুশ্চিন্তা তাহলে বেরুলে কেন? তোমরা যে কখন কি ভাব, কিছুই বুঝতে পারি না।

গৌরী বলেছে, ফাদারকে কষ্ট দিতে বুঝি ভাল লাগে?

—তবে বেরুলে কেন? আমি তো বারবার তোমাকে বলেছিলাম, আর কিছুদিন কাটিয়ে ফাদারকে জানিয়ে শুনিয়েই সব কিছু করা যেত।

ফাদার যে কিছুতেই গৌরীকে পাদরিপাড়া ছাড়তে দেবেন না, এটা গৌরীর অজানা নয়। বলেছিল, কি করা যেত? ফাদার রাজি হতেন বুঝি?

লক্ষ্মণ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, নিশ্চয়ই রাজি হতেন। আমরা দুজনে যদি একসঙ্গে গিয়ে ফাদারকে বলতাম, ফাদার, আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি, নিশ্চয়ই উনি বাধা দিতেন না।

গৌরী কেমন বিরক্ত হয়েছিল মনে মনে, এখন ভালবাসাবাসির কথা কে ভাবছে। বিয়ে করতে হলে পাদরিপাড়া থেকে পালাবার দরকার ছিল না। কিন্তু গৌরী পালিয়ে এসে নৌকোয় উঠেছে অন্য কারণে, তা হচ্ছে মায়ের দেখা পাওয়া, বিদ্যাপুরীতে ফিরে যাওয়া। নিমাইয়ের সঙ্গে বিদ্যাপুরী থেকে পালিয়ে যে অন্যায় করেছিল ও, সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করা।

গৌরী পরিষ্কার বলেছিল, তুমি কিছু মনে করো না লক্ষ্মণদা, ওসব কথা এখন আমি একদম ভাবছি না। বিদ্যাপুরীতে মায়ের কাছে ফেরার পর মা যা বলবে তাই হবে।

লক্ষ্মণের মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, এরকমই যদি ইচ্ছে তা হলে আমাকে টেনে আনলে কেন? তোমার মা যদি আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে রাজি না হন?

—কেন, রাজি হবে না কেন?

—নাও তো হতে পারেন। আমার সম্পর্কে উনি কিছুই জানেন না। তাছাড়া আমি তো আর হিন্দু নই। আমি খ্রীস্টান।

—আমিও খ্রীস্টান।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লক্ষ্মণ বলেছিল, কি জানি, হিন্দু খ্রীস্টান তো গায়ে লেখা

থাকে না, তুমি যদি অস্বীকার করো, শেষপর্যন্ত আমিই একটা বিপদের মধ্যে পড়ে যাব।

—না গো, না। গৌরী সান্ত্বনা দিয়েছিল, তেমন কিছু হবে না। মাকে আমি ঠিক রাজি করিয়ে নেব। মা যদি রাজি না হয়, তখন তুমি যা বলবে তাই করব।

রাতে বার কয়েক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে গৌরীকে কাছে পাওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিল লক্ষ্মণ। প্রতিবার ফুঁপিয়ে উঠেছিল গৌরী। না লক্ষ্মণদা, তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে ছুঁয়ো না।

—কেন? লক্ষ্মণ ফুঁসে উঠেছিল মাঝে মাঝে, তার মানে তুমি আমাকে চাও না। আমাকে তুমি বিশ্বাসই কর না। অথচ বিদ্যাপুরী থেকে যখন তুমি পালিয়ে এসেছিলে, সঙ্গে তোমার নিমাই ছিল। তুমি নিমাইয়ের সঙ্গে তো রাত কাটিয়েছ।

—হ্যাঁ কাটিয়েছি। নিমাইদা আমাকে কলকাতা দেখাবার লোভ দেখিয়েছিল। কিন্তু নিমাইদা কখনো তোমার মতো এরকম করেনি।

—অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না।

—তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মণদা। বিশ্বাস করো, নিমাইদা আমাকে বোনের মতো দেখত। নিমাইদা আমাকে বলেছিল, কালিঘাটে নিয়ে যাবে। সেখানে মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে আমি যদি ইচ্ছে করি, তবেই আমাদের বিয়ে হবে। কিন্তু একটা রাত পেরতে না পেরতেই আমার জ্বর হল। জ্বরে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। আমার সারা গায়ে গুটি বেরল। আমার যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখি, নিমাইদা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি একা। মানুষকে আমি আর বিশ্বাস করি না লক্ষ্মণদা।

—তার মানে আমাকেও বিশ্বাস কর না?

গৌরী ভেজা গলায় বলেছিল, না লক্ষ্মণদা, তোমাকে আমি অনেক বেশি চিনি। নিমাইদাকে আমি তেমন করে জানতাম না। কলকাতা থেকে হঠাৎ ও এল, ওর গল্প শুনতে শুনতে আমি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম। তখন ভাববার সময় ছিল না, নিমাইদা কতটা আসল, কতটা নকল।

—আমি কিন্তু একদম নকল নই গৌরী। বিশ্বাস করো, তোমাকে ছাড়া আর আমি বাঁচতেই পারব না। তোমাকে দেখার পর থেকেই জীবনটা আমার অন্যরকম হয়ে গেছে।

গৌরী বলেছিল, লক্ষ্মণদা, তোমাকে আমি কোনোদিন কষ্ট দেব না, শুধু একবার আমাকে বিদ্যাপুরীতে নিয়ে চল। তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মণদা, এ'কটা দিন আমাকে একা থাকতে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

লক্ষ্মণ আর বিরক্ত করেনি ওকে। শুধু বলেছে, তুমি ঘুমুচ্ছ না, তোমার কিন্তু শরীর খারাপ লাগবে।

গৌরী সারা রাত ঠায় বসে কাটিয়েছে কাল। সারা রাত ছলছল জলের শব্দ, সারা রাত প্রচণ্ড হিমের আক্রমণ। চোখ জুড়ে এসেছিল মাঝে মাঝে, আচ্ছন্নের মতো রাত্রিটা ওর কেটে গেছে।

আজ ঈশান চলে যাওয়ার পর মনে হল, আবার একটা ভয়ানক রাত্রি এল। ছইয়ের ভেতর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। নিভু নিভু করে দেওয়া হয়েছে আলো। তেল ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে লক্ষ্মণ ওটাকে নিভিয়েই দিতে চেয়েছিল, গৌরীই সাহস পায়নি নেভাতে।

আজও গৌরী ছইয়ের এক কোণে পা ছড়িয়ে সারা দেহে কম্বল জড়িয়ে বসল। সারাদিনের উত্তেজনা আর গতকালের রাত্রি জাগরণে শরীরে এখন প্রচণ্ড ক্লান্তি। পা ছড়িয়ে ছইয়ের গায়ে পিঠটাকে এলিয়ে রাখার চেষ্টা করে গৌরী। সামনেই লক্ষ্মণ চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। অদ্ভুত চোখে গৌরীর দিকে তাকিয়ে আছে লক্ষ্মণ।

গৌরী দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা এলিয়ে দিল। লক্ষ্মণ না ঘুমনো অবধি এইভাবেই ওকে বসে কাটাতে হবে? লক্ষ্মণের চোখদুটো এখন অসম্ভব ধারালো, ওদিকে তাকাতে সাহস হয় না গৌরীর।

স্তব্ধভাবে আরো বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

লক্ষ্মণ শব্দ করে পাশ ফিরল, তারপর কি খেয়াল হওয়ায় আবার উঠে বসল।

—তাহলে সত্যি সত্যি তুমি শোবে না? এইভাবে বসে থাকলে কার ভাল লাগে?

গৌরী উত্তর করল না। যেন শুনতেই পায়নি, এমন ভাব করল।

—কি হল? সারা রাত এইভাবে বসে কাটাবে? আমাকে যদি এতই ভয় তাহলে না বেরুলেই হত।

—তুমি ঘুমোও না। আমার ঘুম এলেই আমি শুয়ে পড়ব।

লক্ষ্মণের গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ল, ছেলেমানুষীর একটা সীমা থাকা দরকার। তুমি এইভাবে বসে বসে কষ্ট পেলে আমি ঘুমোই কি করে। হঠাৎ একটা হাত গৌরীর দিকে এগিয়ে দেয় লক্ষ্মণ।

বুকের ভিতর প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ল যেন। হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় গৌরী।

—কি হল ? লক্ষ্মণের চোখদুটো যেন জ্বলছে। শোবে কিনা বল ? আবার হাতটাকে এগিয়ে দিল লক্ষ্মণ।

আবার হাতটাকে ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল গৌরী। বসতেও দেবে না দেখছি। তুমি শোও না।

—না আমি শোব না। লক্ষ্মণ আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে।

গৌরী নিজেকে আরো গুটিয়ে ধরল, তুমি মিথ্যে কথা বলেছ কেন ? সরাসরি এবার আক্রমণ করল গৌরী।

—মিথ্যে কথা ? কখন, কোথায় ? কেমন একটু হকচকিয়ে গেল লক্ষ্মণ, মিথ্যে কথা বলেছি ?

—বিন্ধ্যাপুরী কোথায় তুমি জান না, অথচ একথাটা কেন বলনি আমাকে ? কেন ?

—উরে ব্বাস। এই জন্য এত রাগ। বিন্ধ্যাপুরী তোমায় পৌঁছে দিলেই তো হল।

—তুমি বলেছিলে দু'দিনের মধ্যেই আমাকে পৌঁছে দেবে। অথচ—

—দু'দিনের জায়গায় না হয় তিন দিন হবে। বিন্ধ্যাপুরী ঠিক আমি চিনে নেব, আর তোমাকেও পৌঁছে দেব।

—বিন্ধ্যাপুরী না পৌঁছনো অবধি তুমি আমায় ছোঁবে না। আরো ছোট হয়ে বসার চেষ্টা করে গৌরী।

লক্ষ্মণ পাথরের মূর্তির মতো তাকিয়ে রইল গৌরীর দিকে। তারপর বলল, বেশ ছোঁব না। আমি বরং বাইরে হিমের মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকি।

গৌরী কোনো উত্তর করল না।

—আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না। অথচ যীশুর নামে তুমি প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছ, মনে আছে ?

—তোমাকে আমি হিমের মধ্যে যেতে বলিনি। এখানে আমার বসে থাকায় যদি তোমার অসুবিধা হয়, আমিই বরং বাইরে গিয়ে বসি।

লক্ষ্মণ জোড় হাত করল, ঠিক আছে তুমি বোস। আর তোমাকে বিরক্ত করব না। বলতে বলতে লক্ষ্মণ পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকল। এবং ওইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

ছইয়ের বাইরে থেকে প্রবহমান নদীর জলের শব্দ এসে যেন ঘুমপাড়ানি আমেজ রচনা করে চলেছে। গৌরী আলতো করে চোখ বোজে, বিন্দু বিন্দু অসংখ্য আলোর বুদবুদ ওর চোখের সামনে ফুলঝুরির মতো উড়ে এসে দৃষ্টিগ্রাহ্য

জগৎটাকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে অসম্ভব এক ক্লান্তি গড়াচ্ছে। আরো বসে থাকতে কষ্ট হয় ওর।

তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল গৌরী, তারপর ধীরে ধীরে দেহটাকে ভাঁজ করে কাঠের পাটাতনে নামিয়ে দিল।

রাত্রি গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হতে শুরু করল।

ওদিকে বোধহয় একটু তন্দ্রামতো এসেছিল ঈশানের। হঠাৎ চমকে উঠল। মাতাল শুকদেবটা কি পা ছুঁড়ে দিয়েছে ওর গায়ে? না, তা তো নয়। তাহলে। আরো একটুক্ষণ সতর্কভাবে ও অপেক্ষা করল, না, কিছুই না।

অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরের গোলপাতার ছাউনির দিকে তাকিয়ে থাকে ঈশান। আজ সারাটি দিনই ওর কী ভীষণ এক উত্তেজনার ভিতর দিয়ে কেটে গেল। জীবনে যে আবার কখনো গৌরীর সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারেনি ও। কেবল দেখা নয়, গৌরীর নৌকোয় বসে খাওয়া-দাওয়া অবধি।

নৌকো থেকে যখন ফিরে এল, হাজার রকম প্রশ্নের মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল ওকে। ঈশান জানত, সবাই ওকে ছেঁকে ধরবে, প্রস্তুত হয়েই এসেছিল ও। গৌরীর হয়ে অনেক কথা বলার চেষ্টা করল ঈশান। বলল, না জেনে-শুনে মানুষ সম্পর্কে অনেক কথাই রটানো যায়, আমি কিন্তু হলপ করে বলতে পারি, গৌরী ওরকম নয়।

—রজনীভাই তাহলে রাগ করছে কেন? রজনীভাই কি তাহলে মিথ্যে বলছে?

—মিথ্যে ছাড়া কি? অসুখবিসুখ কার না হয়, অসুখ হলেই যে ডাইনী হয়ে যাবে এমন কথা নয়।

—কিন্তু সেবার তো ওর জন্যই—

কথা শেষ করতে দিল না ঈশান, বাজে কথা। তাছাড়া, সেবার না হয় ও অসুখ ছড়িয়ে গিয়েছিল, এবার কি ছড়াবে?

যে তর্ক করছিল সে থেমে গেল।

ঈশান বলল, তাছাড়া আমি তো এতক্ষণ ওর সঙ্গে বসে গল্প করে কাটিয়ে এলাম, ওর রান্না করা ভাতও খেয়ে এলাম, তোরাই দেখ না, যদি কিছু হয় আমারই হবে।

একথা শোনার পর অনেকেই জটিল ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায়। মেয়েটা খারাপ না ভাল সে প্রশ্নের বিচার করবে কে?

কে একজন বলল, মেয়েটার চেহারা দেখে কিন্তু ডাইনী বলে মনে হয় না, কিন্তু ওর চোখের চাউনিটা ভাই অন্যরকম।

—কি রকম ?

—তখন কেমনভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল, দেখিসনি ?

ঈশান প্রতিবাদ করতে পারত, কিন্তু ঝামেলা বাড়াতে চাইল না। বেশ রাত হয়ে গেছে। ঘোর অন্ধকার হয়ে আছে আকাশটা। সত্যি সত্যি শেষপর্যন্ত বাদলা নামবে কিনা কে জানে! এই অসময়ে বৃষ্টি হলে আবার হয়তো ঝামেলায় পড়তে হবে।

হরিণটার কাছাকাছি এগিয়ে এসে ঈশান দেখল, পায়ে চুনহলুদ লাগিয়ে পটি বাঁধা হয়ে গেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

হরিণটাকে আবার ও জড়িয়ে ধরে আদর করল। আদর করতে করতে মনে হয়েছিল, হরিণটা যেন সারাক্ষণ ধরে কাঁদছে, ওর চোখদুটো বড় করুণ।

—এই বোকা, কাঁদছিস কেন! গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল ঈশান। নরম ভেলভেটের মতো গা, হাতের চেটো শিরশির করে উঠেছিল। পায়ের দিকে ঝুঁকে আরো খানিকটা পরীক্ষা করে নিল ও, পাটা কি দুর্বল হয়ে পড়েছে! বিকেলে তো ওই চোট খাওয়া পায়েই ও লাফাচ্ছিল। কী জানি শেষপর্যন্ত খোঁড়াই হয়ে যায় কিনা।

হরিণের গলার কাছে হাত বোলাতে বোলাতে কাল্পনিক কিছু সংলাপ শুরু করে দিয়েছিল ঈশান, জানিস, আজ আমার কত বড় আনন্দের দিন! আজ গৌরী এসেছে নদীর ঘাটে। তখন দেখলি না, সবাই ছুটোছুটি করছিল ঘাটের দিকে। কেউ কি ভাবতে পেরেছিল গৌরী আবার ফিরে আসবে! এক রজনীই কেবল ওর আসার জন্য গোলমাল পাকাতে চাইছে। খবরদার, তুই কিন্তু রজনীর কথা একদম বিশ্বাস করিস না। রজনী কিন্তু তোকে একা পেলে মেরেও ফেলতে পারে। ও না পারে হেন কাজ নেই।

কি ? শুনছিস তো ? ঈশান জড়িয়ে ধরে আদর করল, আবেগে একটা চুমুও খেয়ে বসল হরিণটাকে। তারপর তার কিছু করার নেই দেখে ধীরে ধীরে ঘরের দিকে ফিরে এল।

শুকদেবটা আজ অনেক রাত ধরে আবোল-তাবোল বকেছে। শেষপর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়েছে। শুকদেবের পাশেই শোয়ার জায়গা ঈশানের।

ঈশান অন্ধকারে একবার শুকদেবের শোয়ার ভঙ্গিটা দেখার জন্য চোখ নামাল। দেখা যায় না। কেবল জোরে জোরে শ্বাস টানার শব্দ পেল ঈশান। নাহ্, আজ

বোধহয় সারাটা রাতই জাগতে হবে ঈশানকে। এত উত্তেজনায় কখনো ঘুম আসে!

ঈশান অনুমান করার চেষ্টা করল, গৌরী কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে! আর সঙ্গের ওই লোকটা। লোকটার সঙ্গে কী সম্পর্ক গৌরীর। কেন ওরা অমনভাবে নৌকো করে এল। ওরা কি স্বামী-স্ত্রী! স্বামী স্ত্রীই যদি না হবে তাহলে এই রাত্রি করে ওরা এক নৌকোয় পাশাপাশি কাটাচ্ছে কি করে! তবে কি গৌরীরও সমর্থন আছে এ ব্যাপারে, নইলে সাহস পাচ্ছে কি করে লোকটা! কাল সকালে সরাসরি গৌরীকে জিজ্ঞেস করব! এমনও তো হতে পারে গৌরীকে বিষ্ণাপুরীর নাম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার ফন্দি আছে লোকটার। বেচারি গৌরীর এ সব চালাকি ধরবার হয়তো ক্ষমতাই নেই।

নাহ্, বেশ কিছুক্ষণ অস্বস্তি বোধ করে ঈশান। কাল সকালেই একটা হেস্ত-নেস্ত করতে হবে। কাল সকালেই। আবার ও পাশ ফিরল। কিছুক্ষণ পর বোধহয় একটু তন্দ্রা মতোই এসেছিল ওর।

হঠাৎ আবার তন্দ্রার রেশটা কেটে গেল। তবে কি হরিণটারই কিছু হল। বাইরে দাওয়ায় ওকে বেঁধে রাখা হয়েছে। হরিণটা কি পায়ের যন্ত্রণায় এখনো ছটফট করছে! ঈশান আর শুয়ে থাকতে পারল না। উঠে অন্ধকারে কুড়াল হাতড়াতে শুরু করল। শুকদেবকে ডাকার প্রয়োজন মনে করল না। হ্যাঁ, কুড়ালটা পাওয়া গেছে। ঈশান ঘরের ঝাঁপি খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ওই তো, ওই তো হরিণটা! কিন্তু অমন করছে কেন ওটা! লাফিয়ে দড়ি ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে পড়তে চাইছে। কেন, অমন করছে কেন?

চারপাশে তাকাল ঈশান। তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। অন্যান্য দিনের তুলনায় কুয়াশা কিছু কম। জঙ্গলের দিকটা ঘোর কালো। আলকাতরার মতো কালো। কেমন দমচাপা স্তব্ধতা লুকিয়ে আছে ওদিকে। অন্ধকার আর জঙ্গলটাকে জীবন্ত মনে হল ঈশানের। মনে হল, ভীষণ হিংস্র একটা জীব যেন কিছুদূরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। একটু সুযোগ পেলেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের উপর। গাটা কেমন ছমছম করে উঠল ঈশানের।

হাতের কুড়ালটাকে ও চেপে ধরল। কিন্তু সামান্য এই কুড়াল দিয়ে কি অন্ধকার দৈত্যটাকে ঠেকানো যাবে! কুড়াল সমেত হাতটা ওর থরথর করে কেঁপে উঠল। আকাশটা অনেক পরিষ্কার মনে হল। দুটি একটি নক্ষত্রও যেন ফুটে উঠেছে। ওগুলো নক্ষত্রই তো, নাকি দূরে ওই যে আগুনের কুণ্ডলী জ্বলছে তার ফুল উড়ে আকাশে ভাসছে। ঠিক ধরতে পারল না ঈশান কি ওগুলো।

আগুনের কুণ্ডলী থেকে গলগল করে ধোঁয়া উঠছে। অসংখ্য পোকা এসে ঘিরে ধরেছে আগুনকে। আলোর পোকা আর ধোঁয়ায় এখন মাখামাখি।

হরিণটার কাছে এগিয়ে এল ঈশান। গায়ে হাত রাখল, শিরশির করা হরিণের কাঁপুনি ওর সারা গায়ে বিছিয়ে পড়ল।

—আহ্, আহ্। কী হয়েছে রে? কী দেখেছিস? অমন করছিস কেন?

দড়ি খুলে হরিণটাকে আলগা করে দিল ঈশান। হরিণটাও ঈশানের গায় গায় সেঁটে এসে দাঁড়াল। কৌতুকে ঈশান ওকে আরো কাছে টেনে নিল।

—কি হয়েছে বল না? ভয় পাচ্ছিস? আচ্ছা ঠিক আছে, আয়, তোকে ঘরে নিয়ে যাই, আয়।

হরিণটাকে পাঁজাকোলা করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ঈশান। ঝাঁপিটাকে পায়ে ঠেলে বন্ধ করে হরিণটাকে একপাশে নামিয়ে রাখল।

—বোস এখানে। আহ্, দাঁড়া না।

আর একটু হলে হরিণের ধাক্কায় শুকদেবের ওপরই পড়ে যাচ্ছিল ও। সামলে নিয়ে একপাশে টেনে সরিয়ে আনল হরিণটাকে, তারপর দড়িটাকে শক্ত করে বেড়ার খুঁটির সঙ্গে বাঁধল। বোস। ভয় নেই, ঘুমো।

হরিণের পিঠে হাত বুলিয়ে ঈশান ফিরে এল নিজের শোবার জায়গায়. পুরু খড়ের ওপর একটা কম্বল বিছানো, ঈশান হাত পা ছড়িয়ে তার উপর শুয়ে পড়ল। এবার যদি ঘুমানো যায়।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা শোরগোল উঠল, বাঘ বাঘ!

—কোথায় বাঘ, কোথায়?

লাঠি, কুড়াল, খন্তা যে যা পারল হাতে নিয়ে ছুটে এল উঠোনে, কোথায়? কোথায় বাঘ?

চারপাশে তখন থমকে থাকা কুয়াশা। দূরের জঙ্গলে পাখপাখালির কলরব। রাতের মতো জঙ্গলটা এখন আর অত ভয়াল নয়। বরং সবুজ সতেজ গাছপালার চেহারা দেখে এখন অন্তরকমই মনে হয়। কোথায় বাঘ।

উঠোনের নরম মাটিতে কয়েকটা বড় বড় পায়ের ছাপ। ছাপগুলো ঘিরে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ। নির্ঘাত বাঘের পা। বাঘ এসেছিল রাতে।

ঈশানও কৌতুকে দেখল, হ্যাঁ বাঘেরই পায়ের ছাপ ওগুলো। রাতে তাহলে সে সময় বাঘই এসেছিল। হরিণটা কি তাই অত ছটফট করে দড়ি ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।

হরিণটাকে যখন তুলে ঘরে নিয়ে এল ও, তখনো কি বাঘটা ধারেকাছেই ছিল। কি জানি কিছুই বুঝতে পারল না ঈশান।

চকিতে ভেড়ির দিকে তাকাল। ওদিকে এখন ভিন্ন চেহারা। ভেড়ির মাটি সপসপ করছে জলে ভেজা। বৃষ্টি হয়নি তবু রাতের কুয়াশাতেই ভিজে অমন হয়ে আছে মাটি। ও মাটির ওপর দিয়ে হাঁটলে পায়ের তলায় চাপচাপ মাটির চলটা উঠে আসবে।

ঈশান রূপোলি পাতের মতো ভেড়ির মাটির দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবল, তারপর কাউকে কিছু না বলে ছুটতে শুরু করল ওদিকে। গৌরী ভাল আছে তো!

তেইশ

মুখগুলি থমথমে হয়ে ওঠে। আবার নতুন করে সবাই ভাবনায় পড়ে। ভাসানকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন বাঘের সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। সারাক্ষণ বাঘের ভয় থাকলেও ব্যাপারটা ক্রমশ সহজ হয়ে এসেছিল। আতঙ্ক কিছুটা কমে এসেছিল, কিন্তু সবাই জানত, মানুষের স্বাদ পাওয়া বাঘ কোনো না কোনো সময়ে আবার আসবেই, আবার কাউকে না কাউকে তুলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। গতকাল রাতে বাঘ যদি এই উঠোন অবধি এসে থাকে তাহলে বুঝতে হবে, বাঘ আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় একটাই মাত্র উপায়, তা হচ্ছে বাঘটাকে খতম করা।

রজনীই হাঁকডাক করে সবাইকে জড় করল, প্রস্তাব দিল, এখানেই যখন থাকতে হবে, জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তখন আর মিনমিন করলে চলবে না, বাঘ শিকারে যদি কারো অভিজ্ঞতা থাকে তার উচিত এখন এগিয়ে আসা।

এ ওর মুখের দিকে তাকায়। বাঘের মুখে পড়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে আসা এক জিনিস, আর বাঘ শিকার করা আর এক জিনিস। ঠিক শিকারী বলতে যাকে বোঝায় এমন কেউ যে এখানে আছে, তা মনে হল না।

মকবুলও কোমরের চোট নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘর থেকে দাওয়ায় এসে খুঁটি ধরে বসে পড়ে। রজনীর কথায় সমর্থন জানায়, বড় মিঞার সঙ্গে রফা চলে না গো। কেউ যদি বাঘ শিকারের সাহস রাখ তো বল?

জগন্নাথ বলল, জঙ্গলে কাজ করতে এসেছি, অথচ দু'একজন শিকারী আনার কথা কেউ ভাবলাম না। এখন ছাগল দিয়ে লাঙল চাষ করাও।

মকবুল বলল, যা হয়নি, হয়নি। এখন কি করা যায় সেটা ভাবো।

রসিকলাল বলল, রাতে পাহারা দেবার ব্যবস্থা কর। আমরা না হয় পালা করে করে এবার থেকে রাত জাগব।

প্রস্তাবটা খারাপ না। কিন্তু বাঘ শিকার করতে হলে আর একটু অন্যভাবে ভাবা দরকার। রজনী বলল, জঙ্গলের মধ্যে মাচা বানিয়ে সেখানে বসে পাহারা দিলে কিন্তু ফল পাওয়া যেতে পারে। কি বলিস?

রসিক বলল, বন্দুক নিয়ে জাগতে হবে।

—সবাই বন্দুক চালাতে জানে না।

—যারা জানে তেমন কাউকে কাউকে থাকতে হবে।

জগন্নাথ বলল, তোমরা মাচায় বসে থাকবে আর বড়ে মিঞা তোমাদের গুলি খাওয়ার জন্য কাছে আসবে, তাই না? বোঝা গেল, জগন্নাথ এই ঝামেলায় যেতে চাইছে না।

—আসতেও তো পারে। মকবুল বলল, তুমি ব্যবস্থা কর দেখি রজনীভাই। আমার কোমর ভাল থাকলে আমি রোজ মাচায় বসতাম।

এমন সময় শুকদেবকে দেখা গেল, গায়ে শুকনো খড়ি-মাটির মতো চকচক করছে নুন। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া পাখির বাসার মতো চুল। এখানে এসে অবধি কোনো দিন ও জলে গা ডুবিয়েছে কিনা সন্দেহ।

শুকদেবের মুখ দেখে মনে হল না ও ভয় পেয়েছে। ভয়ের কি। রাখে কৃষ্ণ মারে কে। শুকদেব সহজ ভঙ্গিতেই বলল, একবার একটা গান শুনেছিলাম,

আমরা আজি পোলাপান
গাজি আছে নিখাবান।

—ধুৎ। তুই থামবি? ধমক লাগাল রজনী। কাজের কথা যা হচ্ছিল, তাই হোক।

শুকদেব এত সহজে থামার পাত্র নয়। রজনীর ধমক খেয়ে যেন আরো উৎসাহ ওর বেড়ে গেল, বাঁচতে যদি চাও, তাহলে আমার সঙ্গে গান গাও রজনীভাই—

আমরা আজি পোলাপান
গাজি আছে নিখাবান!

মকবুল বলল, ওর কথায় কান না দিয়ে তুমি রজনীভাই জঙ্গলের মধ্যে দু-চার জায়গায় মাচা বানাবার বন্দোবস্ত কর দেখি, ও শালার ফুর্তি একদিন বেরুবে।

এমন সময় দীননাথের গলা পাওয়া গেল, শিকার করতে হলে টোপ দরকার।

কেবল মাচায় বসে থাকলেই হবে না। কাছাকাছি যদি একটা টোপ রাখা যায়, সেই টোপের লোভে বাঘ আসবে, আর তখন তাকে—

—বুদ্ধিটা খারাপ নয়। কিন্তু কি টোপ?

—বাঘের টোপ আর কি হতে পারে। একটা জন্তু জানোয়ার হলেই ভাল হয়।

রজনীর চোখে চট করে ভেসে উঠল ঈশানের ধরে আনা হরিণটা। ওটাকেই চমৎকার টোপ বানানো যেতে পারে। কিন্তু কথাটা এখনই জানাজানি হওয়ায় বিপদ আছে। রজনী বলল, ঠিক আছে, টোপ একটা যোগাড় করে নেওয়া যাবে। সে দায়িত্ব আমার। এখন কোথায় মাচা হবে সেটা ভাব।

—জঙ্গলে না ঢুকলে বুঝবে কি করে, কোথায় হবে। চল না বেলাবেলিই কাজটা সেরে নিই।

জগন্নাথ বলল, মাচা বানানো দু' মিনিটের কাজ। কিন্তু তুমি কোথা থেকে টোপ যোগাড় করবে শুনি?

রজনী বলল, যোগাড় করতে হবে না, কাছেই আছে।

—'কাছেই আছে' কথাটা আরো রহস্যময়, ভেঙে বল না। অত গোপন গোপন ভাব করলে চলে কখনো?

রজনী জগন্নাথের দিকে তাকাল, তারপর দাওয়ায় বাঁধা হরিণটাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। ওটা চমৎকার টোপ হতে পারবে।

—তার আগে দুটো একটা মাথা নেমে যাবে। ঈশান ওটাকে পুষবে বলে রেখেছে।

রজনী বলল, ঈশানের সঙ্গে আমি কথা বলব। কোথায় সে?

—ঈশান ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গেছে নদীর দিকে। আজ সারাদিন ওকে পেলে তো!

রজনী বলল, ওকে এবার আমি বিদেয় করব। ছোটকর্তার কাছে আজই আমি নালিশ পাঠাব। সেবার ওর জন্যই আমরা মরেছিলাম, এবারও মরব।

মকবুল ঈশানের প্রসঙ্গে আলোচনা বাড়াতে চায় না। বলল, আকাশটা যেমন থমথমে হয়ে আসছে, বৃষ্টিও নেমে বসতে পারে। তোমরা কাজটা আগেভাগেই সেরে এসো রজনীভাই।

আবার শুকদেবের গলা পাওয়া গেল,

আমরা আজি পোলাপান
গাজি আছে নিধাবান।

শুকদেবের এক হাতে একটা কুড়াল। জঙ্গল কাটার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়েছে ও। যাত্রা দলের পরশুরামের মতো ভঙ্গি করে শুকদেব এগিয়ে এল, চল, কোথায় মাচা বানাতে হবে, চল।

মকবুল বলল, যাও না হে, তোমরা দাঁড়িয়ে কেন? দা কুড়োল নিয়ে বেরিয়ে পড়।

রজনী ততক্ষণে তার বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। চল চল। আর দেরি নয়। ফিরে এসে কথা বলব, চল।

জনাতিরিশেক লোক তৈরি হয়ে গেল। হাতে হাতে দা কুড়াল লাঠি। হৈ হৈ করে শব্দ করে বনের দিকে ছুটল। বাঘ তো বাঘ, বাঘের বাবাও আসার সাহস পাবে না এ-সময়।

শ' পাঁচেক হাত দূরে জঙ্গলের দিকে এখন সতেজ একটা আভা। সারারাত শিশিরে ধুয়ে মুছে গাছ-গাছালি এখন চমৎকার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। তবু তো আজ রোদ ওঠেনি। রোদ উঠলে মনে হত, গাছগুলোকে যেন রঙের বালতিতে চুবিয়ে চুবিয়ে আবার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। টলটলে ওই কাঁচা রঙের ফোঁটা টুপটুপ করে বৃষ্টির ফোঁটার মতো গড়িয়ে পড়ত নিচে। সবুজের আভায় জঙ্গলের মাটিও হয়ে উঠত সবুজ।

প্রায় পাঁচশ হাত নির্মূল করা জঙ্গল এখন ফাঁকা মাঠের মতো। রজনী বোধহয় আজই প্রথম লক্ষ্য করল, এই জমিটুকুর উপর দিয়ে সরু সিঁথির মতো পায়ে চলা কয়েকটা রাস্তা হয়ে গেছে। বাকি অংশে গাছের গুঁড়ি আর আবর্জনার অন্ত নেই। গাছের গুঁড়িগুলো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে ফেলতে হবে। চাষবাস করার মতো জমি তৈরি করতে এখনো ঢের সময় লেগে যাবে ওদের।

হৈহৈ করে পুরো দলটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভেজা নরম মাটি পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উঠে আসছে। ঝাঁকি দিয়ে পায়ের মাটি ঝাড়তে হচ্ছিল মাঝে মাঝে।

জঙ্গলের মুখে এসে রজনী থমকে দাঁড়াল। বুনো লতাপাতার গন্ধ এসে নাকে লাগছে। বাঁদিকে বড় বড় কয়েকটা ঝোপ অনেকখানি জায়গা জুড়ে রহস্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওই রকম ঝোপের দিকেই বেশি করে নজরটা রাখা দরকার। কে জানে, ওরই মধ্যে বাঘটা এখন লুকিয়ে আছে কি না। কিন্তু দুর্বলতা প্রকাশ না করে রজনী চেঁচিয়ে বলল, আগে ঝোপগুলো উড়িয়ে দে দেখি।

দু-চারজন এলোপাথাড়ি কাটারি চালাতে চালাতে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাকিরা এগিয়ে এল ডান দিকে। যতদূর চোখ যায় সামনের দিকে নিরেট জঙ্গল। শক্ত মোটা মোটা বেশ কিছু তেজিয়ান গাছ। রজনী লক্ষ্য করল, বনের ভিতর ওরা

ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েক ঝাঁক পাখি লাফিয়ে উঠেছে। পাখিগুলো অমন চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠার মধ্যে যেন কোনো অশুভ ইঙ্গিত মেশানো রয়েছে। গা ছমছম করে ওঠে রজনীর। আজ বড্ড বেশি গা ছমছম করছে ওর। এ-কদিন একা একাই বনের ভিতর অনেক দূর অবধি চলে বেড়িয়েছে ও, অথচ আজকের মতো এমন অনুভূতি ওর কোনো দিন হয়নি। মানুষ অনেক সময় রহস্যজনকভাবেই তার বিপদের কথা টের পেয়ে যায়। আজও কি সেই রকম কিছু ঘটতে চলেছে। তবে কি বাঘটা সত্যি সত্যি ধারেকাছে কোথাও অপেক্ষা করছে। বাঘটা কি পালের গোদা হিসেবে রজনীকেই তাক করে অন্ধি-সন্ধি খুঁজছে! এ অবস্থায় হাতের বন্দুকটা যে কিছুই নয় বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাঘের মুখোমুখি যদি পড়েই যায় রজনী, গুলি ছোঁড়ার সময় পাবে তো! কি জানি, আজ এমন হচ্ছে কেন!

জগন্নাথ এমন সময় রজনীর পাশটিতে এসে দাঁড়াল, বেশি ভিতরে না ঢুকে এখানেই কোনো গাছে মাচা বানিয়ে ফিরে যাই চল। আকাশের চেহারা ভাল নয়।

রজনী এক পলক আকাশের দিকে তাকাল, বেশ মেঘলা দেখাচ্ছে আকাশ। শীতকালেও এমন ঘটা করে মেঘ জমতে পারে, এ দৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না। আজ সব কিছুই সৃষ্টিছাড়া।

দীননাথ এগিয়ে এল, আর একটু ভেতরে ঢুকলে হয় না? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গাছগুলি পরীক্ষা করতে করতে বলল, এটা বড় কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে, দু-তিন দিনের মধ্যেই এ গাছগুলো কাটা শুরু হয়ে যাবে, তখন আবার আরো ভেতরে ঢুকে মাচা বানাতে হবে।

রজনী বলল, তোরা যা ভাল মনে করিস, তাই কর। আমার আর কিছুই বলার নেই।

—তুমি বড্ড ঘাবড়ে গেছ রজনীভাই। জগন্নাথ বোঝাতে চেষ্টা করে, অত ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

রজনী বলল, ঘাবড়াবার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই ঘাবড়াচ্ছি। একটা জিনিস তোরা লক্ষ্য করেছিস, কাল বিকেল থেকেই যত সব অঘটন ঘটতে শুরু করেছে।

সবাই তাকিয়ে থাকে। কেবল ওদিকে যারা ঝোপ পরিষ্কার করছিল তাদের লাফালাফি দেখে বোঝার উপায় নেই দুশ্চিন্তার কিছু ঘটেছে।

—কি অঘটন! বাঘের পায়ের ছাপের জন্য বলছ?

—বাঘের পায়ের ছাপ তো আছেই। জঙ্গলে বাঘ আছে, তার পায়ের ছাপ যে কোনো সময়ই দেখা যেতে পারে, সেটা বড় কথা নয়, আসলে কাল বিকেলে

যেই মেয়েটা ঘাটে ভিড়ল, তখন থেকেই আমাদের ঝামেলা শুরু হয়েছে। ওই মেয়েটাই আমাদের ঘাড়ে একগাদা বিপদ চাপিয়ে দিয়ে চলে যাবে, দেখিস।

ভয় খানিকটা সংক্রামক রোগের মতো। যারা শুনছিল, তারা থমকে রইল।

রজনী বলল, সেবার এই মেয়েটাই এসেছিল, আমাদের এখান থেকে উৎখাত করে দিয়ে তবে রেহাই নিয়েছিল। এবারও যে আমাদের অমঙ্গল করবে না, বলি কি করে।

—কি খারাপ করতে পারে আমাদের ?

—দেখতে পাচ্ছিস না, কাল থেকে আকাশের চেহারাই পালটে গেছে। সকালেই বাঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। এখন তো সবে শুরু, আরো কত কি হবে দেখতে পাবি। আমার কথা তো কেউ শোনে না। বুঝবে, সবাই বুঝবে।

একটুক্ষণ থমকে থাকে জগন্নাথ। মেয়েটার মুখ দেখে কিন্তু কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই।

—মুখ দেখে সব সময় সব কিছু বোঝা যায় না। কিছু কিছু লোকই আছে ওরকম, ওদের নিশ্বাস গায়ে লাগলেই অমঙ্গল হয়।

দীননাথ বলল, ওদের তাড়িয়ে দিলেই ঝামেলা যায়।

—দে না। ঈশান কেমন মারতে আসবে দেখিস। ও হারামজাদাই তো গতবার গোলমাল পাকিয়েছিল, এবারও। ঘুম থেকে উঠতে না-উঠতেই বেটা নৌকোয় গিয়ে বসেছে। আমরা এদিকে বাঘের চিন্তায় অস্থির, ওর হুঁশ থাকলে তো।

—ঈশান অন্য কথা বলে।

—কি বলে ?

—ও বলে, তুমি নাকি মিছিমিছি একটা মেয়ের নামে কেবল বদনাম দিচ্ছ।

রাগে রজনীর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, হারামজাদাকে যদি আমি এখান থেকে না তাড়িয়েছি তাহলে আমার নাম পালটে নাম রাখিস। ওর বাহাদুরি আমি বার করবই। নিশি তো আজই কলকাতা যাবে, ওর হাতেই আমি ছোটকর্তার কাছে চিঠি পাঠাব। হয় ঈশান এখানে থাকবে, নয় আমরা থাকব।

ওদিকে যারা ঝোপ পরিষ্কার করছিল তারাও এগিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। রজনী বলল, বশ করা জানিস, মেয়েটা ওকে বশ করেছে। রসিকলাল তো কিছুটা ঝাড়ফুঁক জানে, ওকে জিজ্ঞেস করিস, ওই তোদের বুঝিয়ে দেবে।

লোকগুলো হাঁ করে দাঁড়িয়ে কথা গেলে রজনীর। রজনী অবস্থা বুঝে বলল, ঠিক আছে, চল, কোন গাছে মাচা বাঁধবি ঠিক কর। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

রজনীই দলনেতার মতো জঙ্গলের মধ্যে আরো গভীরে যাওয়ার জন্য এগোতে শুরু করে। জগন্নাথ আর দীননাথও ওর পাশে পাশে এগোয়। শুলো কাঁটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পা ফেলে ওরা।

বেশ খানিকটা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ায়।

—কি হল ?

রজনী বলল, এখানেই একটা গাছ বেছে নে, আর ভেতরে ঢুকে লাভ নেই।

চারপাশেই ঘন জঙ্গল। বুনো গাছগাছালির গন্ধে শ্বাস-প্রশ্বাস কেমন ভারি হয়ে আসে সবার। রোদ ওঠেনি বলে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ভাবটা গায়ে গায়ে যেন জড়িয়ে থাকে।

জগন্নাথ বলল, ওই বড় গাছটা দেখছ রজনীভাই, ওটাতেই উঠি তাহলে !

গোটা পাঁচ-সাত গাছের মধ্যে একটাকে ধরে তরতর করে উঠে যেতে শুরু করে জগন্নাথ। ঝুরঝুর করে ভেজা পাতা থেকে একরাশ জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। কাঠের পাটাতে রামদা ধার দেওয়ার মতো ঘ্যাসর ঘ্যাসর শব্দ ওঠে। দীননাথ কোমরে কাটারি গুঁজে কাঁধে দড়ি ফেলে উঠবার জন্য তৈরি হয়।

রজনী সাবধান করে, দেখিস বাপু। গাছ কিন্তু ভেজা, সাবধানে উঠিস। হাতের বন্দুকটাকে লাঠির মতো তুলে ধরে ওপর দিকে তাকায় রজনী।

জগন্নাথ তরতর করে অনেক উপরে উঠে এল। উঠে নিচে একবার তাকিয়ে দেখল, হ্যাঁ, এ জায়গাটাই ভাল। এখান থেকে নিচে অনেকখানি জায়গা দেখা যায়, আবার দূরের কাছারিবাড়িটাকেও একটু একটু নজরে আসে। ওপাশে ভেড়িটাকেও খানিক খানিক দেখা যাচ্ছে। অনেকটা ঠিক উলটো 'তিন'-এর মতো ভেড়িটা বাঁক নিয়েছে দেখতে পেল জগন্নাথ। আরো খানিকটা উপরেও ওঠা যায়, কিন্তু তাতে রাতের অন্ধকারে নিচে কতটা পরিষ্কার দেখাবে কে জানে। এ জায়গাটাই ওর পছন্দ হল।

দীননাথ ততক্ষণে ওর কাছটিতে উঠে এসেছে। দীননাথের হাত থেকে কাটারিটা তুলে নিয়ে বেশ কয়েকটা ডাল ছেঁটে ফেলল জগন্নাথ। দড়িগাছি দীননাথের কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে ও শক্ত করে গাছের ডালে বাঁধতে শুরু করল। দীননাথের দিকে তাকাল, ওপাশটা পরিষ্কার কর দীনু। এখানেই দু-তিনজন লোক আরাম করে বসে রাত কাটাতে পারবে, কি বলিস ?

দীননাথ মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, এখানেই ভাল।

জগন্নাথ বলল, ওই কোণের দিকে হরিণটাকে টোপ হিসেবে বেঁধে রাখা যাবে।

যেদিকে আঙুল তুলে দেখাল জগন্নাথ, সেদিক অনেক দূর অবধি ছড়ানো গোলপাতার জঙ্গল। মাকড়সার জালের মতো ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে জায়গাটা।

রজনী নিচ থেকে চেঁচিয়ে বলল, আর একটু উপরে উঠবি না? বড্ড নিচে হয়ে গেল না?

জগন্নাথ দড়ি বাঁধা থামিয়ে বলল, নিচে কোথায় গো রজনীভাই! এখানেই ভাল হবে।

ভাল তো ভাল। রজনী আর কথা বাড়াল না। শক্ত করে বাঁধিস কিন্তু। শেষপর্যন্ত যেন ভেঙে না পড়ে কেউ।

দীননাথ গাছের ডাল কাটার জন্য নিচে হাঁকডাক শুরু করে দেয়। মাচা বানাতে বেশ কিছু লাঠির দরকার। নিচে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা হৈহৈ করে গাছ উপড়ে উপড়ে ছেঁটেকেটে লাঠি বানাতে শুরু করে।

রজনীর কোমর ধরে এসেছিল। একটু বসে জিরিয়ে নিতে পারলে হত। কিন্তু বসবে কোথায়! চারপাশে জবজবে কাদা। ভেজা পাজুটোয় কাদা জেবড়ে এমনিতেই বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। গাছের গায়ে ঘষে কাদা ছাড়িয়েও স্বস্তি নেই। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকে।

মনে হল, বাতাস যেন ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছে। কিছু একটা ঘটনা যেন ঘটতে চলেছে এমন স্তব্ধতা চারপাশে। জঙ্গলের পাখিগুলো গেল কোথায়! আকাশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, ঘন কালো চেহারা ধরেছে আকাশের। তারই গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো পাখিগুলো উড়ছে।

রজনী তাড়া লাগাল, তাড়াতাড়ি হাত চালা বাপু। মেলাই কাজ পড়ে আছে। তিন-চারজন গাছে উঠে পড়েছিল। রজনী দেখল, লোকগুলোর চাবুকের মতো শরীর, যেভাবে সরু সরু ডালে ঘোরাফেরা করছে, তাকাতেই ভয় হয়। নিচে পড়ে গেলে শূলে বিঁধে যাবে। আবার তাড়া লাগাল রজনী, সাবধানে রে। বেশি বাহাদুরি ভাল নয়।

গরান ডালের শক্ত শক্ত ডাল বেঁধে বেঁধে চমৎকার একটা মাচাই প্রায় বানিয়ে তুলেছে জগন্নাথ। কিন্তু এমন সময় সমস্ত বনভূমি যেন জেগে উঠে দৈত্যের মতো হঠাৎ মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠল। ঘটনাটা যে কী বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল ওদের। খই ফোটার মতো অসংখ্য শব্দ চারপাশে। নিজের কানকে অবিশ্বাস করা যায় না। শব্দটা ক্রমশ যেন বাড়ছে। কী শব্দ রে বাবা! যারা গাছে উঠেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন তরতর করে নেমে এল। চারপাশে তাকিয়ে কিছুই ঠাহর করা গেল না। আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে এল সবার।

ওদিকে বনের মুখোমুখি যারা জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে নেমেছিল তাদের চিৎকার এসময় কানে এল রজনীর।

কিন্তু কেন? এমন হচ্ছে কেন? হাতের বন্দুক হাতেই রয়ে গেল রজনীর। ওপর দিকে তাকাল। জগন্নাথ গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়েছে। পা হড়কে গেছে বোধহয়।

ওদিকে দীননাথের এক অদ্ভুত অবস্থা। শব্দটা ক্রমশই বাড়ছে। গাছের পাতায় পাতায় যেন সহস্র তালি বাজতে শুরু করেছে। সমস্ত বনভূমি যেন ফুঁসে উঠেছে ওদের দেখে, কি হল এসো, কত বড় হিম্মত তোমাদের দেখি। কই হে পালের গোদা, কোথায় গেলে? এসো না! হা হা হা হা···

আরো অনেকক্ষণ পর রজনী অবস্থাটা বুঝতে পেরে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। বুঝতে পারল, বৃষ্টি। বৃষ্টি নেমেছে বনের মাথায়। গাছের ডালপালা ভেদ করে সেই বৃষ্টির ফোঁটা নিচে নেমে আসতে এতক্ষণ বুঝি সময় লাগল।

ফলে আর দাঁড়ানো নয়। জগন্নাথ নেমে পড়তেই রজনী বলল, পালা। এই ঠাণ্ডার মধ্যে ভিজলে আর রক্ষা থাকবে না।

বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেই সিঁথির মতো রাস্তা ধরে ওরা ছুটতে শুরু করল। কাদায় পা পিছলে যাচ্ছে। পুরোপুরি কাদা থাকলে বোধহয় এত কষ্ট হত না। কিন্তু এ বৃষ্টিতে ওপরের স্তরটাই কেবল পেছল। পা পিছলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

হা হা···বনভূমি অট্টহাসি করে লাফিয়ে উঠেছে। হা হা···হি হি···হো হো।

পেছনে তাকানো সম্ভব ছিল না। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজে একশা হয়ে গেল রজনী। বৃষ্টির কণা যেন ছুঁচের মতো ওর গায়ে পিঠে বিঁধে যাচ্ছে! হাতের বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিল। ছুটে চলা অসম্ভব। ভিজতে ভিজতেই এগিয়ে চলল ও।

আর কাছারি বাড়ির উঠোনে এসে বিস্ময় ওর চরমে উঠল। কে? কে ও?

থমকে দাঁড়াল রজনী। গৌরী কাছারিবাড়ির বারান্দায় এসে টুলের ওপর একা একা বসে আছে। খানিকটা তফাতে খুঁটিতে সেই হরিণ!

আশ্চর্য, মেয়েটা এখানে এল কী করে! কে ওকে এখানে এনে বসিয়ে রেখেছে, কে? কার এমন সাহস?

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকল রজনী।

চব্বিশ

শীতকালের বৃষ্টি, অথচ প্রকোপ দেখে মনে হচ্ছে যেন বর্ষাকালকেও হার মানাবে। আকাশ চিরে পর পর দু'বার বিদ্যুৎ ঝলসে গেল। অনেকক্ষণ পর বুক কাঁপিয়ে গুড়গুড় করে শব্দ গড়াল। কাঠুরেরা ছুটতে ছুটতে ডেরায় ঢুকে পড়েছে। রজনীও শেষপর্যন্ত জলে ভিজে একশা হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বারান্দায় এসে উঠল। গৌরীকে দেখার পর শীতের কাঁপুনি যেন আরো দশ গুণ বেড়ে গেছে ওর। ঘরে ঢুকে আগে গা মোছা দরকার, কাপড় পাল্টানো দরকার। ফলে গৌরীকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগে উত্তেজনা কমাবার জন্য ঘরে ঢুকল রজনী। দড়িতে টাঙানো গামছাটা হুট করে টেনে নিয়ে গা মাথা মুছতে শুরু করল।

কাপড় পাল্টাল। কাঁপুনি থামাবার জন্য বিছানা থেকে শুকনো কম্বলটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপাল। তারপর পা টিপে টিপে আবার দরজার কাছে এগিয়ে এল, এই মেয়ে, শোন তো?

গৌরী উঠে দাঁড়াল।

—এখানে এসেছ কেন? কি চাই? কি মতলব তোমার?

গৌরী কেমন অসহায়ভাবে তাকাল, ঠোঁটদুটো একটু নড়ল বটে, তবে কোনো শব্দ বেরল না।

ভঙ্গিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল রজনী। এও এক ধরনের ছলাকলা কিনা কে জানে!

প্রশ্ন করল, কি নাম যেন তোমার?

গৌরী আড়ষ্টভাবে নাম বলল।

—তা এখানে এসেছ কেন? কে আসতে বলেছে?

গৌরী আবার থমকে গেল। মনে হল ও যেন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করছে।

রজনী বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর যা থাকে কপালে ভাব করে বলল, ঠিক আছে, ঘরে এসো।

ঘরের মধ্যে ততক্ষণে রজনী সারা দেহে কম্বল জড়িয়ে বিছানায় বসে পড়েছে। গৌরী সামান্য একটু এগিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

—ওখানে নয়, ঘরে এসো। আদেশের ভঙ্গিতে আবার ডাকল রজনী।

গৌরী চৌকাঠ পেরল। ঘরে ঢুকল ভয়ে ভয়ে।

—ঐ যে টুলটা দেখছ ওখানে বস। কথা আছে।

গৌরী বেড়ার কাছে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

—কি হল? কানে শোন না নাকি? জান আমি কে?

গৌরী টুলের কাছে এগিয়ে এসে মাটিতেই বসে পড়ল এবার।

—যা জানতে চাই, সরাসরি তার উত্তর দাও! কে তোমাকে এখানে আনল?

—আজ্ঞে, গৌরী অসহায়ভাবে দরজা দিয়ে বাইরে তাকায়। আর রজনী এ সময় লক্ষ্য করল মেয়েটার মুখ থেকে দয়ার দাগগুলো এখনো একদম মুছে যায়নি।

—কথা বোঝ না? রজনী ধমকে উঠল।

—আজ্ঞে! ঈশানদাই আমাকে বসিয়ে রেখে গেল।

—কোথায় ঈশান? কোথায় ও?

—আজ্ঞে বৃষ্টি এল, তাই। চোখদুটো ছলছল করে উঠল গৌরীর। নৌকোর ছইটা ভাল নয়। জলে সব ভিজে যাচ্ছে, তাই।

—আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। এত রাজ্যি থাকতে আমাদের এখানে এসে নৌকো রাখলে কেন? কি উদ্দেশ্য তোমাদের?

—আজ্ঞে, এখানে আসব বলে আসিনি। দেশে ফিরে যাব বলেই বেরিয়েছিলাম। পথে পড়ে গেল, তাই। গৌরী বোঝাবার চেষ্টা করল।

—পথে পড়ে গেলেই থামতে হবে। গতবার এসে আমাদের সর্বনাশ করে গেছ মনে নেই?

গৌরী অসহায়ভাবে আবার একবার দরজার দিকে তাকায়, উঠে দাঁড়ায়। আমি চলে যাই।

—চলে যাই মানে? আমার কথার জবাব চাই আগে। আজ ঐ শালা ঈশান-এলে আমি হেস্তনেস্ত করব।

গৌরী আরো গুটিয়ে গেল। বিশ্বাস করুন, বৃষ্টি হচ্ছে বলেই নৌকো থেকে মাটিতে নেমেছি, নইলে আমরা চলে যেতাম। লক্ষ্মণদা এখানে একমুহূর্তও থাকতে চাইছিল না। আমিই জোর করে ওকে নৌকো ছাড়তে দেইনি।

—লক্ষ্মণ তোমার কি রকম দাদা?

এ সময় আবার একটা বাজ পড়ার শব্দ হল। বৃষ্টি আরো মুশলধারে নেমে বসল। বাজের শব্দে গৌরীও চমকে উঠেছিল। গায়ের আঁচলটা আরো টেনে গায়ে জড়িয়ে নিল।

—কি রকম দাদা লক্ষ্মণ ?

গৌরী বলল, পাদরিপাড়ায় আশ্রমে আমাদের হাতের কাজ শেখাত।

—বাহ্! চমৎকার। দাদাটি বেশ ভালই যোগাড় করেছ দেখছি। মালা-বদল করে নিয়েছ? না, তোমাদের খেস্টানদের মালা-বদলের দরকার হয় না?

গৌরী বলল, লক্ষ্মণদা আমাকে বোনের মতো ভালবাসে।

—নৌকোয় সারারাত তোমরা দুজনে বুঝি ভালবাসাবাসি কর? লজ্জা হয় না, এত বড় মেয়ে হয়ে কুকাজ করে বেড়াও। দেশে তোমার কে আছে?

গৌরীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এখনি পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে ও, কিন্তু দেহটা যেন অবশ হয়ে আছে।

—কি হল? জবাব দেবে না?

গৌরী বলল, মা আছে।

—বাবা?

—নেই। মারা গেছে।

—বুঝেছি। তা মাকে ছেড়ে ঐ পাদরিপাড়ায় গেলে কি করে?

গৌরী যেন দারোগার সামনে দাঁড়িয়ে জবানবন্দী দিচ্ছে। ওর ফাঁসি হতে পারে। হঠাৎই আবার আড়ষ্ট হয়ে পড়ল গৌরী। দরজার বাইরে বেশ কয়েকজন লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কি বিপদেই ওকে বসিয়ে রেখে গেল ঈশানদা। এর চেয়ে নৌকোয় বসে ভেজাও ভাল ছিল।

—কি হল, পাদরিপাড়ায় গেলে কি করে? রজনীর গলা খরখরে শোনাল। গৌরী কেঁদে ফেলল, মুখে আঁচল চাপা দিল, বলল, সবই আমার কপাল।

রজনী আবার ধমকে উঠল, এই, কান্নাকাটি চলবে না এখানে। কোনোরকম ন্যাকামি চলবে না। ভেবেছ, আজে-বাজে কথা বলে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে যাবে। তা আমি হতে দেব না।

এমন সময় দরজার বাইরের লোকগুলির দিকে রজনীরও নজর পড়ল। রজনী তাড়া লাগাল। এই, তোরা এখানে কেন?

কিন্তু লোকগুলোর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। যে মেয়েকে নিয়ে এত কানাঘুষা তাকেই এখন চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। এ উৎসাহ কে দমাতে পারে! রজনীর কথায় কেউ গ্রাহ্যই করল না।

রজনী দরজার কাছে এগিয়ে এল, বলি, জলে ভেজা কাপড়গুলো তো গায়ে শুকুচ্ছে। অসুখে পড়বি সব। ভেরায় যা।

—মরতেই তো এসেছি গো। কে একজন দাঁত বার করে হিঁ হিঁ করে হাসল।

—মরবার আগে একটু দেখে নিচ্ছি আর কি! আর একজন কে রসিকতা করল।

—দেখার কি আছে, যা ভাগ! পালা এখান থেকে।

—মেয়েটা কাঁদছে রে। যে বলল সে এক হাতে ভেজা কাপড় নিংড়ে নিচ্ছিল। আর একজন কে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, মেয়েরা কাঁদলে বড় মিষ্টি লাগে গো। তাই না?

আর ঠিক সেই সময় রজনী দেখতে পেল দূরে ভেড়ির ওপর দুটো মানুষ। ঈশানকে ও চিনতে পারল। ঈশান চিৎকার করে কি যেন বলতে চাইছে।

রজনী বারান্দায় বেরিয়ে এল। কি বলছে ঈশান। কেমন একটু হকচকিয়ে গেল রজনী।

বৃষ্টির দাপট এখনো কমে নি। উঠোনে বৃষ্টির ফোঁটা ফুটকুরি কেটে কেটে লাফাচ্ছে। ছাতার যে প্রয়োজন হবে, একথা ওরা আগে কখনো ভাবেনি! ফলে এতগুলো লোকের মধ্যে একটাও ছাতা নেই। রজনী দেখল, ঈশানরা ভেড়িতে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে কি যেন বোঝাতে চাইছে। নির্ঘাত কিছু একটা ঘটেছে। কী যেন ঘটতে পারে, কিছুই মাথায় এল না রজনীর।

—এই, কি বলছে শোন তো? শুনতে পাচ্ছিস?

কেউ কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হল না।

ঈশান চিৎকার করছে ঠিকই, কিন্তু একটা-কথাও শোনা যাচ্ছে না।

—যা না বাপু। একটু শুনে আয় না!

জনা তিনেক লোক বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়ল।

—যা বাবা, একটু ছুটে যা।

রজনী কাঠুরেদের ঘরের দিকে তাকাল, কাউকেই চোখে পড়ল না। শুকদেব, রসিক, জগন্নাথ, চৈতন্য, নিশি কাউকেই দেখল না। সব এখন ঘরে ঢুকে বোধহয় কম্বল চাপিয়েছে গায়ে। নিশি আর চৈতন্যের আজ কলকাতা যাওয়ার কথা। দুপুরের পরই ওদের নৌকো ছাড়বে। ওরা এখনই নৌকোয় গিয়ে উঠে বসেছে কিনা কে বলবে!

গৌরীও দরজা অবধি এগিয়ে এসেছিল। রজনী দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বেরুতে পারছিল না! বলল, সরুন, আমি চলে যাই।

রজনী ঘুরে দাঁড়াল, যাই মানে! ঈশান না এলে তোমাকে ছাড়া হবে না।

গৌরী আর্তভাবে বলল, কিন্তু কী হয়েছে ওদের? কী হয়েছে ওখানে?

—কী আবার হবে! কিছুই না। ঈশানের চালাকি আমি এখনই ভেঙে দিচ্ছি দেখ না।

গৌরী অনুনয় শুরু করল, ছাড়ুন না। আমরা চলে যাব, ছাড়ুন না।

রজনী বলল, পালাবার চেষ্টা করলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

যারা ভিজতে ভিজতে ভেড়ির দিকে এগিয়েছিল, তারা ভেড়ির ওপর উঠে পড়েছে দেখতে পেল রজনী। কিন্তু ওকি, ওরাও যে ওখানে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করল।

রজনী এবার ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে পারে না। নির্ঘাত কোনো বিপদ ঘটেছে। কিন্তু কি? কি ঘটতে পারে! মকবুলের নাম ধরে চিৎকার করে উঠল রজনী। বারান্দায় যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাও এবার দল বেঁধে ভেড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল।

হৈ হৈ চিৎকার শুরু হয়ে গেল চারপাশে। কাঠুরে ঘর থেকে দুজন-একজন করে বেরিয়ে পড়ল, কি? কি হয়েছে?

রজনী আঙুল তুলে দেখাল, দেখ, ঐ দেখ। ভেড়ির দিকে দেখাল রজনী। তারপর উত্তেজনায় ঘরে ঢুকে প্রথমেই বন্দুকটা হাতে তুলে নিল। গায়ের কম্বলটা ঝেড়ে ফেলল। গৌরীর দিকে তাকাল। গৌরী ভয়ে আতঙ্কে আবার টুলের পাশে এসে বসে পড়েছে। রজনী বন্দুক হাতে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

দেখল, ঈশান ছুটতে ছুটতে এবার কাছারিবাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। একটু অপেক্ষা করল রজনী।

ঈশান এগিয়ে এল, ভেড়ি ভেঙে গেছে রজনী ভাই। পশ্চিমমুখো ভেড়িতে বিরাট ছুটো ধোঁগ। বগবগ করে জল ঢুকছে ডাঙায়। শীগগির বেরিয়ে এসো।

—ভেড়ি ভেঙেছে! ভেড়ি ভেঙেছে মানে?

—আর দেরি করো না রজনীভাই। নদীর জল যেভাবে ঢুকছে তাতে বান এল বলে।

কিন্তু এ-বৃষ্টিতে আপনাআপনি ভেড়ি ভাঙার কথা নয়। রজনীর প্রশ্ন, কি করে ভাঙল।

—কি করে ভাঙল সেটা পরে দেখা যাবে গো, আগে কোদাল ঝুড়ি নিয়ে বেরও।

রজনী শুধাল, কোথায়? কতদূর?

ঈশান চিৎকার করে কাঠুরে ডেরার দিকে হাঁক দিল, বেরও হে। কোদাল ঝুড়ি নিয়ে বেরও। ভেড়ি ভেঙেছে। পরে রজনীর দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ

বনের মুখটাতে বিরাট বড় একটা খোঁগ হয়ে গেছে। একমানুষ উঁচু চওড়া সুড়ঙ্গের মতো।

—ঠিক আছে, তোরা যা, আমি আসছি। রজনী আবার ঘরে ঢুকল। গৌরীর দিকে তাকাল, আমরা যতক্ষণ না ফিরছি, এখান থেকে যেন নড়া না হয়।

ঈশানও ঘরের দরজায় উঁকি দিল, হ্যাঁ বসে থাক। আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

রজনী আবার ভেজা কাপড় গায়ে জড়াতে জড়াতে বলল, চল চল আর দেরি করিস না। তোরা সব এক একটা ঝামেলা বাঁধাবি আর সামলাতে হবে আমাকে। চল।

রজনী এমন ভঙ্গি করল যেন ও হেলাফেলার মানুষ নয়। এখানকার সর্বময় কর্তা বলতে রজনী ছাড়া আর কেউ নেই। রজনী ইচ্ছে করলে ঈশানকে এখান থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারে।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। ভেড়িগুলোর দিকে আগেই নজর রাখা উচিত ছিল ওদের। ঐগুলোই বাঁচিয়ে রেখেছে দ্বীপটাকে। সপ্তাহে সপ্তাহে একবার করে ভেড়িগুলো ঘুরে দেখা উচিত ছিল। কতকাল ধরে যে এগুলোর যত্নআত্তি হচ্ছে না কে বলবে।

ভেড়ির কাছাকাছি আসতে আসতে রজনী লক্ষ্য করল, বৃষ্টি যেন একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। শীতকালের বৃষ্টি, এর চেয়ে বেশি হওয়ারও কথা নয়। কিন্তু আকাশের চেহারা পাতলা হতে আরো কিছুক্ষণ সময় লাগবে। তবু ভাল উল্টো-পাল্টা বাতাস নেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে ভেড়ির কাছাকাছি এসে চক্ষুস্থির। নদী এখন জোয়ারে কাণায় কাণায়। আর একটু জল বাড়লে যেন এমনিতেই ভেড়ি উপচে পড়বে। এই জলে ভেড়ি যে এখনো টিকে আছে এই তো ঢের। রজনী দেখল, হাত দশেক অবধি বিরাট একটা ধস নেমে ভেড়ি উধাও হয়ে গেছে বনের দিকে। প্রচণ্ড স্রোতে জল ঢুকছে ওখান দিয়ে। এইভাবে জল ঢুকতে শুরু করলে নির্ঘাত বান ডাকবে। যেভাবেই হোক এখন এটাকে আটকানো দরকার।

লোকজন প্রায় সবাই এসে হাজির। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ভাঙনের মুখে ফেলার চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জলের স্রোতে সঙ্গে সঙ্গে তা মিলিয়ে যাচ্ছিল। কে আটকাবে এই ঢল, কার সাধ্য!

ঈশান কোমর জলে নেমে পড়ল। ওখান থেকেই ও চেঁচাতে শুরু করল।

খুঁটি পুঁততে হবে রজনী ভাই। এভাবে হবে না। খুঁটি পুঁতে পুঁতে আগে বেড়া দিতে হবে। তারপর মাটি।

জগন্নাথ মাটি কোপাতে শুরু করেছে। চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, খুঁটিও থাকবে না, উপড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

রজনীরই এখন বুদ্ধি দেওয়ার দায়িত্ব. কিন্তু কি যে করবে রজনী ভেবে পাচ্ছে না। জলের কী আক্রোশ। তবু ভাগ্যি, হাত দশেকের মতো ভেঙেছে, এটা যে দেখতে দেখতে পঞ্চাশ হাত হয়ে যাবে না কে বলবে। আর তেমন কিছু ঘটলে এতগুলো লোক কিভাবে বাঁচবে। কাঠবোঝাই যে নৌকোটা আজ দুপুরেই কলকাতার পথে রওনা হওয়ার কথা, সেটাকে আগে আটকানো দরকার। বনবিবির পুজোর জন্য ছোটকর্তার সঙ্গে কথা বলতে যাবে চৈতন্য আর নিশি। কিন্তু আপাতত বাঁধ ঠিক না হলে নৌকো ছাড়া যেন না হয়। রজনী ভেবে রাখল, তেমন বিপদ হলে ঐ নৌকোতেই আশ্রয় নিতে হবে।

রজনী চেঁচিয়ে উঠল, জঙ্গল থেকে খুঁটি কেটে নিয়ে আয়। ঈশান যেভাবে খুঁটি পুঁততে বলছে, সেইভাবে আগে খুঁটি পুঁতে নে।

বেঁটে চৈতন্য আর শুকদেবও জলে নেমে পড়েছে। ওরা স্রোতের ধাক্কা বাঁচাতে বাঁচাতে ঈশানের কাছে এসে দাঁড়াল। এভাবে জলের মধ্যে দাঁড়ানোটা কি উচিত হচ্ছে ওদের! জলের টানে এখানেও যে কুমির বা কামট এসে ঢুকে পড়েনি কে বলবে।

রসিকলাল বাঁধের মুখে মাটির ঝুড়ি ফেলতে ফেলতে চেঁচিয়ে উঠল, এই ঈশান জলে কেন! উঠে আয় না।

ঈশানের এতক্ষণ পর যেন খেয়াল হল, সত্যি সত্যি জলে দাঁড়িয়ে কতটুকুই বা জল আটকাচ্ছে ও। যত না জল আটকাচ্ছে তার চেয়ে বেশি নিজের বিপদই ও ডেকে আনছে।

চৈতন্য আর শুকদেবকে তাড়া লাগাল ঈশান, খুঁটি কেটে আন না। তোরা নেমেছিস কেন। বলতে বলতে ঈশান স্রোতের ভিতর থেকে উঠে এল।

উঠে এল চৈতন্যও, শুকদেবও।

ওদিক পনের-বিশজন একসঙ্গে মাটি কাটতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে মাটির ঝুড়ি বোঝাই হয়ে উঠে আসছে মাথায় মাথায়। কিন্তু ভাঙনের মুখে পড়তে না পড়তেই তা চন্দন-ঘোলা হয়ে উবে যাচ্ছে।

ঈশান ডাকল, আয় খুঁটি আনি। বলেই কাটারি হাতে ছুটতে শুরু করল জঙ্গলের দিকে।

রজনীরও উচিত আর দশজনের মতো কোদাল ঝুড়ি হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। এসময় দয়াল ঘোষ থাকলে কি করতেন। উনিও কি কোদাল চালাতে শুরু করতেন। দয়াল ঘোষ যাই করুন না, রজনী ভেবে দেখল, মাটি কাটার জন্য এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে ওর উচিত লোকগুলোর পেছনে লেগে থাকা, উৎসাহ দেওয়া।

ভাঙনের একপাশে ভেড়ির ওপর উঠে দাঁড়াল রজনী। চেঁচাতে শুরু করল, এই দীনু, একপাশ থেকে মাটি ফেল। একদিকে, সবাই একদিকে।

বেশ কিছু গরান ডাল নিয়ে হাজির হয়ে গেল ঈশানরা। শুকদেব বসে পড়ল ডালের গোড়াগুলো ছুঁচলো করার কাজে।

রজনী বলল, খুঁটি পুঁতে মাথায় শাবল পেটাতে হবে। হাতখানেক করে খুঁটিগুলো মাটির মধ্যে ঢোকাতে হবে মনে থাকে যেন।

কেউ যে রজনীর কথায় খুব একটা আমল দিচ্ছে মনে হল না। ওদিকে ভাঙনের মুখ থেকে হাত দশেক দূরে ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি পড়ছে। যে যেখানে পারছে মাটি খুঁড়ে ঝুড়ি বোঝাই করছে। গর্ত করে ফেলছে। আর সঙ্গে সঙ্গে জলে গর্ত বোঝাই হয়ে যাচ্ছে। জল কি এখন গোটা দ্বীপময়ই ছড়িয়ে গেল।

রজনী জঙ্গলের দিকে তাকাল। গাছের গোড়ায় গোড়ায় বাধা পেয়ে সাপের মতো জল ছুটছে। ওদিকে নদীর চেহারাও ভাল নয়। এখনো ঘন্টা খানেক নদীতে এরকম জোয়ার থাকবে। নদীর জলে টান না পড়লে আর রক্ষে নেই।

—তাড়াতাড়ি হাত চালা বাপু। বৃষ্টি থেমে গেছে। হাত চালা।

আকাশের মেঘ কিছুটা কমেছে ঠিকই কিন্তু আরো যে হবে না এমন কথা বলা যায় না। কেমন ধোঁয়ার মতো গুমোট হয়ে আছে চারপাশ। দিনের বেলাও কুয়াশা শুরু হল কিনা কে জানে।

—হাত চালা। হাত চালা ভাই, হাত চালা।

আরো বেশ কিছু খুঁটি চলে এল। ঈশান আবার এক কোমর জলে নেমে পড়ল। একটার পর একটা খুঁটি পুঁতে দেয়াল রচনা করা শুরু হয়ে গেল ওদের।

এমন সময় আবার গৌরীর কথা মনে পড়ল রজনীর। মেয়েটার জন্যই কি এসব হচ্ছে! ঘরের মধ্যে ওভাবে ওকে বসিয়ে রেখে এসে কি ভাল করলাম। সন্দেহে কেমন বুকের ভেতর আবার মোচড় দিয়ে উঠল ওর।

অথচ মেয়েটার চোখেমুখে কুলক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। এতক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হল না, মেয়েটা সর্বনাশ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি জানি, অনেক কিছুই বুঝতে পারে না রজনী। কে যে কখন কিভাবে সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে রজনীর মতো ক্ষুদ্র মানুষ সব সময় যে তা বুঝতে পারবে এমন কোন

কথা নেই। রজনী বুঝুক আর নাই বুঝুক, সংসারে এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের নিশ্বাসের শব্দ পেলেই কাক পালায়, যাদের হাতের ছোঁয়া পেলে গাছের পাতাও চলে পড়ে। যাদের চোখের দৃষ্টিতে গৃহস্থের অমঙ্গল হবেই। তবে কি এই মেয়েটাই আজ এমন সব দুর্যোগের মূল। ওরই জন্য কি এ সব শুরু হল!

আচ্ছা, ওর সঙ্গে যে লোকটা এসেছিল সেই বা কোথায়। চারপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজে নিল রজনী। না, কোথাও সেই লোকটাকে ওর চোখে পড়ল না।

জলের মধ্যে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খুঁটি পোঁতার সত্যি সত্যি কিছুটা কাজ হচ্ছিল। খুঁটির গা দিয়ে এখন ঝপাঝপ মাটি ঢালা হচ্ছে। ভাঙা ভেড়ি থেকে দশ পনের হাত দূরে মাটির দেয়াল গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। ঘণ্টা দুয়েক এভাবে মাটি ফেলতে পারলেই যে কেল্লা ফতে, তাতে সন্দেহ নেই। ততক্ষণে ভাঁটা নামলে নদীর জলও বেশ কিছুটা নিচে নেমে যাবে। জলের দাপট আপনা-আপনিই কিছুটা কমে আসবে।

ঈশান কোমরজল থেকে উপরে উঠে এল, দেখলে তো, খুঁটি পোঁতায় কাজটা কত সহজ হচ্ছে রজনীভাই?

রজনী বলল, ভাগ্যিস, সময় মতো তোর চোখে পড়েছিল, নইলে কি যে হত! আমরা তো বৃষ্টির ভয়ে সবাই ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলাম।

জঙ্গলের দিক থেকে আরো খুঁটি আসছে। দু'তিন কেত্যা করে খুঁটি বসিয়ে দিতে পারলে আর দেখতে হবে না।

ঈশান তাড়া লাগাল, ওপাশে লাগা। ঐ যে, ওদিকে।

রজনী ঈশানের কাছে এগিয়ে এল, বিপদটা তাহলে সত্যি সত্যি কাটবে, কি বলিস? ভাগ্যিস খুঁটি পোঁতার বুদ্ধিটা তোর মাথায় এসেছিল।

ঈশান কথা বাড়াল না।

—তোর সব বুদ্ধিই ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে তুই এমন সব নির্বুদ্ধির কাজ করিস—

—কি করেছি? ঈশান এবার তাকায়।

—ঐ মেয়েটাকে তুই তুলে এনে কাছারিবাড়িতে তুলেছিস?

—হ্যাঁ তুলেছি। নৌকোয় বসে বসে ভিজত, ওখানে তুলে দিয়েছি। তাতে কি হয়েছে?

—কি যে হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছিস। দেখতে পাচ্ছিস না?

—কি দেখতে পাচ্ছি?

—কাজটা ভাল করিসনি ঈশান। সবে এক জায়গায় বাঁধ ভেঙেছে, এবার আরো কত জায়গায় ভাঙবে কে জানে!

ঈশান হঠাৎ রুখে দাঁড়াল, কি বলতে চাও ? ওর জন্যে ভেঙেছে ?

রজনী এখনই হেস্তনেস্ত করতে চাইল না। বলল, থাকগে, ওসব কথা পরে হবে। লক্ষ্মণ না কি নাম যেন, ও লোকটা কোথায় ? ওকে দেখছি না ?

ঈশান বলল, নৌকোয়। কেন ? কি দরকার ?

—না, কিছু না। এমনি শুধোলাম।

—নৌকোয় একজন থাকা দরকার বলেই ও ওখানে আছে। নইলে ওকেও কাছারিবাড়িতে তুলে দিয়ে আসতাম।

রজনী এখন ঘাঁটাতে চাইল না ঈশানকে। আগে বাঁধটাকে মেরামত করা দরকার। তবু বলল, একটা জিনিস লক্ষ্য কর না, ওরা এ-ঘাটে আসার পর থেকেই আকাশ মেঘলা হয়ে উঠল, বৃষ্টি এল, বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেল, বাঁধ ভাঙল, আরো কত কি হবে।

—ওরা না এলেও হত। খবরদার বলে রাখছি, ওদের তুমি কিচ্ছু বলতে পারবে না। কিছু বলতে হয়, আমাকে বলবে, আমি বুঝব।

রজনী আমতা আমতা করল, তোকেই তো বললাম। যেন কিছুটা অপমান হজম করে নিয়েই রজনী আর কথা বাড়াল না। আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ থমকে আছে। বৃষ্টি হলেও হতে পারে। জঙ্গলের মাথায় কুয়াশার মতো স্যাঁতসেঁতে আরো মেঘ জমা হচ্ছে। এখনো সাপের মতো বিলি কেটে নদীর জল জঙ্গলের ভিতর গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঈশান সরে গেল। নিজের হাতে একটা কোদাল তুলে নিয়ে মাটি কাটতে লেগে গেল।

রজনী ভেড়ির ওপর থেকে নেমে এল নিচে। গোড়ালি ডুবে যায় কাদা। দেখল, জঙ্গলের দিক থেকে কাটারি হাতে এগিয়ে আসছে নিশিকান্ত। হ্যাঁ, ওকেই এখন ওর প্রয়োজন। চোখে চোখে ইশারা করল ও নিশিকে, এদিকে, আয়, শোন।

নিশি এগিয়ে এল।

—সব গুছিয়ে নিয়েছিস তো ? বেঁটেটা কোথায় ?

বেঁটে অর্থাৎ বেঁটে চৈতন্য। নিশি বলল, ও এতক্ষণ তো এখানেই ছিল।

—তোরা কলকাতা গিয়েই কিন্তু ছোটকর্তার সঙ্গে আগে দেখা করবি।

নিশি বলল, তা তো করবই।

—আমি তোদের হাতে একটা চিঠি দিয়ে দেব, কেউ যেন না দেখে।

নিশি চুপ করে শুনল।

—চিঠিতে তো আর সব কথা লেখা যাবে না, তোরাও মুখে বলিস।

—কি বলব ?

—যা দেখছিস, তাই বলবি। ঈশান কী সব কুকীর্তি করছে তাই বলিস।

নিশি কথা খুঁজে পেল না।

রজনী বলল, ঐ মেয়েটাকে যদি আস্কারা না দিত তাহলে আমাদের এই কষ্ট হত না। গতবারও ঐ মেয়েটাই আমাদের সর্বনাশ করে গিয়েছিল, এবারও দেখ না, সবে তো শুরু।

নিশি চারপাশে একবার তাকাল। দূরে ঈশানকে দেখতে পেল। বলল, বলব। আগে যাই তো।

রজনী বলল, বলিস, ঐ একটা লোকের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি না। হয় ঈশানকে উনি রাখুন এখানে, নয়তো আমাদের। কিরে, বুঝিয়ে বলতে পারবি তো

নিশি আবার একবার চারপাশে তাকাল, বলল, ঠিক আছে, বলব।

পঁচিশ

সারা রাত ধরে বৃষ্টি। কিছুক্ষণ থামে, আবার শুরু হয়। সন্ধ্যের পর থেকে এলোমেলো বাতাসও দাপাদাপি শুরু করে। বাতাস এসে ঘরের বেড়ায় ঝাপটা মারে। বিচিত্র সব শব্দ হয়। মনে হয়, সমস্ত দ্বীপটাই এবার ঝড়ে জলে প্লাবনে একাকার হয়ে ধ্বংস হবে। আর রক্ষে নেই।

রজনী অনেক রাত অবধি ঘুমুতে পারল না। ঘরে একটা তেলের ডিবে জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। বেড়ায় জলের ঝাপটা লেগে কখনো-সখনো ঘরের ভিতর বিন্দু বিন্দু জলকণা আছড়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে, বেড়াগুলো নেহাতই পলকা। আরো একটু জোরে বাতাস বইলে সহসা উড়িয়েও নিয়ে যেতে পারে। বুকের ভেতর আতঙ্ক গোমরায়। অন্ধকারে জঙ্গলের দিকে তাকালে কত আজগুবি সব কথা না মাথায় এসে ঠাঁই জমায়।

দাওয়ায় ডে-লাইট জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। সারা রাত ধরেই প্রতিদিন ওখানে ঐ আলোটা জ্বলে। ডে-লাইটের আলো দেওয়াল ফুঁড়ে কিছু কিছু ঘরের ভেতরেও এসে পড়েছে। দরজার ঝাঁপিটা শক্ত করে বন্ধ করে দিয়েছিল রজনী। দরজা খুলে রেখে শোয়ার কথা ভাবাই যায় না। এখন বাতাসের ঝাপটায় দরজাটা মাঝে

মাঝে অদ্ভুতভাবে নড়ে উঠছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের দফারফা হয়ে যাচ্ছে রজনীর।

কুলি ডেরায় অনেক রাত্ত অবধি চেঁচামেচি হয়েছে। এখন আর কারো গলার আওয়াজ নেই সন্ধ্যে অবধি ভেড়ি মেরামতির কাজেই আটকে থাকতে হয়েছিল সবাইকে। সারা দিন জলে কাদায় ভিজে পরিশ্রম করে রাতে আবার কি করে যে অত গলা ছেড়ে চেঁচামেচি করতে পারে সবাই, ভাবতে অদ্ভুত লাগে রজনীর।

বেশ কয়েকবার বারান্দায় বেরিয়ে এসে আকাশ দেখার চেষ্টা করেছে ও। আকাশের চেহারা আলকাতরার মতো কালো। দেখে বোঝার উপায় নেই দুর্যোগ সহজেই কাটবে কিনা। বর্ষাকালকেও এ বৃষ্টি যেন হার মানাল। আসলে ভাগ্যটাই খারাপ। একটার পর একটা ঝামেলার মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে ওদের। নইলে বলা নেই, কওয়া নেই, ভেড়ি ওরকমভাবে ভেঙে যায়! গোটা ভেড়িটাকেই এবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আর কোথায় কোথায় ফাটল আছে কে জানে!

অন্ধকারে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রজনীর মনে হচ্ছিল, এত বাতাস আর এলোমেলো বৃষ্টির ছাট বনের দিক থেকেই যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে কাছারি-বাড়ির দিকে। জমাট বাঁধা অন্ধকারে গাছগাছালি ঝোপঝাড়ের আলাদা কোনো চেহারা নেই, কিন্তু বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলেই চকিতে যা একটু দেখা যায়। অরণ্য যেন ফুঁসছে। ফুলে ফুলে উঠছে। নেহাতই মানুষের মতো ছুটোছুটো করার ক্ষমতা নেই জঙ্গলের। থাকলে কাছারিবাড়িটাকে এক নিমেষেই কাদায় চটকে দিয়ে যেত। ক্রোধে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে আছে জঙ্গল।

রজনীর বুকের ভেতর গুরগুর করা কাঁপুনিটা থামতেই চায় না। সারাটা রাতই হয়তো আজ এরকম অবস্থা চলবে। কাল সকালেও যদি বৃষ্টি না থামে, সত্যি সত্যি ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে ওদের। দুর্যোগের এই চোট সামলে উঠতে না পারলে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না আর।

সহসা চমকে উঠল রজনী, কে যেন ফিসফিস করে বলল, এ বৃষ্টি আর থামবে না গো, হিঁ হিঁ—

—কে? আঁতিপাতি করে চারপাশে তাকাল রজনী। কৈ, কেউ নেই তো! অথচ স্পষ্ট ও শুনল কে যেন কথাগুলো বলল।

তবে কি ভুল শুনল রজনী! অসম্ভব, স্পষ্ট ও মানুষের গলা শুনেছে!

আবার একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতেই ওর মনে হল দূরের জঙ্গলটা যেন ডাইনে

বাঁয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। যেন ঐ দিক থেকেই কেউ লক্ষ্য করে কথা কয়টি ছুঁড়ে দিয়েছে।

রজনী এভাবে আর একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেল না। পা টিপে টিপে পিছিয়ে এসে ঘরে ঢুকে ঝাঁপ বন্ধ করে দিল।

সত্যি সত্যি কি মেয়েটাই এ সবের জন্য দায়ী। আবার গৌরীর মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কী কুক্ষণেই যে মেয়েটা এখানে এসে উঠেছে, কী ওর মতলব কে বলবে। অথচ মেয়েটার ব্যাপারে ও কাউকেই কিছু বোঝাতে পারল না। নৌকোর ছই দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে। জল পড়ে বলে ওকে এখানে কাঠুরেদের একটা ঘর খালি করে রাত কাটাতে দেওয়া হবে, এ কি কথা! রজনী হাজার চেষ্টা করেও দমাতে পারেনি ঈশানকে। ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করছে ঈশান।

রজনী ইচ্ছে করলে ঈশানের সঙ্গে লাঠালাঠি শুরু করে দিতে পারত, কিন্তু তাতে ঝামেলা আরো বাড়ত বই কমত না। তার চেয়ে আরো দুটো দিন অপেক্ষা করাই ভাল। নিশি আর চৈতন্য কলকাতা রওনা হয়ে গেছে। ওরা ছোটকর্তাকে বলে কি খবর নিয়ে আসে তারই অপেক্ষাতে ওর থাকা উচিত। সব কিছুই তাই হজম করে নিচ্ছিল রজনী।

ঘুম আসছিল না। বিছানায় কম্বল জড়িয়ে পড়ে ছিল রজনী। থেকে থেকে কেবল বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের শব্দ। কেউ যেন করুণ কণ্ঠে মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠছে। জঙ্গল এখন উদ্দাম নৃত্য করতে করতে ওর ঘরের চারপাশে এসে যেন ভিড় জমিয়েছে। ফিসফিস করে কথা বলছে বাইরে। কারা ওরা! অশরীরী প্রেতাত্মারাই কি ভিড় করে অপেক্ষা করছে ঘরের বাইরে। কে জানে!

ধ্যুৎ! কী সব অলক্ষুণে ভাবনা এসে ঘিরে ধরছে ওকে। রজনী উঠে এক গ্লাস জল খেল। আর এমন সময় সকল ইন্দ্রিয় ওর বেহালার তারের মতো টান টান হয়ে উঠল। ভুল নয়, কেউ যেন সত্যি সত্যি ওর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঠুক ঠুক করে শব্দ করছে। চমকে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল রজনী। কে হতে পারে!

নাকি কেউ নয়। সেই আগের মতোই ভুল শুনেছে রজনী। হয়ত বাতাস ছাড়া আর কিছুই এখন বাইরে নেই। মনে পড়ে গেল, এক ডাকে কখনো সাড়া দিতে নেই। কেউ যদি ডাকে, সাড়া দেবে না রজনী।

কিন্তু আবার শব্দ। কেউ যেন চাপা গলায় ডেকে উঠল, রজনী। কে হতে পারে! কে!

রজনীর সারা দেহে নিমেষে ঘাম জড়িয়ে এল। এখন কী করা উচিত।

দরজাটা খোলা উচিত। এমনও তো হতে পারে, ও যা ভাবছে তা নয়। সত্যি সত্যি কেউ এসেছে। বিশেষ প্রয়োজনেই রজনীর কাছে এসেছে।

না, কে আসবে এত রাতে। আর এলে অত ফিসফিস করেই বা ডাকবে কেন। এমনও তো হতে পারে দরজা খুললে সত্যি সত্যি অশরীরী কিছু বাতাস ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না ওর।

আবার শব্দ। কেবল শব্দই না। দরজাটাকে স্পষ্টতই ও নড়তে দেখল। কেউ যেন দরজায় ধাক্কা দিয়ে রজনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

রজনী আর অপেক্ষা করল না। নির্ঘাত কেউ এসেছে। দরজার কাছে এগিয়ে এসে ধীরে দরজা খুলল।

—কে?

লোকটা জলে ভেজা। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে পড়ল, আমি। আমি লক্ষ্মণ।

রজনী যেন সত্যি সত্যি ভূত দেখছে। এত রাতে? কি হয়েছে?

লক্ষ্মণ বলল, কথা আছে, একটু বসব।

রজনী বাইরে ঘোর অন্ধকারের দিকে চোখ বুলিয়ে আবার দরজা ভেজিয়ে দিল।

—একদম ভিজে গেছ দেখছি। কি হয়েছে?

লক্ষ্মণের চোখে অদ্ভুত এক আতঙ্ক জড়ানো। বৃষ্টিতে ভেজার জন্য যে খুব একটা অসুবিধা হয়েছে এমন নয়। আঁচলের খুঁট দিয়ে ও মাথা মুছে নিল। ওর দুশ্চিন্তাটা যে ঠিক কোথায় ধরতে পারল না রজনী।

—আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি হুজুর। এমন জানলে পাদরিপাড়া ছেড়ে বেরুতাম না। হুজুর সম্বোধনটা বড় অদ্ভুত লাগল রজনীর।

লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল।

—কী কুক্ষণেই যে যাত্রা শুরু করেছিলাম।

রজনী এবার সারা গায়ে কম্বলটাকে ভাল করে জড়াতে জড়াতে বলল, এত রাতে কেন এসেছ সে কথা বল? কি হয়েছে?

লক্ষ্মণ টুলের ওপর বসে পড়ল। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, আমাকে রেহাই দিন হুজুর, আমাকে বাঁচান। এমন জানলে আমি কক্ষনো বেরুতাম না।

—মর জ্বালা, কি হয়েছে বলবে তো?

—গৌরীকে আপনারা ছেড়ে দিন হুজুর। আমি নাকে কানে খত দিচ্ছি, আর কখনো এদিকে এগোব না। আর কক্ষনো না।

—গৌরীকে আমরা ধরে রাখিনি। এক্ষুনি ওকে নিয়ে বিদেয় হলে, আমরাও বাঁচি।

—ঈশানকে তা হলে বলে দিন। ও কেন আমাদের মধ্যে নাক গলাবে? কেন, কেন আপনারা ওকে বারণ করছেন না?

ঈশান আমাদের কথা শোনে না। তোমার যদি সাহস থাকে, ওর মাথায় লাঠি মার, আমরা কেউ কিছু তোমাকে বলতে আসব না।

লক্ষ্মণ কেমন শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তার মানে, একটা অন্যায়কে আপনারা মেনে নেবেন? গৌরীকে আমি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি, ওর ভালমন্দ সব কিছু দেখার দায়িত্ব আমার।

—তা তো বটেই।

—তা হলে ওকে আপনারা নৌকো থেকে ভাগিয়ে আনলেন কেন?

রজনী বলল, আমরা আনিনি। আমরা ওকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই বাঁচি। যে এনেছে তার কাছে যাও। দাঙ্গা কর, মারপিট কর, বলেছি তো, আমরা কেউ তোমাকে কিছু বলব না।

লক্ষ্মণ ছটফট করে উঠল। ওর বুকের ভেতর যেন বাতাস আটকে আছে। উত্তেজনায় একবার উঠে দাঁড়াল, আবার বসে পড়ল।

—গৌরী ছেলেমানুষ। এখনো ও কিছুই বোঝে না। আর সেই সুযোগটা আপনারা নিতে চাইছেন।

রজনী এসময় কাছে ডাকল লক্ষ্মণকে, এদিকে এসো।

লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে এগোল, বলুন।

—দেখে তো মনে হচ্ছে, গায়ে গতরে ক্ষমতা কিছু কম নেই। কান্নাকাটি না করে মেয়েটাকে এখনই তুলে নিয়ে নৌকোয় তুলতে পারবে বল?

লক্ষ্মণ বলল, আপনারা দশজনে যদি ঝামেলা না করেন নিশ্চয়ই পারব।

—ঝামেলা আমরা কেউ করব না। যদি কেউ করে তা সেই ঈশান। মাথায় একটা কাটারি বসিয়ে দিতে পারবে না?

লক্ষ্মণ চুপ করে থাকল।

—অবশ্য আমরাও চেষ্টা করব ঈশান যাতে বাধা না দেয়। কিন্তু লোকটা বড় সোজা নয়।

লক্ষ্মণ বলল, কাছাকাছি থানা নেই? আমি থানায় যাব।

—তাহলে, তাই যাও। থানার দারোগাবাবু এসে তোমার গৌরীকে তোমার কোলে বসিয়ে দিয়ে যাবে। এতই যদি সাহস, তাহলে বেরিয়েছিলে কেন?

লক্ষ্মণ ফুঁসতে থাকে। প্রথমেই দাঙ্গা মারামারি করা উচিত হবে কিনা তাই থানার কথা ভাবছিলাম।

—জঙ্গলের কোনো কানুন নেই। থানার দারোগারা আসবে না।

লক্ষ্মণ চুপ করে থাকে। রজনী ওকে আরো কাছে ডাকল, সত্যি করে একটা কথা বল দেখি বাপু?

লক্ষ্মণ তাকায়।

—মেয়েটা তোমার কে? ওকে ফুসলিয়ে এনেছ কেন?

—ফোসলাব কেন? ওকে আমি ওর মার কাছে পৌঁছে দেব কথা দিয়েছি। আমি ওকে জানি হুজুর, ওর মতো মেয়ে হয় না।

—না না, তা কেন। এত লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে যে, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চোদ্দগুষ্টির পিত্তি চটকে যাচ্ছে।

লক্ষ্মণ রজনীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

—তোমরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের এই জঙ্গলে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, বাঁধ ভেঙে জল ঢুকতে শুরু করল। এত লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে কাদের ভাগ্যে জোটে বল দেখি।

—আমরা আর একদণ্ড এখানে থাকতে চাই না হুজুর। ঢের শিক্ষা হয়েছে আমাদের।

—মেয়েটাকে তুমি কতটুকু চেন?

—কেন?

—কেন কি? ক'দিন ধরে চেন ওকে?

লক্ষ্মণ বলল, সারা গায়ে মা শীতলার দয়া নিয়ে আমাদের ওখানে ভাসতে ভাসতে এসেছিল ও। ওকে সেবা করে আমরা ভাল করে তুলেছি। ও খ্রীস্টান হয়েছে নিজের ইচ্ছায়।

—ভাসতে ভাসতে কোথেকে এল?

লক্ষ্মণ ভুরু কুচকে তাকায়।

—ও যা বলেছে, সবটা যে সত্যি তা জানলে কি করে?

—ও ওর বাড়ির কথা বলেছে। সেখানেই ওকে নিয়ে যাব বলে বেরিয়েছি। মিথ্যে কথা বললে ও ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে বাড়ির কথা বলত না।

—সব বাজে কথা। দেশে ফিরে যাওয়ার কথাটাও মিথ্যে। ও আসলে এখানে আসবে বলেই চালাকি করেছে তোমার সঙ্গে।

—অসম্ভব। হতে পারে না। প্রতিবাদ করে লক্ষ্মণ।

—দু'দিন পরেই টের পাবে। আমায় কিছু বলতে হবে না, তুমিই টের পাবে। থাক গে, মেয়েটাকে নিয়ে এবার ভালয় ভালয় কেটে পড়। আমরা বাঁচি।

লক্ষ্মণ বলল, ঠিক আছে, কাল সকালে আমি ওকে নিয়ে নৌকোয় উঠব। আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন।

—ঈশানের ব্যাপারে হেস্তনেস্ত তোমাকেই করতে হবে। আমরা বাধা দেব না।

লক্ষ্মণ বলল, ঠিক আছে। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল।

রজনী বলল, যদি খুনখারাপিও কর, তা হলেও না। যেভাবেই হোক মেয়েটাকে নিয়ে পালানো চাই, ব্যাস।

লক্ষ্মণ দরজা অবধি এল। দরজা খুলবার জন্য হাত বাড়াতেই রজনী আবার ডাকল, ওহে, শোন শোন।

ঘুরে দাঁড়াল লক্ষ্মণ।

—এদিকে এসো। আমি বলি কি, কাল সকালে দশজনের মধ্যে হৈচৈ না বাধিয়ে এখন এই বৃষ্টি বাদলার রাতে কাজটা সেরে ফেললে হয় না। সবাই তো এখন ঘুমুচ্ছে।

লক্ষ্মণ একমুহূর্ত কি ভাবল, এখন?

—কেন অসুবিধে কি। এখন গোপনে কাজটা যদি সারতে পার সেটাই ভাল হয়।

লক্ষ্মণ আরো কিছুক্ষণ ভাবে, ঠিক আছে, কোথায় রেখেছেন ওকে? আমাকে দেখিয়ে দিন।

রজনী এগিয়ে এসে লক্ষ্মণের কাঁধে হাত রাখল, এসো দেখিয়ে দিচ্ছি।

দরজা খুলে রজনী বারান্দায় বেরয়। লক্ষ্মণও ওর পেছন পেছন বেরয়। জলের ঝাপটা এসে গায়ে লাগে ওদের। বৃষ্টি এখন তেমন একটা জোরে নয়, কিন্তু বাতাসের দাপট যেন আরো বেড়েছে। আর তেমনি অন্ধকার। সামনের কাঠুরে ডেরাগুলোকেও অন্ধকারে স্পষ্ট করে এখন চেনা যাচ্ছে না। তবু ঐ অন্ধকারের দিকেই আঙুল তুলে কোণের দিকে দেখায় রজনী, ঐ কোণের দিকে একটা ঘর বাদ দিয়ে। মেয়েটা একাই আছে।

এমন সময় বিদ্যুৎ ঝলকে এক পলক কাঠুরে ডেরার ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠল লক্ষ্মণের।

—কি হে চিনতে পারলে? ঐ কোণের দিকে একটা ঘর বাদ দিয়ে।

লক্ষ্মণ শুধায়, আর ঈশান কোন ঘরে?

—ঐ আশেপাশেই কোন ঘরে আছে। ঈশানের কথা না ভেবে সোজা চলে

যাও, মেয়েটাকে বুঝিয়ে বল। দরকার হয় ভুলিয়ে-ভালিয়ে নৌকোয় নিয়ে গিয়ে তোল।

—ঠিক আছে। লক্ষ্মণ আবার কোণের দিকে তাকায়।

রজনী শেষবারের মতো সাবধান করে দিয়ে বলল, কিন্তু আমি যে তোমাকে ঘর চিনিয়ে দিয়েছি, একথা যেন কেউ টের না পায়।

কথাগুলো লক্ষ্মণের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। লক্ষ্মণ মাথার ওপর হাত তুলে বৃষ্টি বাঁচাতে বাঁচাতে ছুটে গেল।

আবার বিদ্যুৎ ঝলক। আবার সমস্ত চরাচর আলোর রেখা সাপের মতো লেহন করে মিলিয়ে গেল।

রজনী আর এখানে দাঁড়ানো উচিত মনে করল না। চেঁচামেচিতে এখনই লোক জেগে উঠতে পারে। রজনীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে সন্দেহ করতে পারে। ফলে কোনো ঝুঁকি নিতে গেল না রজনী। সরে এসে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কিন্তু দরজা বন্ধ করে ওর ছটফটানি বেড়ে গেল। ঘরের মধ্যে এলোমেলো পায়চারি শুরু করে দিল রজনী।

লক্ষ্মণ ততক্ষণে এক ছুটে কাঠুরে ভেরায় উঠে পড়েছে। সারা উঠোন কাদায় অসম্ভব পেছল, কিন্তু বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না লক্ষ্মণ। ভেরায় উঠে পা টিপে টিপে ও কোণের দিকে চলে আসে। পেছনে তাকিয়ে দেখে, কাছারিঘরে আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কাছারিঘরের বারান্দায় যে ডে-লাইট জ্বলছে এতক্ষণ পর যেন ওর চোখে পড়ল। চারপাশের এই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঐ আলোটা যেন আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

একেবারে কোণের দিক থেকে একটা দরজা বাদ দিয়ে লক্ষ্মণ দ্বিতীয় ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। গৌরী কি একা রয়েছে ঘরে। কেমন যেন সন্দেহ হয়। যদি গৌরীর সঙ্গে আর কেউ থেকে থাকে। লক্ষ্মণের গলা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি লাঠিসোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকল লক্ষ্মণ। ঠাণ্ডায় হাতের আঙুলগুলি যেন সিঁটিয়ে আসছে। দু-একবার আঙুল ভাঁজ করে লক্ষ্মণ বুঝল, দেহের ভেতরে রক্ত যেন ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে আছে। দেহের এই অবস্থা নিয়ে জোর খাটানো যায় না। গৌরী যদি ঘর থেকে বেরুতে না চায় ওর কিছুই করার থাকবে না।

তবু লক্ষ্মণ দরজার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে ডাকল, গৌরী। গৌরী ঘুমুচ্ছ?

কোনো সাড়া পেল না লক্ষ্মণ।

দরজায় আলতো করে একটু চাপ দিয়ে দেখল, দরজা বন্ধ।

বিদ্যুৎ ঝলকে আবার ওর চোখে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত পরিবেশটা ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। দরজায় আরো একটু জোরে চাপ দিল লক্ষ্মণ। এই দুর্যোগের রাতে কেউ যে দরজা খুলে রেখে শোবে না তা জানাই ছিল। তবু বৃথা চেষ্টা করল দু-একবার। তারপর দরজায় টোকা দিতে শুরু করল, গৌরী, গৌরী।

ভেতরে কি কেউই নেই! নাকি ঘুমিয়ে পড়েছে বলে শুনতে পাচ্ছে না! এমনও তো হতে পারে একা এরকম একটা ঘরে থাকার সাহস না পেয়ে গৌরী এখন ঈশানের কাছে গিয়ে—

কথাটা ভাবতেই আরো উত্তেজনা বেড়ে গেল ওর। আবার ধাক্কা দিতে শুরু করল লক্ষ্মণ, গৌরী, শুনছ? লক্ষ্মীটি দরজা খোল না, আমি লক্ষ্মণ।

অনবরত বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। অনবরত চোখে ঘোর লেগে যাচ্ছে লক্ষ্মণের। উত্তেজনা ঢেউয়ের মতো সারা শরীরে যেন দোল খেয়ে যাচ্ছে।

বেশ একটু জোরে জোরেই ধাক্কাতে শুরু করে লক্ষ্মণ। ওর গলার স্বরেও জোর বাড়ে, গৌরী, শুনছ গৌরী?

আর এ সময় ঘরের ভেতর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, কে?

চমকে উঠল লক্ষ্মণ। হ্যাঁ, গৌরীরই গলা।

উত্তেজনায় বেড়ার গায়ে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ল লক্ষ্মণ, আমি গৌরী, আমি লক্ষ্মণ।

কিন্তু আবার স্তব্ধতা নামল। দমচাপা অবস্থায় আরো বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লক্ষ্মণ। ভেতর থেকে দরজা খুলছে না দেখে আবার আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্মণ কঁকিয়ে ওঠে, একদম ভিজে গেছি গৌরী। ঠাণ্ডায় জমে গেছি, দরজা খোল।

—কেন এসেছ এখানে?

বেশ রূঢ় শোনাল গৌরীর গলা।

—আহা দরজা খোল না, বলছি।

—না, দরজা খুলব না, তুমি চলে যাও। তুমি চলে যাও লক্ষ্মণদা।

লক্ষ্মণ কিছুক্ষণ থমকে রইল। পরে দরজায় একটা লাথি কষিয়ে হেঁকে উঠল, খোল বলছি, আমি কিন্তু দরজা ভেঙে ফেলব।

ওপাশ নিরুত্তর। গৌরী কি দরজা খোলার জন্য এগোচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারে না লক্ষ্মণ। স্তব্ধভাবে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রইল ও। চারপাশে

আঁতিপাঁতি করে আবার কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে নিল। কাছারিঘরের বারান্দায় ডে-লাইটটা নির্বিকারভাবে জ্বলছে। চোখ ফিরিয়ে নিল, কি হল, খুলবে না ?

—বলেছি তো, তুমি চলে যাও।

—আমি চলে যাব। আমি চলে গেলে তোমার সুবিধে হয়, তাই না ? বেশ গায়ের জোরেই এবার ধাক্কাতে শুরু করে লক্ষ্মণ। পলকা গরান খুঁটির দেয়ালও থরথর করে কাঁপতে শুরু করে।

এমন সময় দরজা খোলার শব্দে থমকে দাঁড়াল লক্ষ্মণ। হ্যাঁ, দরজাটা ধীরে ধীরে ওর চোখের সামনে খুলে গেল।

—কি চাও ?

লক্ষ্মণ বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। এত অন্ধকার ভেতরে।

—কি চাও ? কেন এসেছ এখানে ?

গৌরীর প্রশ্বাসেরও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু—

লক্ষ্মণ অন্ধকারে একটা হাত সামনের দিকে এগিয়ে দিল, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি গৌরী। এসো, রাগ করো না, শোন।

লক্ষ্মণ ঘরে ঢোকবার জন্য পা বাড়ায়। আর ঠিক এসময় আবার সেই বিদ্যুৎ চমক। আলোতে একঝলক গৌরীকে দেখতে পেল লক্ষ্মণ। কিন্তু কি দেখল ও! ছিটকে দুপা পিছিয়ে এল, গৌরী! আর্তনাদ করে উঠল ও।

গৌরী বলল, খবরদার ঘরে ঢুকেছ তো আজ আমি মানুষ খুন করব।

—তোমার হাতে কি ওটা ? গৌরী তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

আবার বিদ্যুৎ ঝলসাতেই এবার স্পষ্ট গৌরীকে দেখতে পেল লক্ষ্মণ। এক হাতে একটা ঝকঝকে কাটারি। কোমরে শাড়ির আঁচল শক্ত করে জড়ানো। চোখ দুটো কী ভয়াবহ হয়ে উঠেছে ওর!

গৌরীকে এ মূর্তিতে ও দেখবে কল্পনাও করতে পারে না। এটাই কি ওর আসল রূপ, না কি ছলাকলা করছে ও। গৌরী কি শেষপর্যন্ত লক্ষ্মণের মাথার ওপরও ঐ কাটারির কোপ বসিয়ে দিতে পারে। কেমন দুর্বোধ্য হয়ে যায় সব।

লক্ষ্মণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

আবার একঝলক আলো। লক্ষ্মণ দেখল, ঘরের ভেতর একটা হরিণ। হরিণটাও যেন কেমন অদ্ভুত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পৃথিবীতে এত বিস্ময় কে জানত আগে!

ছাব্বিশ

কাশীপুর ঘাটে যখন নৌকো ভিড়ল তখন দিনের সূর্য ম্লান হয়ে এসেছে। আর বড়জোর ঘণ্টা খানেক পরেই গঙ্গার পশ্চিম পাড় দিয়ে সূর্য অস্ত যাবে।

নৌকো ঘাটের কাছাকাছি আসতেই সারা দেহে উত্তেজনার ঢল গড়াতে শুরু করল ওদের। নৌকোয় পাহাড় প্রমাণ কাঠের স্তূপ। তার উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিল নিশি আর চৈতন্য। এ ঘাটে ইতিপূর্বে ওরা কখনো আসেনি। ফলে, বিস্ময়টা ওদের মাত্রা ছাড়াল।

ওরা দেখল, ঘাটে আরো অসংখ্য নৌকো। ছোটয়-বড়য় নৌকোয় নৌকোয় জটলা। তারই মাঝখান দিয়ে মাঝি-মাল্লারা কায়দা-কসরৎ করে নৌকো এনে দাঁড় করাল একটা সুবিধে মতো জায়গায়। গেরাফি ফেলে দিয়ে ঘাটের খুঁটিতে রশি জড়াল। তারপর দুজন-একজন করে নৌকো থেকে নামতে শুরু করল।

সামনেই শশীরামের গো ডাউন। 'এল'-আকারের টিনের একচালা। নৌকোর ওপর বসেই টিনের একচালা সমেত শশীরামের গদি দেখা যাচ্ছিল। গদিতে ভারিক্কি মোটাসোটা চেহারার ঐ লোকটাই বোধহয় শশীরাম। শশীরাম না হলেও ওদের কোনো আপত্তি নেই। শশীরামের সঙ্গে ওদের দুজনের কোনো প্রয়োজন নেই। নৌকোয় কাঠ খালি করার জন্য মাঝি-মাল্লারাই শশীরামের সঙ্গে কথা বলবে। যে দু-একজন নৌকো থেকে নেমেছে তারাই ওর গদির দিকে এগোচ্ছে দেখতে পেল নিশিরা।

নৌকোর কাঠ খালাস করতে দিন চারেক সময় তো লাগবেই, বেশিও লাগতে পারে। এই ক'দিন কেবল কাজের কাজটুকু সেরে নিয়ে প্রাণ ভরে মজা লোট। কলকাতার হরেক মজা, যে লুটতে জানে সে লোটে। যে জানে না আঙুল চোষে।

নিশিকান্ত গোগ্রাসে ঘাটের চেহারা দেখছিল, ইট বিছোন একটা রাস্তা উত্তরে-দক্ষিণে গঙ্গার পাড় দিয়ে বয়ে গেছে। রাস্তার ওপারে বিজবিজ করছে বাড়িঘর। রাস্তার ধারে গ্যাসের আলোর সুন্দর সুন্দর পোস্ট। রাতে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠলে গঙ্গার জলে বিচিত্র খেলা শুরু হয়। সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠলে আর কথাই নেই। আজ চাঁদ উঠবে কিনা, উঠলে কখন উঠবে কে জানে।

চৈতন্য নিশিকে একটু আলতো করে ধাক্কা দিল, কি রে নামবি না?

নিশিকান্ত যেন হুঁশ ফিরে পেল, কোথায়?

—কোথায় মানে, ছোটকর্তার সঙ্গে দেখা করবি না?

—এখনি? নিশিকান্ত একটা হাই কাটল, এই তো সবে এলাম। ছোটকর্তা তো আর পালিয়ে যাবে না, কাল সকালে যাবো।

—রজনীর চিঠিটা আগে দিয়ে আসা দরকার। এখন তো ঢের বেলা আছে। চল না, দেখা করে আসি। কলকাতাও দেখা হবে, কাজও হবে।

নিশি বলল, কলকাতা দেখতে চাস আমি রাজি আছি, কিন্তু ওখানে গেলে কখন ছাড়া পাব, তার কি ঠিক আছে? হয়ত বলবে, ধানে-চালে মেশা, তারপর আবার বেছে দে।

চৈতন্য বলল, খারাপটাই কেবল ভাবছিস, অন্য কিছুও তো হতে পারে।

—কি?

—হয়তো আমাদের দেখে ছোটকর্তা খুশিতে আটখানা হয়ে উঠবেন। আমাদের কাছে খবরাখবর জিজ্ঞেস করার পর ভূরিভোজ করিয়ে দেবেন।

নিশিকান্ত চৈতন্যের পিঠে একটা থামচা বসাল, তা যা বলেছিস, শ্বশুরবাড়ি কিনা! জামাই আদর করবে।

চৈতন্য নিজের যুক্তি থেকে নড়তে চাইল না, বলল, জামাই-আদর নাও করতে পারে কিন্তু একেবারে না খাইয়ে ছাড়বে না। তা ছাড়া এখানে বসে মশার কামড় খাওয়ার চেয়ে ঘুরে বেড়ানো ঢের ভাল।

নিশি বলল, বলছিস যখন, চল। তবে মাঝিরা আমাদেরও চাল চাপাবে কিনা সেটা ভেবে দেখ। পরে ওখানেও খাওয়া হল না, এখানেও হল না। এমন যেন না হয়।

চৈতন্য বলল, কলকাতা যখন পৌঁছে গেছি, তখন খাওয়ার জায়গার অভাব হবে না। আমি তোকে মেয়েছেলের হাতের রান্না খাওয়াব, চল না।

নিশিকান্ত কেমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

চৈতন্য বলল, চল, জামা পরে নে। মাঝিদের বরং বলে আয় আমরা রাতে নাও ফিরতে পারি।

—ফিরবি না? কোথায় থাকবি?

—চল না, দেখতে পাবি, সারা রাত ফুর্তি করতে করতেই কেটে যাবে।

নিশি এবার ঝাঁকিয়ে বসল, কী ব্যাপার বল তো? কোথায় যাবি?

চৈতন্য বলল, প্রথমে ছোটকর্তার বাড়ি। সেখানে থেকে তোকে নিয়ে একটা জায়গায়। এমন জায়গা যে কাল সকালে তুই আমার পায়ের ধুলো নিবি।

নিশির চোখদুটো কেমন বড় বড় হয়ে গেল, বল না? এখনি তোর পায়ের ধুলো নিচ্ছি।

চৈতন্য উঠে দাঁড়াল। সবই বলব, আগে চল তো বেরুই। মাঝিদের বলে আয়।

চুলে যত্ন করে চিরুনি বুলিয়ে নিল চৈতন্য। এই কলকাতায় ফের দু-চার দিনের জন্য যখন আসা গেছে তখন একটু ফুর্তি-টুর্তি না করে যাওয়া বোকামি। এই কাশীপুর ঘাট থেকে গলিঘুঁজি ধরে হেঁটে এগোলে সোনাগাজির বেশ্যাপল্লী। যাত্রা শুরু করার পর থেকেই চৈতন্যের বুকের ভেতর ছুঁক-ছুঁক শুরু হয়েছিল। অথচ সরাসরি নিশিকান্তকে বলার মধ্যে একটু অসুবিধাও আছে। ছোটকর্তার সঙ্গে দেখাটা সেরেই নিশিকে নিয়ে সটান ওদিক থেকে একবার ঘুরে আসতে বাধা কি!

বেশ্যাদের সামনে নিশি তো নিশি, স্বয়ং মহাদেব অবধি চোখ উল্টে পানি খেতে শুরু করবে।

নিশিও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, বল না ভাই, কোথায় রাত কাটাব আজ? চৈতন্য হাসল, হাসিটা অর্থবহ। বলল, এমনও তো হতে পারে ছোটকর্তা আমাদের ছাড়তে চাইলেন না। বললেন, ওহে, তোমরা এত কষ্ট করে এয়েছ রাতটা এখানেই থেকে যাও।

—হ্যাঁ, তা বলবে বইকি! তোর জন্য ছোটকর্তা বিছানা বালিশ পেতে মশারি টানিয়ে বসে আছেন দেখ গে যা।

চৈতন্যর চোখ সোডার বোতলের গুলির মতো চকচক করছিল, ছোটকর্তা যদি ঠাঁই না দেন, ঠাঁই দেওয়ার লোক বার করে নেব, চল। নিশিকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে চৈতন্য নৌকো থেকে নেমে পড়ল।

একটু এগোতেই রাস্তার দু'পাশে বিরাট বিরাট বাড়ি। এক একটা বাড়ি দুর্গের মতো। বাড়িগুলোর গা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে ওরা স্যাঁতসেঁতে শীতল গন্ধ পেল। গন্ধটা এই কলকাতারই। চৌধুরী আবাদে গেলে নোনা কাদা আর ঝোপ-ঝাড়ের সবুজ গন্ধ, এখানকার গন্ধ অন্যরকম। এই গন্ধের একটা আলাদা আমেজ। চৈতন্য যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতেই হাঁটছিল, আজ শালা সোনাগাজিতে রাত কাটাব, যা থাকে কপালে।

চিৎপুরের কাছাকাছি এসে চৈতন্য নিশিকে উত্তেজিত করার জন্য বলল, তুই কখনো খারাপ পাড়ায় যাসনি নিশি?

নিশিকান্ত কেমন দুর্বোধ্য চোখে তাকাল, খারাপ পাড়া মানে ?

—খারাপ পাড়া বুঝিস না ? তুই তো আগে টানা দু' বছর কলকাতায় কাটিয়েছিস ?

—তা কাটিয়েছি।

—কোথায় ?

—ভবানীপুরে। এক সাহেবের বাড়িতে। সেখানে সাহেবের কুকুর দেখাশোনা করতাম। অবশ্য সে অনেক কাল আগের কথা।

—তা হলে মরতে ঐ বাদায় গেলি কেন ?

নিশি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, আসলে কোনো জায়গাতেই এক নাগাড়ে বেশি-দিন থাকতে পারি না আমি

—তার মানে তুই বাদাতেও থাকবি না ?

নিশি ঠিক বুঝতে পারছিল না চৈতন্যকে। কি যে ও বোঝাতে চাইছে কে জানে। বেঁটে লোকগুলির ঐ এক মজা, ভিতরে ভিতরে কি যে ভাবে, ঈশ্বরও বলতে পারে না। হেসে বলল, থাকব বলেই তো গেছি। এখন দেখা যাক্।

—ওখানে না থাকলে তোরই ক্ষতি। আমি একটা উপদেশ দেব ?

—দে।

—একটা বিয়ে করে বৌ নিয়ে গিয়ে ওখানে পায়ের ওপর পা তুলে বসে পড়্। জায়গা জমি পাওয়া যাবে, বাড়ি বানাবার টাকা পাওয়া যাবে, আর কি চাই।

—বিয়েটা তুই আগে কর। তোর দেখাদেখি আমি করব।

চৈতন্য আবার অর্থবহ হাসল, বিয়ে বলতে ঠিক যা বোঝায়, সে রকম কিছু আমার কপালে নেই। আমি অন্য কথা ভাবছি।

নিশি তাকিয়ে থাকে, কি ?

—আমি যা ভাবছি শুনলে তুই আমাকে মারতে আসবি।

—আহা বল না। এত ভ্যানভ্যান করার কোনো মানে হয় না।

চৈতন্য বলল, হাসবি না বল ?

—হাসব কেন ? নিশি ওকে আশ্বস্ত করল।

—তা হলে বলেই ফেলি। তুই কখনো সোনাগাজি গেছিস ?

নিশি এমনভাবে তাকাল যেন সোনাগাজি শব্দটা ও নতুন শুনছে।

—কি রে, গেছিস কিনা বল না ? যদি গিয়ে থাকিস তা হলে তোকে বোঝাতে আমার সুবিধা হবে।

নিশি মাথা ঝাঁকাল, না, ও যাইনি।

বেশ তো আজ তোকে ওখানেই নিয়ে যাব। দু-চারটে মেয়ের সঙ্গে আমার জানা-শোনা আছে। তোর যদি পছন্দ হয় তুইও একটা নিতে পারিস।

ট্রাম রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে সামলে উঠল নিশিকান্ত।

—কি, যাবি তো? চল না, তোর ভাল লাগবে। আসতেই ইচ্ছে করবে না।

নিশি বলল, আগে যেখানে যাচ্ছি সেখানে চল।

—সেখানে তো যাবই, তবে ফেরার পথে যদি একবার ওদিকে ঘুরে যাওয়া যায়, তাই বলছিলাম। তা ছাড়া কবে আবার কলকাতা আসব তার কি ঠিক আছে।

নিশি বলল, এই জন্য তুই কলকাতা আসার জন্য অমন ছটফট করছিলি? শালা তোর পেটে পেটে এত।

চৈতন্যের চোখে রহস্যময় হাসি। জিভ বুলিয়ে একবার ঠোঁট চাটল চৈতন্য। তারপর হাসতে হাসতেই বলল, কলকাতার মতো জায়গা হয়! নেহাত উপায় নেই তাই বাদা জঙ্গলে পড়ে আছি।

—ঠিক আছে, তুই তাহলে এবার একটাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল। বাদায় বসেই ফুর্তি করতে পারবি। রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে।

চৈতন্য বলল, নিয়ে যেতে তো আপত্তি নেই কিন্তু সব শালা ছিঁড়ে খাবে যে। সবাই যদি একটা একটা করে নেয় তা হলে এক কথা। যে যারটা নিয়ে পড়ে থাকতে পারে।

নিশিকান্ত যেন চৈতন্যকে নতুন করে চিনতে পারছিল। এত দিন এক সঙ্গে বাদায় কাটিয়ে কিছুই ওর টের পাওয়া যায়নি। আজ যেন নিজেকে পুরোপুরি খুলে ধরেছে চৈতন্য। বলল, সবার কথা ছাড়, তুই নিয়ে যেতে চাস তো চল।

চৈতন্য এমন সময় খপ করে নিশির হাতটা চেপে ধরল, তুই তাহলে ভরসা দিচ্ছিস নিশি? সত্যি সত্যি তোর আপত্তি নেই তা হলে?

—আমার আপত্তিতে কী-ই বা আসে যায়। তুই যদি চাস ছোটকর্তাকে আমি বলতে পারি তোর হয়ে।

—এই শালা, ছোটকর্তাকে বলবি কি রে। পিঠের চামড়া তুলে নেবে।

—কেন? চামড়া তুলবে কেন?

—কেন বুঝিস না? হাত দিয়ে ভাত খাস না? সাধে তোকে জংলি বলে।

নিশি হাসল, ঠিক আছে, বলব না তাহলে, তোর যা ইচ্ছে তাই হবে। চল এবার।

সদর রাস্তা ধরে ওরা হাঁটছিল। থোকায় থোকায় মানুষ, গাড়িঘোড়া, বড় বড় বাড়ি, রাস্তার পাশে নর্দমা। বাতিওয়ালারা গ্যাসের আলো জ্বালাতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও কলের গান বাজছে। পানের দোকানের সামনে ছড়ি হাতে বাবু ঘুরছে। বাড়ির ওপরতলা থেকে কে যেন এক বালতি নোংরা জল রাস্তায় ফেলে দিয়েই আবার সরে গেল। ভাগ্যিস সে সময় সে বাড়িটার নিচে দিয়ে যাচ্ছিল না ওরা। গেলে একটা কীর্তিই হত।

রাস্তায় চলতে চলতে দু'বার একবার এর-তার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি যে না হল এমন নয়। এতে কোনো দোষ নেই। কলকাতার রাস্তায় মানুষ এইভাবেই হাঁটে।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ওরা শোভাবাজার চৌধুরী রাজাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। চৈতন্য নিশির হাত টেনে ধরল, ছোটকর্তাকে কিন্তু ওসব কথা কিচ্ছু বলিস না নিশি। ভুলেও বলিস না। বললে তুইও মারা পড়বি, আমিও।

নিশি হাসল, না না, মাথা খারাপ।

বিরাট বাড়িটার অংশবিশেষ ওদের চোখে পড়ছে। সদর গেটের পাশেই দারোয়ানের ঘর। দারোয়ান লোকটাকে চোগাচাপকান পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। লোকটা কেমন শান্ত গোবেচারা ধরনের।

চৈতন্য বলল, চল, ঢুকে পড়ি। রাত হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দেখা দিয়েই কেটে পড়ব।

ওরা সদর গেট দিয়ে দারোয়ানের তোয়াক্কা না করেই ঢুকে পড়ল। দারোয়ান বিন্দুমাত্র বাধা দিল না ওদের। হয়তো কুকুরের মতো লোকটারও প্রচণ্ড ঘ্রাণশক্তি। ঘ্রাণ নিয়েই যেন বুঝতে পেরেছে নিশিরা বিপজ্জনক নয়।

কিন্তু গেট পেরিয়ে খানিক ভেতরে ঢুকেই একটু থমকে দাঁড়াতে হল। বিরাট কয়েক বিঘার উঠোন। দু'পাশে ফুলের কেয়ারি, মাঝখান দিয়ে মোরাম বিছানো রাস্তা। খালি পায়ে এই মোরামের ওপর দিয়ে হাঁটতে পায়ের নিচে সুরসুর করে ওঠে। রাস্তার দু'পাশে জোড়ায় জোড়ায় শ্বেত পাথরের পরী। সারা দিন ঐ মূর্তিগুলো ঐভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, রাত হলেই যেন ডানায় ভর করে উড়তে উড়তে খেলা করে বেড়ায়। রাত মানে গভীর রাত। মূর্তিগুলো ভীষণভাবে চোখ টানল ওদের। রাজা-মহারাজাদের কত যে খেয়াল ভাবতেই অদ্ভুত লাগে।

কিছুক্ষণের জন্য মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। এতবড় বাড়িটার ঠিক কোনখানে যে ছোটকর্তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কে জানে! আচ্ছা এক ঝামেলাতেই পড়া গেল দেখছি।

এমন সময় হঠাৎ কাঁসর-ঘন্টা বেজে উঠতেই ওরা চমকে উঠে দেখল, ওপাশে একটা দেবমন্দির। জনা কয়েক লোক ওখানে দাঁড়িয়ে। মন্দিরে বোধহয় আরতি শুরু হল।

নিশি বলল, চল মন্দিরের কাছে যাই। ওখানেই জিজ্ঞেস করা যাবে।

মন্দিরের কাছাকাছি ওরা এগিয়ে আসে। মন্দিরের বাঁধানো চাতালে জনা কয়েক মহিলা বসে আছেন, হাড়-জিরজিরে একটা ছেলে ওপাশে কাঁসর পিটছে। মন্দিরের ভেতরে পূজারী ব্রাহ্মণ ঘন্টা হাতে আরতি শুরু করেছেন। সোনার কাজ করা নরনারায়ণের মূর্তির দিকে চোখ পড়তেই ভক্তিতে কেমন বুকের ভেতরটা গদ্‌গদ হয়ে উঠল নিশিকান্তর। মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করল। নিশির দেখাদেখি চৈতন্যও প্রণাম করল। তারপর ওরা বেশ কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ক্ষণিক পরে নিশিকান্ত চমকে উঠল, ওপাশে কে যেন ওদের ডাকছে।

—আজ্ঞে, আমাদের বলছেন ?

—কি চাই এখানে ? লোকটার পরনে ফিনফিনে ধুতি, গায়ে একটা ফতুয়া। ধুতিটা এত ফিনফিনে যেন কাঁচের মতো, পায়ের লোমগুলিও দেখা যায়। লোকটার চোখ জুড়ে কেমন সন্দেহ।

চৈতন্য বলল, আজ্ঞে আমরা সোঁদরবন থেকে আসছি।

—সোঁদরবন, সোঁদরবন কোথায় ? লোকটা আরো দু-এক পা এগিয়ে এসে ওদের মুখোমুখি দাঁড়াল।

—আজ্ঞে, আমরা ছোটকর্তার কাছে এসেছিলাম। আমাদের রজনীভাই পাঠিয়েছে।

লোকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের পরীক্ষা করে নিল, তারপর বলল, ঐ কাছারি ঘরের দিকে চলে যাও। ওখানে গিয়ে খোঁজ কর।

নিশি আর চৈতন্য কাছারিঘরের দিকে এগিয়ে এল। এগিয়ে এসে ঘরে ঢুকবার মুখেই ছোটকর্তাকে দেখতে পেয়ে উৎসাহে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর গড় হয়ে মাটিতে প্রণাম করল।

নরেন্দ্রনারায়ণও একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবি, পায়ে চকচকে পাম্পসু। চওড়া পাড় ধুতি, জরি বসানো কাজ করা। হয়তো বাইরে কোথাও বেরুবার জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছিলেন।

—কি চাই ? প্রশ্ন করলেন নরেন্দ্রনারায়ণ।

—আজ্ঞে আমরা সোঁদরবনের বাদা থেকে আসছি। রজনীভাই আমাদের পাঠিয়ে দিলে।

নরেন্দ্রনারায়ণের ভুরু কুঁচকে উঠল, বাদা থেকে। কেন? কি হয়েছে?

—আজ্ঞে হুজুর, ভীষণ গোলমাল শুরু হয়ে গেছে ওখানে। রজনীভাই চিঠি দিয়েছে।

চিঠিটা হাতে তুলে নিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। তারপর ওদের টেনে নিয়ে এলেন ঘরের ভিতর। গদির পাশে বাঘের চামড়ায় ঢাকা একটা সুন্দর মেহগনি কাঠের চেয়ার, সেই চেয়ারে বসলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। হাতের রুপো বাঁধানো ছড়িটা জুতোর ওপর ঠুকতে ঠুকতে চিঠিটা পড়ে নিলেন।

—ভেড়ি ভেঙেছিল? সারাই হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। সারাটি দিন ভেড়ি বাঁধতে হয়েছিল আমাদের।

—যে মেয়েটাকে নিয়ে ঈশান গোলমাল পাকাচ্ছে, তাকে দেখেছিস?

চৈতন্যের চেয়ে নিশিই সড়গড় হয়ে উঠেছিল বেশি, বলল, দেখব না মানে, খুব দেখেছি হুজুর।

—এই মেয়েটা সেবারও এসেছিল বলে লিখেছে।

—হ্যাঁ হুজুর। সেই মেয়েটাই। তবে সেবার ব্যামো নিয়ে এসেছিল।

—আর এবার নাকি আর একটা লোক নিয়ে এসেছে? কি চায় ওরা?

সত্যিই তো কি চায়। নিশি বা চৈতন্য কেউই জবাব খুঁজে পেল না।

—তা ছাড়া রজনী লিখেছে, ঈশানের সঙ্গে নাকি মেয়েটার গোলমাল আছে, কি গোলমাল?

—আজ্ঞে হুজুর, ঈশান মেয়েটার সঙ্গে নৌকোয় বসে ওদের ভাতও খেয়ে এসেছে।

—তাতে কি হল?

—আজ্ঞে হুজুর, ও সব খারাপ মেয়ে ওদের সঙ্গে না মেশাই ভাল।

—খারাপ মেয়ে কেন? কি করেছে তোদের?

—আজ্ঞে হুজুর, ওর জন্যই তো ভেড়ি ভাঙল, বর্ষা নামল। রাতে বাঘ এসে কাছারিবাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝলেন এদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলা বৃথা। এরা যদি মেয়েটাকে অপদেবী বলে বিশ্বাস করে ওর বাধা দেওয়াও উচিত নয়। বললেন, থাক গে, বুঝলাম অপদেবী এসেছে। কি করতে হবে আমাকে?

—আজ্ঞে হুজুর, আমাদের সবার ইচ্ছা বনবিবির পুজোটা এবার সেরে নেওয়া ভাল। বনবিবিকে সন্তুষ্ট রাখলে সব বিপদ আমাদের কেটে যাবে।

—বেশ, হবে পুজো। কবে করতে চাস?

—আজ্ঞে হুজুর, পুজো দিতে হবে বলেই আমাদের দু'জনকে রজনীভাই পাঠিয়ে দিলে। কিভাবে পুজো করতে হয় আমরা তার কি জানি হুজুর। এখান থেকে বামুন পুরুত নিয়ে যেতে হবে।

—ঠিক আছে, দেব বামুন পুরুত। তোরা কবে এসেছিস ?

—এই তো সবে নৌকো থেকে নেমেছি হুজুর। নেমেই ছুটতে ছুটতে আসছি।

—কবে ফিরবি তোরা ?

নিশিই বলল, নৌকো থেকে কাঠ নামাতে যে ক'দিন লাগে, তারপরই আমরা ফিরে যাব।

—বেশ, কাল সকালে তাহলে আর একবার। দক্ষিণেশ্বর চিনিস ?

—আজ্ঞে, নাম শুনেছি। চিনে নেব।

—ওখানে দয়াল ঘোষ আছে। কাল সকালে এসে আমার একটা চিঠি নিয়ে যাবি। ওর সঙ্গে দেখা করবি।

নিশি আর চৈতন্য তাকিয়ে থাকে।

—দয়াল ঘোষকে সব খুলে বলবি। ঐ তোদের সব কিছু বন্দোবস্ত করে দেবে। রজনী কেমন আছে ?

—আজ্ঞে ভাল হুজুর।

—মকবুল ?

—ভাল।

—আর সেই পাগলাটা। কি নাম যেন, হ্যাঁ শুকদেব ?

—শুকদেবও ভাল হুজুর।

হয়তো আরো কয়েকটা নাম মনে এসেছিল নরেন্দ্রনারায়ণের কিন্তু ওদিকে সদরে গেটের বাইরে একটা টমটম অপেক্ষা করছে ওর জন্য। আপাতত নিশি আর চৈতন্যকে বিদেয় করার জন্য আর দু'-একটি প্রশ্ন করলেন, কতটা কাজ হয়েছে আমরা চলে আসার পর ?

—আজ্ঞে হুজুর, অনেকটা সাফ হয়ে গেছে। কিন্তু বনবিবির পুজোটা হলেই ঝড়ের মতো কাজ হবে। পুজোটা হচ্ছে না বলেই সবার খুব মন খারাপ হুজুর।

—ঠিক আছে, কাল সকালে এসে আমার চিঠি নিয়ে যাস।

নরেন্দ্রনারায়ণ আর দাঁড়ালেন না। ওদিকে মন্দিরে তখনো ঘটাং ঘটাং করে একটানা কাঁসর পেটানো হচ্ছে। ওখানে ভিড়টা একটু বেড়েছে বলে মনে হল ওদের। নরেন্দ্রনারায়ণ দূর থেকে ঠাকুর প্রণাম সারলেন, তারপর বেরিয়ে পড়ার

মুখে আর একবার নিশিদের দিকে তাকালেন, পুজো হচ্ছে, প্রসাদ নিয়ে যাস। তারপর হনহন করে সদরের দিকে চলে গেলেন।

আরো কিছুক্ষণ নিশিরা ওখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পুজোপর্ব শেষ হতে হাত বাড়িয়ে প্রসাদ নিয়ে আবার গেটের বাইরে বেরিয়ে এল।

সদর রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলছে। ফিরিওয়ালা বরফের হাঁড়ি নিয়ে ফিরি করতে বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে দুটো-একটা গাড়ি, দুটো-একটা রিকশা। রাস্তার ধারে নর্দমা থেকে চামসে একটা গন্ধ আসছে। মরা ইঁদুর বেড়াল কোথাও পড়ে আছে কিনা কে জানে। গন্ধটা চৈতন্যকে আবার উত্তেজিত করতে শুরু করল। গোটা কলকাতা শহরেরই একটা উত্তেজক গন্ধ আছে। কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালে নেশার মতো আমেজ হয়।

চৈতন্য নিশির দিকে তাকাল, এবার কি করবি?

নিশি বলল, দেখলি তো আমার কথা, কি রকম মিলে গেল। রাজবাড়িতে খেতে হলে ভাগ্য করতে হয়।

চৈতন্য হাসল, খাওয়ার মধ্যে কি আছে। আমরা তো খাবার জন্য আসিনি। আমরা এসেছিলাম আমাদের কাজে, কাজ হয়ে গেছে, ব্যাস। তবে আসল কাজটা এবার সেরে আসি চল। সোনাগাজি বেশি দূর নয়।

নিশি চৈতন্যের চোখে চোখ রাখল, খুব গরম খেয়ে গেছে চৈতন্য। বলল, চল তাহলে, তুই যখন এত করে বলছিস।

চৈতন্য উত্তেজনায় নিশির হাতটা জড়িয়ে ধরল, জয় মা কালী, মুখ রাখিস মা। তারপর দুজনে আর কোনো কথা না বলে হাঁটতে শুরু করল।

সাতাশ

সারাদিন টনটনে রোদ গেছে। আকাশ পরিষ্কার, বিলকুল পরিষ্কার। সারাটা রাত যে অত বৃষ্টি আর এলোমেলো খ্যাপা বাতাস গেল, কে বলবে। সাবানজল দিয়ে আকাশটাকে ঘষেমেজে যেন আরো পরিষ্কার করে তোলা হয়েছে। কিন্তু বনের ভিতরে কাদা শুকুতে আরো দিন কয়েক সময় লেগে যাবে। কাছারি-বাড়ির চারপাশে, কি তেড়ির ওপারে কাদার স্তর সারাদিনের রোদে শুকিয়ে এসেছে। ওসব জায়গায় এখন হেঁটে চলে বেড়াতে লাঠিতে ভর না করলেও চলে।

সকাল থেকেই রজনী দলবল নিয়ে বন সাফাইয়ের কাজে লেগে গিয়েছিল। গাছের গায়ে কুড়াল চালাতে ভারি মজা। বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরঝর করে জলের ঝাপটা ভিজিয়ে দিচ্ছিল কাঠুরেদের। জলের ফোঁটা যেন বরফের কুচি, সারা গা ঝনঝন করে উঠছিল। তাই নিয়ে কোস্তাকুস্তি-লাফালাফি বনের ভিতরে কাদায় সারাদিন পা ডুবিয়ে রেখে ডেরায় ফিরে এসে আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা সেঁকতে বসে গিয়েছিল সবাই।

রাতের দিকে শুরু হল কনকনে ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা যে অত প্রচণ্ড আকার ধারণ করবে তা আগে টের পাওয়া যায়নি। বনের ভিতর ঘন অন্ধকার নেমে আসার আগেই শুকদেব আর জগন্নাথ জয় দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়েছিল। বনের ভিতর যে মাচা বানানো হয়েছে, সেখানে ওরা রাত কাটাবে আজ। ভারী একজোড়া কম্বল ওরা কাঁধে ফেলে গাছে উঠে বসেছিল। বন্দুকের ধাতব নলটা শুকদেবের খোলা উরুতে একবার লাগতেই ছ্যাঁৎ করে সারা গা ঝাঁকি খেয়ে উঠল। বাপ রে কী ঠাণ্ডা! গায়ে পিঠে ভাল করে কম্বল জড়িয়েও যেন শীত দমাবার উপায় নেই। আগুনের কুণ্ডলি জ্বালিয়ে হাত পা সেঁকে নিতে পারলে রক্ষা পাওয়া যেত।

শুকদেবের পাশটিতে গায়ে গা লাগিয়ে বসেছিল জগন্নাথ। গামছায় করে রাতের খাবার বেঁধে আনা হয়েছে। খাবার পুঁটলিটা সামনে পড়ে আছে। আর একপাশে গাছের ডালে একটা জলভরা ঘটি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। জল জমে বরফ হয়ে গেছে কিনা কে জানে! এই ঠাণ্ডায় জল খাওয়ার হয়তো প্রয়োজনই হবে না।

ওরা যখন মাচায় এসে বসল, তখনো পুরোপুরি রাত হয়নি। মাচায় উঠে বসার পর ধীরে ধীরে ওদের চোখের সামনে সন্ধ্যার ইন্দ্রজাল গড়াতে শুরু করল। সন্ধ্যাকে স্বাগত জানাল গাছগাছালির পাখি। এত পাখি, এত শব্দ, এত রঙ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিল ওদের। অন্ধকারটা ঢেউয়ের মতো ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে সমস্ত বনভূমির ওপর যেন আছড়ে পড়ছিল। বেশ কিছুক্ষণ ঐ অবস্থায় কেটেছিল ওদের। তারপর পাখির শব্দ থেমে গেল। রঙের সমস্ত কারিকুরি মুছে গেল। নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে গেল ওরা।

আকাশে আজ অসংখ্য তারা ফুটে উঠেছে। এত উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ আর কোনো দিন দেখা গেছে কিনা, কে জানে! কিছুক্ষণের জন্য যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল ওদের। তারপর হঠাৎ এক সময় মনে হল আকাশের সমস্ত নক্ষত্র যেন নিচে নেমে এসে গাছের ডালে পাতায় মাটিতে বিছিয়ে পড়েছে। ছুটোছুটি করে বেড়াতে শুরু করেছে ওদের ঘিরে। ওগুলো যে জোনাকি প্রথম দিকে ওরা ধরতেই পারেনি।

আর একটু রাত হতে হঠাৎ আলোর ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যি জুড়ে। বনের গভীরে চন্দ্রোদয় মানুষকে পাগলও করে ফেলতে পারে।

শুকদেব আর জগন্নাথের ধাতস্থ হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। নিঃশব্দে আপাদমস্তক ঢেকে জঙ্গল আর প্রকৃতির এইসব কারিকুরি দেখল। এমন সময় শুকদেব নতুন করে যেন অনুভব করতে পারল, এই জঙ্গলেরও একটা আত্মা আছে। আত্মা কি? নিজের মনে মনেই প্রশ্ন করে শুকদেব। আত্মা হয়তো বাতাস। সেই বাতাস চোখে দেখা যায় না, তার স্পর্শ পাওয়া যায়। সামান্য একটু স্পর্শ দিয়েই সে যতটুকু ক্ষতি করার করে যেতে পারে। এরকম অবস্থায় এই জঙ্গলে এভাবে বসে বসে রাত কাটানো কতটা যুক্তিযুক্ত হচ্ছে কে জানে। ভাগ্যিস জগন্নাথটা ওর পাশে গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছে। অন্তত একজন আর একজনের কাছ থেকে সাহস নিয়ে সময়টুকু কাটিয়ে যেতে পারবে।

শুকদেব একটা হাই কাটল। ওর কণ্ঠনালী যেন শুকিয়ে অঙ্গার হয়ে আসছে। এক ছিলিম গাঁজা না হলে যেন বাঁচবে না শুকদেব।

—ধুশ্, শালা। এভাবে বসে রাত কাটানো যায়। চেঁচিয়ে উঠল শুকদেব। জগন্নাথ চমকে উঠেছিল, এই চেঁচাস না। বাঘ আসবে না।

—বাঘের বয়ে গেছে বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে আসতে। আর যদি আসেও এই অন্ধকারে কোনটা বাঘ কিছুই বোঝা যাবে না।

সন্দেহ নেই, নিচে যেভাবে ছায়া আর আলো, ঝোপকে মনে হচ্ছে ঢিবি, মাটিকে মনে হচ্ছে জল। শুধু জল বললেই যথেষ্ট হয় না, সারাক্ষণ যেন ঢেউ বইছে। কখনো কখনো চমকে উঠতে হচ্ছে, গাছের ডালকে মনে হচ্ছে স্কন্ধকাটা।

—এই জগা, স্কন্ধকাটা জানিস?

—সেটা কি আবার?

—ওদিকে দেখ। ঐ যে তে-কোণা হয়ে আলোটা ওদিকে নামতে নামতে মাটি ছুঁয়েছে ওদিকে দেখ।

জগন্নাথ আলোর দিকে তাকিয়ে শিটিয়ে উঠেছিল, সত্যিই তো, কি রে ওটা?

—স্কন্ধকাটা। হারামী জঙ্গলটা ওকে ওখানে ঝুলিয়ে রেখেছে, আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে।

—কি বল না? জগন্নাথ চোখ ফেরাতে পারল না।

শুকদেব হেসে উঠল, গাছের ডাল রে, গাছের ডাল। দেখছিস তো কেমন

ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে চোখে। ভাগ্যিস প্রথমেই আমি ওকে চিনতে পেরেছিলাম, নইলে তোর মতো আমিও ভেচকে যেতাম।

জগন্নাথ এবার চিনতে পারল, জঙ্গল ভেদ করে পিছলে পিছলে কিছু আলো এসে পড়েছে নিচে, তারই খানিকটা ঐ গাছের ডালে পড়ে একটা গলাকাটা মানুষ।

—আবার ওদিকে দেখ। আর এক পাশে আঙুল তুলে দেখাল শুকদেব।

জগন্নাথ চোখ ফেরাল। ওদিকে ফাঁকা মাঠের শেষ প্রান্তে কাছারিবাড়ির দিকে কিছু একটা দেখবে বলে আশা করেছিল জগন্নাথ, কিন্তু সমস্ত চরাচর জুড়ে যেন বরফ ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদের আলো আর কনকনে হিমে বরফ পড়ার কথাই মনে হল ওর। শুধাল, কি ওদিকে?

—ঐ ঘরগুলো দেখে কি মনে হচ্ছে তোর?

—কি আবার মনে হবে। মনে হবার কি আছে?

—মনে হচ্ছে না, নদীর জলে নৌকার মতো ওগুলো ভাসছে।

জগন্নাথ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, আমার ধারণা ডেরায় এখনো অনেকেই ঘুমোয়নি। মেয়েটাকে নিয়ে ফিসফিস চলছে। কি মজা ভেবে দেখ, মেয়েটাকে ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে এল লক্ষ্মণ, আর ঈশানটা ওকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে।

শুকদেব জগন্নাথের চোখে চোখ রাখল, কার গরু কে দুইবে দু-একদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে। আমাদের কি, আমরা কেবল পালা দেখব। হিঁ হিঁ—

জগন্নাথ চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া কাছারিবাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল। অর্ধচন্দ্রাকার ঝিলের গায়ে চাঁদের আলো পড়ে নিটোল একটা রুপোর পাতের মতো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ঝিলের জল এখন নিরেট। ওর ওপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে চলে বেড়ানো যায়।

—গৌরীকে কিন্তু রজনীভাই টিকতে দেবে না এখানে। দরকার হলে ও ঈশানকেও তাড়াবে।

—ঈশানও ছাড়বে না। ঈশানের মাথার গোলমাল আছে, ও এক কোপে রজনীর মাথা নামিয়ে দিতে পারে।

—লক্ষ্মণটাই শালা ভেড়া। বেশ তো মেয়েটাকে বার করে এনেছিস, অন্য কোথাও চলে যা। জেনেশুনে কেউ এখানে আসে।

শুকদেব হাসল, অন্য কোথাও যেতে পারলে তো। বনবিবির খেলা এসব। বনবিবিই ওকে টেনে এনেছে।

জগন্নাথ চুপ করে শুনল।

শুকদেব বলল, রজনী যে রাগারাগি করছে সত্যি সত্যি তার একটা কারণ আছে। মেয়েটার সম্পর্কে আমরা কেউই তেমন করে জানি না। ও যে সত্যি সত্যি অপদেবী নয়, কে বলবে। ওরই জন্য যে এতসব ঝামেলা হচ্ছে না কে বলবে।

—কিন্তু, ঈশান এসব বিশ্বাস করে না। নৌকো থেকে ওই তো ওকে তুলে এনে ডাঙায় ঠাঁই দিল। আজ তো সারা দিন মেয়েটাকে সঙ্গে করেই ঈশান ঘুরঘুর করল।

—করুক। করুক না। সময় হলেই বুঝবে।

—কি বুঝবে?

শুকদেব হাসে, আগুনে হাত লাগলে লোকে কি বোঝে?

—খুলে বল?

শুকদেব সুর করে বলল:

বনের মধ্যে বনবিবির
কত রে ভাই খেলা,
এপাশ ওপাশ চতুর্দিকে
শুধুই গোলের মেলা।

জগন্নাথ কম্বলটাকে মাথার ওপর ঘোমটার মতো করে জড়িয়ে নিল। ঠিক আছে, আর তোকে গাইতে হবে না, এবার চুপ কর। চেঁচালে যাও বাঘ দেখা যেতে পারত তা আর যাবে না।

শুকদেব বলল, বেশ গাইব না। এবার ও দিকটায় তাকা।

—কোনদিকে?

—ঐ যে ..র বনের মাঝ বরাবর। কালো দৈত্যের মতো সব দাঁড়িয়ে আছে দেখ না।

জগন্নাথের বুকের ভেতর আবার ধড়াস করে উঠল, কি জানি বাবা কি ওগুলো। অসংখ্য কালো কালো দৈত্য যেন দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় সাদা পাথরের টুপি। টুপি না আলো। হ্যাঁ, চাঁদের আলো। আরো অনেকক্ষণ পর বোঝা গেল, ওগুলো দৈত্য নয়, গাছই। গাছগুলিকেই বুঝি এমন মনে হচ্ছে। রাত্রিবেলা এভাবে গাছের ডালে মাচায় বসে থাকার অভিজ্ঞতা জগন্নাথের এই প্রথম। ফিসফিস করে বলল, সত্যি সত্যি দৈত্যের মতো রে।

—সত্যি সত্যি মানে! বিশ্বাস করছিস না তো। দেখবি, একটা গুলি ছুঁড়ে দেখাব। কেমন চোট খেয়ে লাফাতে লাফাতে তেড়ে আসে, দেখবি।

বন্দুকটাকে জঙ্গলের দিকে তাক করে ধরতেই বাধা দেয় জগন্নাথ, এই, কি করছিস ?

শুকদেব হাসে, ভাবছিস, মাচায় বসে আছিস, ভয় কি, তাই না ?

—আহ্, বন্দুকটা নামা না। ছেলেমানুষী করিস না। গুলির শব্দ পেলে কাছারিবাড়ির ওরা সবাই ঘাবড়ে যাবে। ভাববে সত্যি সত্যি বুঝি বাঘ দেখেছি আমরা।

—বাঘ তো বাঘ। বাঘের চেয়েও ভীষণ হিংস্র ঐ জঙ্গলগুলো। তুই ওদের চিনিস না। ওরা আমাদের মাচা থেকে তুলে নিয়ে ও নদীর দিকে ছুঁড়ে ফেলতে পারে।

জগন্নাথ বলল, চুপ কর না বাপ। মিছিমিছি ভয় পাওয়াচ্ছিস।

শুকদেব থামবার পাত্র নয়। বলল, একশোটা বাঘ একসঙ্গে তেড়ে এলে যা হবে ঐ দৈত্যগুলো এক একটা হচ্ছে তাই।

—তুই থামবি কিনা বল ?

—কেন, সত্যি কথা শুনতে ভয় করে ?

—তোর মাথায় পোকা আছে। কেন যে তোর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম !

শুকদেব হিঁহিঁ করে হেসে উঠল, বনের মধ্যে বনবিবির কত রে ভাই খেলা।

জগন্নাথ আর ওকে বাধা দিল না। বাধা দিলেই ওর ফুর্তি বাড়ে।

গরান কাঠের মাচা। একভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না, গা-কোমর চিনচিন করে। জগন্নাথ একটু নড়েচড়ে আয়াশ করে নিল। তারপর আকাশের দিকে তাকাল, কে বলবে, এই আকাশটাই কাল অমন ঘন মেঘে ঢাকা ছিল। আজকের আকাশে যেন তারার জলসা।

একপাশে চাঁদ উঠেছে। পরিপূর্ণ গোল নয়। পূর্ণিমা আসতে এখনো দিন কয়েক হয়তো বাকি আছে। চাঁদটা যেন সম্মোহিনী জাদু জানে, চোখ ফেরাতে পারল না জগন্নাথ।

শুকদেব তাকাল, এই জগা, কথা বল। চুপচাপ থাকা যায় এভাবে ?

জগন্নাথ বলল, তুই বল। আমার কোনো কথা নেই।

—কথা নেই কি রে, ঈশানের সঙ্গে মেয়েটা সারাদিন কত কথা বলল, রজনীর সঙ্গে সেই ছোঁড়াটা কত কথা বলল, আর আমরা কিনা কথা খুঁজে পাব না !

—তা হলে ওদের কথাই বল।

—গৌরী তখন ঈশানের হরিণটাকে নিয়ে কি ন্যাকামি শুরু করেছিল দেখেছিস ?

—দেখেছি। হরিণটাকে নাকি দান করেছে ঈশান। মেয়েটা যদি এখান থেকে চলে যায় ওটাকেও নিয়ে যাবে।

—হরিণটার নাম রেখেছে ওরা জানিস ?

—হরিণের নাম ! কি নাম ? অবাক হয়ে তাকায় জগন্নাথ।

—তখন তো ওকে লক্ষ্মী লক্ষ্মী করে ডাকছিল মেয়েটা।

—লক্ষ্মী ! হরিণের নাম লক্ষ্মী ?

—কেন আপত্তি কি ! গরুর নাম যদি লক্ষ্মী হতে পারে, হরিণের নামও হতে পারে।

—গরু ঘরের লক্ষ্মী, কিন্তু তাই বলে হরিণ ?

হরিণও ওদের ঘরের লক্ষ্মী হবে।

—ওদের মানে, জগন্নাথ কৌতুকে তাকাল, ঈশানের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে হবে ভাবছিস ?

—হতেও তো পারে। আপাত্ত কি ?

—না, আমার আপত্তি নেই। তবে ও লক্ষ্মণের কি হবে ?

—লক্ষ্মণ কলা চুষবে।

—রজনী মেনে নেবে ?

—রজনীর মানা না মানায় কিছু যায় আসে না। ঈশান ওকে নিয়ে এই জঙ্গল থেকে পালিয়েও যেতে পারে। দেখ না কি হয় ?

খেলাটা যে বেশ জমেছে তাতে সন্দেহ নেই। জগন্নাথ বলল, লক্ষ্মণও ছেড়ে দেবে না। ঝামেলা না করে ও ছাড়বে না।

—রজনীও চাইছে লক্ষ্মণ ঝামেলা করুক। সারাদিন আজ লক্ষ্মণের কানে মন্ত্র ঢেলেছে রজনীভাই। দু-একদিনের মধ্যেই বড় রকমের খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে।

জগন্নাথ বলল, নিশি আর চৈতন্য তো কলকাতা গেল ওরা হয়তো ছোটকর্তাকে নিয়ে আসতে পারে। ছোটকর্তা এলে সবাই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

শুকদেব হাসল, ছোটকর্তা এলে আর একটা মজা হবে, সেই পিঠে ভাগের গল্পটা জানিস, সেরকম হবে।

—কি রকম ?

—লক্ষ্মণ আর ঈশানের রেশারেশি মেটাবার জন্য গৌরীকে উনি নিজের

কাছে রাখবেন। মেয়েটাকে শাড়ি গয়না কিনে দেবেন। কার পিঠে কে খাবে তখন ভেবে দেখ। হিঁ হিঁ—

চাঁদ অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে এর মধ্যে। জঙ্গলের গাছপালার ফাঁক দিয়ে মধু-ঝরে-পড়া চাঁদ। আলোর ফোয়ারায় যেন সমস্ত চরাচর ভেসে যেতে শুরু করেছে। জঙ্গলের ভিতরে সেই আলোয় বিচিত্র সব আলপনা, চোখে ঘোর লাগিয়ে দেয়। ওরা জঙ্গলের নিচে চোখ পাতল. আলো-ছায়া, মাটি, ঝোপঝাড় সব এখন একাকার।

বেশ কিছুক্ষণ ঐভাবেই কেটে গেল ওদের। শীত এখন গা সওয়া। মাথা কান ঢাকা থাকলে শীত অনেকটা শায়েস্তা হয়, জগন্নাথ নাক অবধি ঢেকে কেবল চোখ দুটোই বাইরে বার করে রেখেছিল।

—এই জগা ?

হঠাৎ আবার চমকে উঠল জগন্নাথ, কি ?

—শুনতে পাচ্ছিস ?

—কি ?

—শুনতে পাচ্ছিস না, শ্বাস টানার শব্দ হচ্ছে।

—শ্বাস টানার ! জগন্নাথ কেমন চোখে ঘোলা দেখল।

—হ্যাঁ রে, থেকে থেকে শ্বাস টানছে জঙ্গল। কিছু একটা মতলব মাথায় এসেছে ওর, তাই শ্বাস টানায় উত্তেজনা বাড়ছে।

জগন্নাথ শ্বাস টানার শব্দ শোনার জন্য কান পাতল। কিছুই ওর কানে এল না।

—কি রে শুনতে পাচ্ছিস ?

জগন্নাথ বিড়বিড় করে উঠল, কি কুক্ষণেই তোর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, থামবি ?

—এই ছাখ, সত্যি কথাটা বিশ্বাস করবি না তো। একটু কান পেতে চোখ বন্ধ করে লক্ষ্য করলে শুনতে পাবি।

জগন্নাথ চোখ বুজল, শ্রুতিনালীকে সতর্ক করল। এলোমেলো কিছু বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই ওর কানে এল না। বলল, বাতাস।

—বাতাসই তো। শ্বাস ছাড়লে বাতাসই বেরয়। বাতাস ছাড়া আর কি।

জগন্নাথ বলল, তুই থামবি ! আমরা এখানে গল্প করতে এসেছি, না বাঘ শিকারে। পিঠের শিরদাঁড়াটা শালা বাঁকা হয়ে গেল। তার উপর এই ভ্যাজর ভ্যাজর !

—ঠিক আছে, আমি কথা বললেই যখন তোর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন

আর বলব না। বন্দুকটাকে একপাশে সরিয়ে রাখল শুকদেব। কম্বলটাকে আবার জুত করে গায়ে জড়াল।

জগন্নাথও আর উচ্চবাচ্য করল না। জঙ্গলের গভীরে চোখ পেতে বসে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। আলোয় আর ছায়ায় বিচিত্র সব মূর্তি। স্থির নয়, উত্তেজিত, কখনো মনে হচ্ছে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। ফিস-ফিস করে যেন ষড়যন্ত্র করছে। যেন সত্যি ওদের ইচ্ছে নয়, মাচায় এভাবে দুটো উটকো লোক এসে সারারাত ধরে ওদের দিকে নজর রাখবে। ভেবেছে কি লোক দুটো! এমনভাবে ওদের শান্তি ছিনিয়ে নেওয়ার কি মানে হয়!

হঠাৎ যেন জগন্নাথই এবার শ্বাস টানার মতো শব্দ শুনল! ধুত, শ্বাস টানবে কে! এলোমেলো কিছু বাতাসই হয়তো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল। হ্যাঁ, বাতাসেরই শব্দ! স্থিরভাবে শুনলে শ্বাস টানার কথাই মনে আসে।

বাতাসই কি! সারা গা কেমন ঝাঁকি খেয়ে কেঁপে উঠল জগন্নাথের। বাতাসই যদি হবে, তবে ওদের গায়ে লাগছে না কেন? সারা গায়ে কম্বল জড়ানো থাকলেও বাতাস বুঝবে না তাও হয়। আবার জঙ্গলের দিকে চোখ পেতে বসে থাকল জগন্নাথ।

শুকদেবটা কি চোখ বুজে আছে! ঠিক ধরতে পারল না ও। অথচ ওকে ডাকতেও সাহস হল না আর। আবার চোখ ফেরাল মাটির দিকে। এই রকম আলো-ছায়ায় জন্তু-জানোয়ার আলাদাকরে চেনা যাবে কিনা সন্দেহ। ঐ যে হাত তিরিশেক দূরে ডোরা ডোরা বাঘের মতো আলো-ছায়া, ওটাকে যদি ও বাঘ বলে ভুল করে তাহলে কি কোনো ক্ষতি আছে! অনেকক্ষণ ধরে ঐ অদ্ভুতদর্শন আলো-ছায়ার দিকে ও তাকিয়ে থাকে। নাকি সত্যি একটা বাঘই ওখানে! হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকে ওর। চোখ ফেরাতে পারল না। ঝোপের একটা অংশ এমনভাবে ওর চোখের সামনে বাধা হয়ে আছে যে পুরোপুরি ডোরাকাটা আলো-ছায়ার রহস্যটা ও বুঝতেই পারল না।

বাঘই কি! ফিসফিস করে এবার শুকদেবকে না ডেকে পারল না ও।

—এই শুকু, ওদিকে ওটা কি রে?

শুকদেব নড়েচড়ে বসল, কোন দিকে?

—ঐ যে আলো-ছায়া মতো ডোরা ডোরা দেখাচ্ছে, ঝোপটার পাশে।

শুকদেব বিশ্বাসই করতে পারেনি, এত সহজে একটা বাঘ ওদের দৃষ্টিতে ধরা দেবে। বাঘ কিনা নিঃসন্দেহ হতে বেশ কিছু সময় লাগল ওদের।

—চিস্‌স্! শুকদেব ইঙ্গিত করল জগন্নাথকে, বড়ে মিঞা যে সন্দেহ নেই। নির্ঘাত শালা টের পেয়েছে আমরা এখানে বসে আছি।

বন্দুকটা শক্ত করে ধরে তাক করে বসল শুকদেব।

জগন্নাথের হাড়-পাঁজরায় থরথর করে কাঁপুনি শুরু হল। কাঁপুনিটা শীতের জন্য যে নয় তাতে ভুল নেই। পেটের ভেতর থেকে একটা ভয়ের গুরগুরি ঠেলে বুকের দিকে উঠতে শুরু করল।

ফিসফিস করে শুধাল, বাঘই যে বুঝছিস কি করে? একচুলও নড়ছে না ওটা।

—শিকারী বাঘ ওরকম ঘাপটি মেরে থাকে। এখন ও একটুও নড়বে না। ও আমাদের গতিবিধির দিকে নজর রেখেছে।

—যদি লাফিয়ে ওঠে?

—হিস্‌স্‌, আস্তে কথা বল।

—যদি লাফায়?

—এত উঁচু অবধি পারবে না।

আবার দুজনে কিছুক্ষণ নীরব রইল। এত ঠাণ্ডায়ও মনে হচ্ছে বুকে-পিঠে-কপালে যেন ঘাম জড়াতে শুরু করেছে।

জগন্নাথ হাঁপাতে হাঁপাতে শুধাল, বাঘ গাছে উঠতে পারে না?

—সুন্দরবনের বাঘ সব পারে।

—তবে?

—কি তবে? চুপ কর না।

জগন্নাথ চুপ করল। কিন্তু দেহটা এত জোরে জোরে কাঁপছে যে থামানো যাচ্ছে না।

শুকদেব বলল, আমাদের কাছে বন্দুক আছে ও জানে। ওরও প্রাণের ভয় আছে।

জগন্নাথের মনে হল শুকদেব ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু এখন আর সান্ত্বনার সময় নয়। বলল, গুলি কর না শুকদেব।

—দাঁড়া না, আর একটু না এগোলে গুলি ফালতু যাবে। চুপ করে বসে থাক।

আলো আর ছায়া, ডোরা ডোরা দাগ, সত্যিই কি বাঘটা ওরকম।

—এই শালা, এত নড়ছিস কেন? ডালটা ভাল করে ধরে থাক। পড়ে যাবি যে!

জগন্নাথ পিঠের ডালটাকে আঁকশির মতো ধরে বসল।

তারপর নিঃশব্দে মুহূর্তগুলি বয়ে যেতে শুরু করল। বনের মধ্যে ঐ ভূতের মতো, দৈত্যের মতো গাছগুলো কি মাথা ঝাঁকাচ্ছে মাঝে মাঝে। মাথা না দোলালে

ওরকম অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ আসছে কেন? কখনো মনে হচ্ছে খোলা গলার কান্না। কে কেঁদে উঠছে অমনভাবে। কখনো মনে হচ্ছে, কেউ ফিসফিস করে কিছু বলে গেল ওর পেছনে এসে। কি বলল! কখনো আবার কেউ যেন দূর থেকে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল! কিংবা ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে! দাঁড়িয়েই থাকছে যেন, আর নড়ছে না! কে ওরা? কি চায়? অমন করছে কেন? তবে কি এসব জঙ্গলেরই কারসাজি! আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে জঙ্গল! দুজন অসহায় মানুষকে পেয়ে ওদের যেন উল্লাসের আর শেষ নেই।

শুকদেবও সামনের ঐ ডোরাকাটা মূর্তিটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। চোখ ফেরানো সম্ভব নয় এখন। একবার গুলি ছুঁড়ে কি পরীক্ষা করে নেব! যদি বাঘ হয়, নির্ঘাত ফল পাওয়া যাবে। যদি না হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

—এই জগা, কি বলিস, গুলি করব?

জগন্নাথের গলা দিয়ে করুণ আর্তনাদ বেরুল, আমি কি বলব! আমি কি শিকারী! আমাকে জোর করে এখানে নিয়ে এসেছিস।

শুকদেব বলল, তাহলে আমি গুলিই করছি। বন্দুকটা উঁচিয়ে তাক করে ধরল শুকদেব। তারপর সেই আলো আর ছায়া, সেই ডোরাকাটা দেহটাকে তাক করে ট্রিগারে আঙুল সাজাল শুকদেব।

—হে মা বনদেবী, মুখ রাখিস। ট্রিগারে চাপ কষে দিয়ে মাচার ওপর কিছুটা লাফিয়ে উঠল শুকদেব।

তারপর অবর্ণনীয় সেই দৃশ্য। খান খান হয়ে আক্রোশে ভেঙে পড়ল বনভূমি। চারপাশে প্রচণ্ড চিৎকার। ভূতের মতো কালো যে দৈত্যগুলিকে এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল তারা সবাই লাফিয়ে উঠে প্রলয় নৃত্য শুরু করে দিল। গাছের ডালে পাতায় রাতের আশ্রয় নিয়েছিল যে সব পাখপাখালি তারা ভূমিকম্প ভেবে সবাই যেন প্রাণভয়ে লাফিয়ে উঠেছে শূন্যে। আকাশের কোটি কোটি তারা হঠাৎ যেন ঝাঁকুনি খেয়ে ঝুরঝুর করে বৃষ্টির মতো চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। দুটি-একটি তারার আঘাতও যে ওদের গায়ে-পিঠে এসে আছড়ে পড়ল না এমন নয়। কে বলবে জঙ্গলের কোনো প্রাণ নেই, না থাকলে সামান্য একটা গুলির আঘাতে অমনভাবে লাফিয়ে উঠবে কেন?

জঙ্গলের এই ছটফটানির রেশটা কাটাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল ওদের। নিচের ঐ ডোরাকাটা জন্তুটা কিন্তু নির্বিকার। একচুলও নড়েনি। গুলিটা তো ওকেই তাক করা হয়েছিল, তবে?

জগন্নাথও একটু একটু করে ধাতস্থ হল।

—কি ব্যাপার রে শুকদেব? বাঘ যদি হবে তবে গুলি খেয়েও নড়ে না কেন? শুকদেবের ঘোরটা যেন পুরোপুরি কেটে গেছে, ধুশ শালা! বাঘ নয়।

—তবে কি?

—স্রেফ আলো আর ছায়া, ছায়া আর আলো।

—কিন্তু অবিকল বাঘের মতো।

শুকদেব বলল, বনের মধ্যে বনবিবির কত রে ভাই খেল'—

জগন্নাথ তাকিয়ে থাকল, রাত্রি এখন কত কে জানে!

আটাশ

দয়াল ঘোষ গেরুয়া পরেন না। গায়ে ছাইভস্মও মাখেন না। জটাজুটধারী কমণ্ডলু হাতে পুরোপুরি সন্ন্যাসী বলতে যা বোঝায় দয়াল ঘোষ সেই জাতের সন্ন্যাসীও নন। আবার উনি যে ষোল আনাই গৃহী এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। জীবনের রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে যেটুকু ওঁকে সন্ন্যাসী হতে হয়েছে, সেটুকুই উনি সন্ন্যাসী।

বিবাহ ইত্যাদি করে সংসারধর্ম পালনের কোনো সুযোগই ওঁর জীবনে আসেনি। এজন্য ঈশ্বরের ওপর ওঁর কোনো আক্ষেপ আছে বলেও কেউ জানে না। চৌধুরী-বাড়ির ভাল-মন্দের সঙ্গে ভাগ্যটাকে প্রথম থেকেই জড়িয়ে নিয়েছিলেন। জন্মেই চিনেছিলেন চৌধুরীবাড়ির রাজাদের। রাজবাড়ির পেছন দিকে নায়েব-গোমস্তাদের বসতবাড়ি। সেখানেই থাকতেন উনি। এখনো এ বাড়ির মায়া বোধহয় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কখনো-সখনো প্রয়োজন পড়লে উনি আসেন, এখানে থাকেন! কিন্তু বেশির ভাগই থাকেন বাড়ির বাইরে বাইরে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আশে-পাশে খোঁজাখুঁজি করলে নির্ঘাত ওঁকে পাওয়া যাবে।

নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগটা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেননি দয়াল ঘোষ। নরেন্দ্রনারায়ণও অকৃতজ্ঞ নন। দয়াল ঘোষের জন্য মাসোহারা বেঁধে দিয়েছেন। ফলে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে দয়াল ঘোষ রাজবাড়িতে এসে হাত পেতে দাঁড়ালে কখনো বিমুখ হন না।

দয়াল ঘোষের চোখের দৃষ্টিরও অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। নিশিকান্ত আর চৈতন্য প্রথমদিকে কিছুটা গোলমালেই পড়ে গিয়েছিল। মাস দেড়েক আগে যে দয়াল ঘোষকে ওরা চিনত সেই দয়াল ঘোষই কি ইনি। নাহ্, অসম্ভব। চোখের

দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে, মানুষটা আর আগের সেই দয়াল ঘোষ নেই। চোখদুটি এখন শান্ত, নিস্তরঙ্গ। অতৃপ্তি নেই, জ্বালা নেই। ভেতরটা যেন জুড়িয়ে স্থির হয়ে বসেছে। পরনে আগের মতই মালকোচা মারা ধুতি, কিন্তু গায়ে ঢিলেঢালা বৈরাগীদের মতো আলখাল্লা। আগে ওরকম কোনো জামা পরতেন না। এই দেড় মাসে কখনো ক্ষৌরকারের কাছে যাননি। একমাথা চুল, ঘাড়ের দিকে কিছুটা ঝুলে পড়েছে। মুখে ঘন দাড়ি-গোঁফ। ঢিলেঢালা পোশাকের সঙ্গে দাড়ি-গোঁফ স্বাভাবিকভাবেই দয়াল ঘোষকে যেন পুরোপুরি পালটে দিয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রথমদিকে বেশ একটু ঝামেলাতেই পড়ে গিয়েছিল নিশি আর চৈতন্য। নির্জন, গাছগাছালির ছায়ায় ঢাকা শান্ত একটা পরিবেশ। গঙ্গার ভাঙা পাড়ে দাঁড় করানো কিছু নৌকো। কিছু মাঝিমাল্লার মুখ ছাড়া আর বিশেষ কারো দেখা পাওয়া ভার। মন্দিরে আশেপাশে ঘুরঘুর করে ওরা একজন সন্ন্যাসীকে একা বসে থাকতে দেখে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল, আচ্ছা, দয়ালবাবু এখানে থাকেন?

—কে?

—আজ্ঞে আমাদের দয়ালবাবু। দয়াল ঘোষ। ওরা দয়াল ঘোষের চেহারার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করল।

সন্ন্যাসী বলল, বুঝেছি। হ্যাঁ, এখানেই তো ছিলেন। হয়তো ঘাটে গেছেন।

ঘাটে এবং আশেপাশে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর নিরিবিলিতে একটা গাছতলায় আবিষ্কার করল দয়ালবাবুকে। দয়ালবাবুর দিকে তাকিয়েই ওরা চমকে উঠল। মাস দেড়েক আগে যে দয়াল ঘোষকে ওরা চিনত এই কি সেই দয়াল ঘোষ! কী আশ্চর্য!

আড়ষ্টভাবে এগিয়ে এল ওরা। চৈতন্য ফিসফিস করে বলল, এ যে হাফ গেরস্ত হাফ সাধু রে!

—সে আবার কি?

—পুরোপুরি সাধু হলে গায়ে ছাই মাখা থাকত। কপালে থাকত চন্দন তিলক। তাছাড়া আর একটা জিনিস দেখেছিস?

—কি?

—পায়ে জুতো। পুরোপুরি সাধু হলে পায়ে জুতো থাকত না, থাকত কাঠের খুঁটি পোঁতা খড়ম। ফলে না সংসার ছেড়েছেন, না সন্ন্যাসী হয়েছেন।

নিশির বিস্ময় কাটছিল না। মাস দেড়েক আগের একটা লোক যে এতখানি পালটে যেতে পারে এটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। নিশিকান্ত চৈতন্যকে থামিয়ে দিল, আহ্, আস্তে কথা বল, শুনতে পাবে।

এরপর ওরা আরো এগিয়ে হঠাৎ দয়াল ঘোষের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

দয়াল ঘোষও ওদের দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছিলেন, কি খবর ? তোমরা ?

—আজ্ঞে। ছোটকর্তা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

—কেন ? কি ব্যাপার ?

—উনি একটা চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটা দয়াল ঘোষের হাতে তুলে দিল নিশি।

সামনেই গঙ্গা। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গা। ঘাটের দিকে বাঁধানো সিঁড়িতে গা হাত পা এলিয়ে বসে আছে জনা কয়েক লোক। গঙ্গার জলে দুটো-চারটে বয়া ভাসছে। দুটো-চারটে ব্যাপারী-নৌকো যাতায়াত করছে। ওদিকে খেয়াঘাটের দিকে খেয়া পারের নৌকো দেখা যাচ্ছে। এখন ভাঁটা কি জোয়ার ঠিক ধরা যাচ্ছে না। জল কানায় কানায় ছেয়ে আছে।

চিঠিটা আগ্রহ নিয়ে পড়ে ফেললেন দয়াল ঘোষ। তারপর প্রসন্ন চোখে ওদের দিকে তাকালেন। তোমরা বাদা থেকে আসছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। উত্তর করল নিশি।

—সবাই ভালো আছে তো ?

—আজ্ঞে বাঘের উৎপাত বড় বেড়েছে। ভাসানকে বাঘে মেরেছে খবর পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

দয়াল ঘোষ একটু আনমনা হয়ে গেলেন, শুনেছিলাম।

—তখন ছোটকর্তা ওখানেই ছিলেন।

—হ্যাঁ, ওঁর মুখেই শুনেছি। লোকটার কোনো হদিস হল না ? তারপর একটুক্ষণ থেমে থাকলেন দয়াল ঘোষ। যেন উত্তর ওঁর জানাই ছিল। বললেন, হয়তো ঈশ্বরের ওরকমই ইচ্ছা ছিল। কে বাঁচাবে বল।

চৈতন্য বলল, একে বাঘের উৎপাত তারপর আবার বাঁধ ভেঙেছিল। দুর্গতির আর শেষ নেই আমাদের।

—বাঁধ ভেঙেছিল, কেন ? কবে ?

—আজ্ঞে এই যে দুদিন বাদলা হল, তাইতেই নরম বাঁধ ভেঙে হু-হু করে জল ঢুকতে শুরু করেছিল। কি কষ্ট করে যে আমরা রক্ষা পেয়েছি, আমরাই জানি।

দয়াল ঘোষ আগ্রহ নিয়ে শুনলেন।

নিশি বলল, রাতে মাঝে মাঝেই বাঘ এসে ঘোরাঘুরি করে যাচ্ছে, ভয়ে বাঁচি

না। আবার কবে কাকে তুলে নিয়ে যাবে। আবার অন্যদিকে এটা-সেটা তো লেগেই আছে।

—কি রকম?

—মকবুল মিঞাকে আপনার মনে আছে হুজুর?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন থাকবে না।

—মকবুল এর মধ্যে একদিন গাছ চাপা পড়েছিল। কোমরে চোট পেয়ে বিছানা নিয়েছে।

—তাই নাকি। লোকটা বড় কাজের হে।

চৈতন্য বলল, এখন ভাল হয়ে এসেছে। আমরা ওকে ভালই দেখে এসেছি। অল্প অল্প হাঁটতেও পারছে।

নিশি বলল, আসলে বনদেবীর পুজো করা হয়নি বলেই এসব হচ্ছে হুজুর।

দয়াল ঘোষ শান্ত চোখে একটু হাসলেন, বনদেবীর পুজো হলেই সব বিপদ কেটে যাবে কে বললে শুনি?

কে আবার বলবে। এসব কি বলার অপেক্ষায় থাকে। প্রশ্নটা কেমন দুর্বোধ্য ঠেকল নিশির। বনদেবীর পুজো হলেই বনমাতা তুষ্ট হবেন, এতে সন্দেহ রাখার কারণ ঘটেনি কখনো। তবু উত্তর দিতে গিয়ে বলল, আজ্ঞে রজনীভাই তো সে রকমই বলল।

—রজনী তো বলবেই। ও যে অন্ধ।

—আজ্ঞে। শুনতে কি ভুল করল ওরা।

—অন্ধ বুঝিস? রজনী চোখে দেখতে পায় না। দেখতে পেলে ও ভিন্ন মানুষ হত।

ওরা কেমন বোকাভাবে তাকিয়ে আরো কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

দয়াল ঘোষ হাসলেন, তোরা বুঝবি না। আসলে ওর চোখের সামনে বিষয় ছাড়া কিছুই নেই। বিষয়ের পর্দা পড়েছে চোখে। বিষয়ের পর্দা বুঝিস?

নিশি চোখ তুলে তাকাল, আজ্ঞে না হুজুর।

—বুঝবি না। বুঝবার এখনো সময় হয়নি তোদের। আমিও প্রথমদিকে বুঝতে পারিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন দয়াল ঘোষ। কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পেলেন, হ্যাঁ, আমিও প্রথম দিকে বুঝতে পারিনি। কিন্তু সামান্য একটা ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি আমার খুলে গেল।

চৈতন্য নিশির দিকে তাকাল।

—তোদের মনে আছে, সেই যে নদীর ঘাটে একদিন একটা মেয়ে ভাসতে ভাসতে এসে হাজির হয়েছিল ?

নিশি বলল, মনে থাকবে না কেন ! আবার ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

—সেই মেয়েটাই আমার দিব্যচক্ষু খুলে দিয়েছে। মেয়েটা যদি কোনোদিন ঘাটে ঐভাবে এসে না পড়ত, তা হলে কি ছাই আমার চোখ খুলত। মেয়েটাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল বিশ্বসংসারের আলাদা চেহারা।

চোখ খুললেন দয়াল ঘোষ। এখনো আমি চোখ বুজলে হুবহু ওকে দেখতে পাই।

নিশি বলল, আজ্ঞে মেয়েটার নাম ছিল গৌরী।

—হ্যাঁ, গৌরী। সার্থক নাম রেখেছিল ওর বাপ মা।

নিশি বলল, সেই গৌরী আবার আবাদে ফিরে এসেছে হুজুর।

—কি, কি বললি ? দয়াল ঘোষ কেমন চমকে উঠলেন।

—আবার ফিরে এসেছে গৌরী। আর সেই জন্যই তো যত বিপদ বেড়েছে আমাদের।

—গৌরী ফিরে এসেছে ? ঠিক দেখেছিস তোরা ?

—বা রে, না দেখলে কি মিথ্যে বলি ! এসেই তো ঈশানের খোঁজ শুরু করে দিয়েছিল।

—বটে, বটে, তারপর ?

—তুই বল না চৈতন্য। নিশির গলা শুকিয়ে আসছিল। তুই বল।

চৈতন্য বলল, মেয়েটাকে আমরা জলজ্যান্ত দেখে এসেছি হুজুর। ফুটফুটে দেখতে। খুব যে খারাপ অসুখ হয়েছিল, মুখের দাগগুলো দেখলেই তা বোঝা যায়।

—তা ঈশান কি করল ?

—ঈশান আর কি করবে। অঘটন ঘটিয়ে বসেছে।

—অঘটন, কি অঘটন ?

—মেয়েটাকে নৌকো থেকে এবার ডাঙায় তুলে নিয়েছে। আর তুলবি তো তোল, সটান রজনীর কাছারিঘরে। রজনীভাই রেগে আগুন।

নিশি বলল, আর সেই জন্যই তো আমাদের হুড়োহুড়ি করে আসতে হল।

—রজনী কি বলছে ?

—রজনীভাই বলছে, যাও বা আবাদ করার আশা ছিল, সব গেল। ওখানে

একটা খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে হুজুর। আমরা দশজনে ওকে শান্ত করে রেখেছি। বনদেবীর পুজোটা হলে সব ঝামেলা কেটে যেতে পারে হুজুর।

—ভুল। রজনী ভুল করছে। রজনী ওকে চিনল না। চেনা সম্ভবও নয় রজনীর।

নিশি আর চৈতন্য তাকিয়ে থাকে।

দয়াল ঘোষ শুধোলেন, রজনী মেয়েটার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি তো?

চৈতন্য বলল, না হুজুর। ওর যত চোটপাট সব ঈশানের ওপর। আর পাগলা ঈশানটাকে তো আপনি চেনেন।

দয়াল ঘোষ একটুক্ষণ যেন ধ্যানমগ্ন রইলেন। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বললেন, আসলে কি জানিস, গৌরীর মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ আমার চোখে পড়েছিল যা জন্ম জন্ম তপস্যায় একটা লোক দেখতে পায়। সেকথা যদি বলিস, আমি তবে ভাগ্যবান।

নিশি আর চৈতন্য আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, মেয়েটাকে ওরা দু চোখ ভরে দেখে এসেছে, কিন্তু কৈ এমন কিছু তো ওদের চোখে পড়েনি। সত্যি সত্যি কি এমন পরম বস্তু উনি খুঁজে পেলেন মেয়েটার মধ্যে।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন দয়াল ঘোষ, তোরা মেয়েটার দিকে তেমন করে তাকিয়ে দেখিসনি। দেখলে তোরাও সেই জ্যোতি দেখতে পেতিস। চোখ ঝলসে যেত তোদের। মনের যত কালিমা সব তোদের মুছে যেত:

নিশি বলল, আজ্ঞে, আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তোরাও অন্ধ যে। বুঝবি কি করে। অন্ধের চোখের সামনেই সূর্য কিরণ ছড়ায়, চাঁদ সুধা ঝরায়, অন্ধ কি তা দেখতে পারে।

—আজ্ঞে!

—ঠিক আছে, তোরা দেখতে চাস?

জাদুকর যেন তার জাদুবিদ্যা দেখাবে এমনি ভঙ্গি এখন দয়াল ঘোষের। একটু উৎসাহেই ওরা তাকাল, কি দয়ালবাবু?

—আমি ওর মধ্যে যা দেখেছি, তা যদি তোরা দেখতে চাস, এখনি আমি তোদের দেখাতে পারি। দেখবি?

দয়াল ঘোষের দু চোখ ঠিকরে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। কেবল মুখের কথাই নয়, দয়াল ঘোষ যেন এই মুহূর্তে কোনো অসম্ভবকেও সম্ভব করে দেখাতে পারেন।

নিশির বুকের ভিতর কেমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

—ঠিক আছে, ঐ মন্দিরের দরজা খুলুক। আমি তোদের দেখাব।

চৈতন্য কেমন স্তব্ধ। তবে কি ঐ মন্দিরের দেবীমূর্তির কথা বলতে চাইছেন দয়াল ঘোষ! কিন্তু গৌরীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের এই কালীমূর্তির কি সম্পর্ক। সব কিছু কেমন দুর্বোধ্য হয়ে যেতে থাকে ওর।

—আজ্ঞে ঐ মন্দিরে তো দেবীমূর্তি।

—হ্যাঁ, ঐ মূর্তিকে খালি চোখে যদি দেখিস দেখবি পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ভক্তি দিয়ে যদি দেখিস, তাহলে খুঁজে পাবি ওর মধ্যে মহাশক্তিকে। ভক্তিভরে একবার শুধু তাকাস। দরজা খুলুক, দেখে যা।

—ভক্তিটাক্ত তো আমরা শিখিনি দয়ালবাবু!

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস, ভক্তিও শিখতে হয়। ঠিক আছে, মায়ের দিকে যখন তাকাবি চোখ বুজে তাকাস।

চোখ বুজে আবার তাকান যায় নাকি? কিসব পাগলের মতো কথা বলছেন দয়াল ঘোষ। কিন্তু এ নিয়ে কোনোরকম তর্ক করতেও সাহস পেল না ওরা। দয়াল ঘোষ যে সত্যি সত্যি পাল্টে গেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

—চোখ বুজে তাকালে, মহাকালের পায়ের ঘুঙুর শুনতে পাবি। চোখ সার্থক হবে তোদের। বুকের যত জ্বালা যন্ত্রণা সব মুছে যাবে।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে নিশি দুহাত তুলে দেবীমূর্তির উদ্দেশে প্রণাম জানাল। কি জানি বাবা, এসব দেবীমূর্তি সম্পর্কে ও কিছু জানুক আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, মাথা নিচু করে প্রণাম জানালে ওর মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না।

চৈতন্যও নিশির দেখাদেখি প্রণাম করল।

দয়াল ঘোষ বললেন, তোরা অস্থির হয়েছিস। ঠিক আছে, যেতে চাইছিস, যা।

চৈতন্য বলল, না হুজুর। আপনার উত্তর নিয়ে আবার এখনি গিয়ে ছোট-কর্তাকে খবর দিতে হবে। বেলা হয়ে যাবে, তাই।

দয়াল ঘোষ একটুক্ষণ নীরব থাকলেন, চিঠিটা আবার বার করে পড়লেন, আমার ওপর তো দেখছি একগাদা কাজের ভার চাপাতে চাইছেন। ঠিক আছে, আমি তোদের সঙ্গেই যাব।

নিশি আর চৈতন্য উৎফুল্ল হয়ে উঠল, আমরা আপনাকে নিয়ে যেতেই এসেছি হুজুর। ওখানকার সবাই চায় আপনি আবার ফিরে আসুন। আপনি মাথার ওপর থাকলে আমরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারি হুজুর।

দয়াল ঘোষ হাসলেন। অর্থবহ হাসি। বললেন, মাথার ওপর ঈশ্বর আছেন, তিনিই সবাইকে দেখবেন। আমি তো নগণ্য জীব।

নিশি বলল, আপনি মহাপুরুষ।

সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠলেন দয়াল ঘোষ। জিভ কেটে ঈশ্বরের উদ্দেশে মাথা নোয়ালেন, ছি ছি, এমন কথা মুখে আনিস না। আকণ্ঠ ডুবে আছি পাপে। এমন কথা কানে এলে পাপের বোঝা আরো বেড়ে যাবে।

চৈতন্য আর নিশি থমকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিল।

—তোরা কবে রওনা দিবি ?

নিশি বলল, কাল বাদে পরশুই।

—পরশু, কখন ?

নিশি বলল, খুব ভোরে। নদীর অবস্থা বুঝে।

আবার একটুক্ষণ নীরব থাকলেন দয়াল ঘোষ। ঠিক আছে, ডাক যখন পড়েছে আমিও তৈরি থাকব। ছোটকর্তা পুজোর সরঞ্জামের কথা লিখেছেন, দেখি কতদূর কি করতে পারি।

—একজন পুরুত ঠাকুর সঙ্গে করে নিতে হবে হুজুর।

চৈতন্য বলল, দেবীমূর্তিও দরকার।

দয়াল ঘোষ বললেন, জীবন্ত মূর্তি যেখানে বিরাজ করছেন, সেখানে তোরা পুতুল নিয়ে যেতে চাস ?

—আজ্ঞে।

—ঠিক আছে, তোরা যা নিতে চাস, নে। আমি আমার মতো করে গুছিয়ে নেব।

চৈতন্য বলল, প্রতিমা পুরুত এগুলো কিছুই লাগবে না বলছেন ?

—তা বলি কি করে। সে সাহস আমার কোথায়। ঠিক আছে, কপিল ওঝাকে বলে দেখি যদি রাজি হয়। আর একান্ত যদি রাজি না হয়, অন্য কাউকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে।

নিশি বলল, আমরা তাহলে খুব ভোরে এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। রাজবাড়ি থেকে ঘাট খুব একটা দূরে নয় হুজুর।

—সেই ভাল, আমিও রাজবাড়িতেই থাকব। করুণাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

ওরা আবার গড় হয়ে দয়াল ঘোষের পায়ের ধুলো নিল।

—আমরা তাহলে যাই হুজুর ?

দয়াল ঘোষ আশীর্বাদ করলেন, যাব বলতে নেই। বল, আসি।

নিশি ফিসফিস করে বলল, আসি।

তারপর দক্ষিণেশ্বরের শান্ত নির্জন পরিবেশ ছেড়ে ওরা সদর রাস্তার দিকে এগিয়ে এল।

দয়াল ঘোষ যে এত সকালেই ওদের আপন করে কাছে টেনে নেবেন তা ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি। ওদের মনে পড়ল, হাজার চেষ্টা করেও সেবার ছোটকর্তা দয়াল ঘোষকে বাসায় পাঠাতে পারেননি। ওরা এত সহজেই দয়াল ঘোষকে রাজি করাতে পেরে যেন রাজ্য জয় করল। বাসায় গিয়ে একবার পৌঁছতে পারলে হৈচৈ পড়ে যাবে। ওরা বুক টান করে তখন হাঁটবে।

অবশ্য রজনী ভাই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। একে ওই মেয়েটা আসতেই ওর মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে। তারপর যদি দয়াল ঘোষকে নৌকো থেকে নামতে দেখে, তাহলে আর রক্ষা রাখবে না।

রজনীর ভয় ওর খবরদারি যাবে। কিন্তু দয়াল ঘোষকে দেখে সত্যি সত্যি কি এমন কিছু মনে হয়!

—কি রে চৈতন্য, কি বুঝলি? প্রশ্ন করে নিশি।

চৈতন্য বলল, কি ব্যাপারে?

—না মানে, দয়াল ঘোষকে বাসায় নিয়ে গিয়ে হাজির করলে রজনী কি খুশি হবে?

—হলে হবে। না হলে কি আর করা যাবে।

—আমার ধারণা, রজনী দা-কাটারি নিয়ে মারতে আসবে। দয়াল ঘোষকে সেবার ও ল্যাং মেরেছিল মনে আছে?

চৈতন্য হাসল, দাঁড়া, এতক্ষণ দয়াল ঘোষের হাবভাব দেখে পেট ফেঁপে উঠেছে, একটা বিড়ি ধরিয়ে নিই। একটাই বিড়ি কোঁচড় ঘেঁটে বেরুল ওর। বলল, তুই ধরাবি না আমি?

—তুই ধরা। তুই খা। আমার না হলেও চলবে।

চৈতন্য একবার নিশির মুখের দিকে তাকাল, তারপর বিড়িটা ধরিয়ে নিল। হাসল।

—হাসছিস?

বড় করে একবার ধোঁয়া ছাড়ল চৈতন্য তারপর বিড়িটা নিশির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, মৌমাছি বনে বনে কেন ঘুরে বেড়ায় জানিস তো? আসলে যেখানে মধু সেখানেই মৌমাছি। মধুর জন্য ঘুরঘুর, ঘুরঘুর—

নিশি বিড়িতে টান দিল। কি বলতে চাইছিস খুলে বল্‌?

—বললে তো আমায় মারতে আসবি, কিন্তু মানুষ চিনতে আমার সময় লাগে না।

—কি বলতে চাস খুলে বল্‌ না? নে, বিড়ি নে।

—চৈতন্য আবার বিড়ির ধোঁয়ায় মুখটা ছেয়ে ফেলল, তুই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস, যেই আমরা গৌরীর নাম করলাম, আর অমনি লোকটা কেমন পাল্টে গেল। মেয়েছেলের গন্ধ বাবা, যাবে কোথায়?

—ধুত্‌, কি বলছিস! দয়াল ঘোষের মতো একটা মানুষকে জড়িয়ে নোংরামি করতে এতটুকু ভাল লাগে না ওর। কতটুকুই বা লোকটাকে চেনে ওরা। তাছাড়া একথা তো ঠিক, দয়াল ঘোষকে স্বয়ং ছোটকর্তা অবধি সমীহ করে চলেন, ওরা তো কোন ছার।

—ঠিকই বলছি। একটু লক্ষ্য করলেই আমার কথা বুঝতে পারবি।

নিশি প্রতিবাদ করল, দয়াল ঘোষ আলাদা মানুষ। ওর সম্পর্কে ওসব খাটে না। এটা যদি রজনী ভাইয়ের কথা হত, আমি বিশ্বাস করতাম।

—সব ভাই-ই একরকম রে গাধা। যার যার চালাকি তার তার মতো। দে, শেষ টানটা দিই দে।

নিশি বলল, গৌরী সম্পর্কে দয়ালবাবুর মাথায় যদি খারাপ কিছু থাকবে তাহলে আর মা কালীর দিকে আমাদের দেখিয়ে দিত না।

—ওটাই তো চালাকি। ধর্‌ না, কাল যে তোকে লুৎফাবিবি দেখালাম, আমি যদি বলি ওর মধ্যেও আমি কালী দেখেছি!

—তা তো দেখতেই পারিস। যা ভুযো কালীর মতো চেহারা!

—চেহারা কালো হতে পারে। কিন্তু কিরকম রঙ্গরস করছিল বল্‌। আমি তো অনেককাল পর এলাম, অথচ লক্ষ্য করেছিস, আমাকে একদম ভোলেনি।

—ওরা কাউকে ভোলে না। ভুললে ওদের রোজগার থাকে না।

চৈতন্য বলল, আমাকে না ভোলার কারণ আছে, আমি ওকে একবার একটা চকচকে লাল রঙের জামা কিনে দিয়েছিলাম। চল্‌ না ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি?

নিশি গম্ভীর হয়ে গেল, না, তুই যা।

—কেন? তুই যাবি না? ভাল লাগেনি তোর? ভাল না লাগলে চল্‌ অন্য জায়গায় যাই।

—বলেছি তো তুই যা। তোর শখ, তুই মিটিয়ে আয়।

—বাহ্ বাবা, তুইও দেখছি হাফ সন্ন্যাসী হয়ে উঠলি রে।

নিশি বলল, বাজে কথা ছাড়্। ছোটকর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে মনে আছে? আগে রাজবাড়ি চল্। তারপর তোর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যা।

চৈতন্য বোঝাল, রাগ করিস না নিশি, কলকাতায় আবার কবে আসব তার কি ঠিক আছে! এর মধ্যে বাঘে কুমিরেও আমাদের খেয়ে ফেলতে পারে।

নিশি চুপ করে থাকে।

চৈতন্য বলল, আজ বরং দুজনে দুটো বেলফুলের মালা নিয়ে যাব। কালই আমাদের নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

নিশি তবু নীরব আছে দেখে চৈতন্য বলল, ঠিক আছে, তুই যাস আর না যাস, আমি সন্ধ্যে পর্যন্ত হাফ-সন্ন্যাসী হয়ে কাটাব, তারপর সন্ধ্যে হলে একা একাই হাফ-গেরস্ত লুৎফাবিবির কাছে চলে যাব। ভাই, আমার কালী দক্ষিণেশ্বরে নেই, ওই লুৎফার কাছেই পড়ে আছে।

দুজনে মুখ গোঁজ করে হাঁটতে থাকে।

উনত্রিশ

শীতের প্রকোপ প্রচণ্ড বাড়ল। রোদে দাঁড়িয়েও হিহি কাঁপতে হয়। গাছের গায়ে কুড়ুল মারতে গেলে এখন ঝনঝন করে ওঠে সারা শরীর। গত কয়েক বছরের মধ্যেও এমন ধারাল শীত আর পড়েছে কিনা সন্দেহ।

শুকদেব আর জগন্নাথ সারা রাত মাচায় কাটিয়ে ভোর ভোর ফিরে এসেছে। এসেই জগন্নাথ বিছানা নিয়েছে, শুকদেব মৌজ করে গাঁজার ছিলিম সাজিয়েছে। গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে খালি-গা হল, তারপর উঠোনে নেমে এসে ধিঙ্গি নাচ নাচতে শুরু করল। ব্যোম ব্যোম মহাদেব!

গাঁজায় সব শরীর এখন চাঙ্গা, চোখদুটো লাল করমচার মতো টকটকে। সারা রাত মাচায় বসে রাত জেগে কোমর ধরে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সব ক্লান্তি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

ওদিকে মকবুলকে দেখা গেল। মকবুল এখন অল্প অল্প হেঁটে চলে বেড়াতে পারে। হাতে একটা লাঠি নিয়ে মকবুল ঠুকঠুক করে উঠোনে নেমে এল। দেখল, নাটুয়া দলের অধিকারীর মতো ভঙ্গি করে গান জুড়েছে শুকদেব,

গাঁজা খেলে পাঞ্জা বাড়ে
গর্দানে বাড়ে জোর

মকবুল থমকে দাঁড়ায়, বটে বটে, আর কি হয় ?

শুকদেব উৎসাহ পেয়ে নেচে ওঠে,

(দাদা) গর্দানে বাড়ে জোওর

(আর) বাবা-দাদার নাম ডুবিয়ে

হলাম গাঁজাখোর।

—বটে রে, গাঁজাখোর ? আজ যে বড় ফুর্তি ? কি হয়েছে ?

শুকদেব হিহি করে হাসে, কেমন গাইলাম বলো ?

মকবুল বলল, ঠিক কলের গানের মতো। কিন্তু সারা রাত জাগার পর সকালে এমন কি ঘটল যে এত ফুর্তি ?

শুকদেব হাসল, গাঁজা একবার টেনে দেখ না, তাহলেই বুঝতে পারবে কেন ফুর্তি। খাবে ?

এমন সময় দুজনেই কিছুটা থমকে দাঁড়াল, আরে, সেই নতুন লোকটা না। হ্যাঁ, সেই লক্ষ্মণই। মুখটা কেমন চামসে মেরে গেছে। দু' দিনেই লোকটার চেহারা কেমন পালটে গেছে।

শুকদেব ডাকে, এই যে খেস্টান সাহেব। ভালো আছো ? চলবে নাকি এক হাত ?

লক্ষ্মণ এগিয়ে এল, কি ?

—মহাদেবের পেসাদ গো। খেয়ে গায়ে-গর্দানে জোর বাড়িয়ে নাও। বাদাবনে এসেছ, কবে বড়মিঞার সঙ্গে লড়তে হবে বলা তো যায় না। এসো।

লক্ষ্মণ বলল, তোমরা খাচ্ছ, খাও। আমার ওসব চলে না। তাছাড়া আমার কাজ আছে।

—বাহ্‌ বাবা, তোমার আবার কাজ কি গো ? শিঙে হারিয়ে এখন কাঁকুড়ে ফুঁ দেবে নাকি ? হেঁ হেঁ—

—মানে। লক্ষ্মণ থমকে দাঁড়ায়, কথাটা ভীষণ অপমানকর। টনটন করে ওঠে ওর বুকের ভেতর।

মকবুল সামাল দেবার চেষ্টা করে। সকালবেলা ঝামেলা না করাই ভালো। শুকদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় তাও শিখলি না ? কাজে যাবি না ?

—সারা রাত তো কাজ করেই এলাম গো মিঞাসাব। সারা দিন আজ আমার ছুটি।

—তালে ঘরে গিয়ে ঘুমুগে যা। দেখ গে জগাটা ঘুমুচ্ছে। লক্ষ্মণের দিকে তাকাল মকবুল, তুমি কিছু মনে করো না গো, পাগলটার মুখ বড় খারাপ।

শুকদেব আবার গান ধরে, আমি হলাম গাঁজা খোওওর—আমি গো খেস্টান সাহেব। আমি, আমি—

লক্ষ্মণ আর ওদের দিকে তাকায় না। এই জংলীগুলোর কাছে মানুষের মান-সম্মানের কোনো দাম নেই। যেন গরুচোরের মতো অবস্থা। কী কুক্ষণেই যে গৌরীকে নিয়ে এখানে এসে হাজির হল ও! এখন ওকে না নিয়ে যাওয়া যাবে পাদরি পাড়ায় না বিদ্যাপুরীতে। রাতে যেভাবে ও কাটারি নিয়ে মারতে এসেছিল, সে দৃশ্য কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। কেন, কেন গৌরী অমন মারমুখী হয়ে উঠল ওর ওপর। কি এমন অন্যায় করেছে ও।

বাকি রাতটা নৌকোতে ছটফট করে কাটিয়েছে লক্ষ্মণ। ঘুমুতে পারেনি। একে শীত, তার ওপর হাজার রকম দুশ্চিন্তা। চিন্তার কোনো শেষ নেই। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয়েছে, মহাশূন্যে ও ভাসছে। কেউ নেই ওকে হাত ধরে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দেয়।

ভোরের দিকে প্রচণ্ড অবসন্নতার মধ্যে ও টের পেল, কারা যেন হৈ-চৈ করতে করতে ভেড়ি অবধি এল। তারপর নৌকো নিয়ে ভেড়ির ধার ঘেঁষে ঘেঁষে এগোতে শুরু করল। লক্ষ্মণ চিনতে পারল ঈশানকে, রজনীকে। চারপাশের ভেড়ির অবস্থা দেখবার জন্য ওরা বেরিয়ে পড়েছে। আর মনে হল এই তো ওর সময়। গৌরীকে একা পেতে হলে এই তো সময়। কাঠুরেরা দড়িদড়া দা-কুড়াল নিয়ে এখনই জঙ্গলে ঢুকবে। এমন স্বর্ণ সুযোগ যেন আর ও হাতে পাবে না কোনো দিন। একটা শেষ বোঝাপড়া ওকে করতেই হবে এবার।

নৌকো থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে পড়েছিল লক্ষ্মণ। বাইরের কনকনে শীত ওর সারা দেহে যেন তীরের ফলার মতো বিঁধে যাচ্ছিল। কিন্তু কাছারিবাড়ির উঠোনে এসেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেল ও। কাঠুরেরা অনেকেই এখনো কাজে বেরোয়নি। গৌরী কোথায়? গৌরী কি এখনো ঘরেই পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে!

লক্ষ্মণ দেখল উঠোনের একপাশে হরিণটা বাঁধা। পা গুটিয়ে অদ্ভুতভাবে বসে আছে। চোখদুটো বড় করুণ।

কিন্তু গৌরী কোথায়। তবে কি গৌরীকেও সঙ্গে নিয়ে বেরুল ওরা। কিন্তু না, তা কি করে সম্ভব। স্পষ্ট ও ঈশান আর রজনীকে নৌকোয় উঠতে দেখেছে। দেখেছে আরো দু-তিনটে লোককে, তার মধ্যে গৌরী ছিল না। তবে কোথায়, কোথায় গৌরী।

শুকদেব ততক্ষণে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়েছে। লক্ষ্মণ ওকে এড়িয়ে যাবার জন্য সরে এল। কাঠুরে ডেরার পেছন দিকে এগিয়ে এসে মিষ্টি জলের পুকুরটার কাছে দাঁড়াল। জলের ওপর এখনো কুয়াশা দুলছে। ঘাট ফাঁকা, কেউ নেই।

সরে এল ভেড়ির দিকে। ভেড়ির ওপর আগুনের কুণ্ডলির পোড়া কাঠ আর ছাই পড়ে আছে। কাছাকাছি এগিয়ে একটু হাত-পা সেঁকে নিল। কানের লতি দুটো বরফের মতো জমে আছে। হাত সেঁকে সেঁকে কান, ঘাড়, গলা গরম করে নিল লক্ষ্মণ। তারপর আবার অলস ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

নদীতে রোদ ঝিকোচ্ছে। নদী থেকে ছড়িয়ে গিয়ে অদ্ভুত এক আলোর আভা চারপাশে। ওদিকে নদীর ওপারে জঙ্গলের মাথায় পাখির ঝাঁক। অথচ কোনো দৃশ্যই ওর ভাল লাগছিল না। রাগে ক্ষোভে সমস্ত কিছুই ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল ওর। ক্ষমতা থাকলে ও কাঠুরে ডেরা আর কাছারিবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিত। লোকগুলির মাথায় কুড়াল চালিয়ে মনের ঝাল মেটাত। কেমন করে যে লোকগুলির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়, কিছুই মাথায় আসছিল না ওর। ক্ষোভে কেবল গুরগুর করে কাঁপতে থাকে লক্ষ্মণ।

ক্ষণিকের জন্য চোখে ঘোলা দেখতে শুরু করে ও। পরমুহূর্তেই আবার চোখের হলুদ ভাবটা কেটে গেল। ঘাটের কাঠ টানার নৌকোটার দিকে চোখ পড়ল। দু'-চারজন দৈত্যের মতো মানুষ সেই নৌকোয় কাঠ সাজাচ্ছে। ওদিকে এগোতে ইচ্ছে হল না। লোকগুলো লক্ষ্মণকে দেখলেই মুখ টিপে টিপে কথা বলবে। হাসবে, অসহ্য।

নৌকোটা ছাড়িয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে ভাঙা ভেড়ির সারাই করা বাঁধটাকে দেখা যেত। ভেড়িটা ওদিকে দু-তিনটে বাঁক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। এই ভেড়ির গা ধরেই নৌকো নিয়ে বেরিয়েছে ঈশানরা।

নদীর ঢালের দিকে তাকাল লক্ষ্মণ। ভাঁটা চলছে বোধ হয়। ঢালে কাদার মধ্যে লাল কাঁকড়ার ঝাঁক। মাটি খুঁড়ছে। কাদায় ডুব দিয়ে দিয়ে গা লুকোচ্ছে। আবার ভেসে উঠে কাদার উপর চিত্র আঁকছে। নোনা মাছ সাপের মতো কাদার ভেতরেও ডুব সাঁতার দিতে পারে। অদ্ভুতভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাদার দিকে তাকিয়ে থাকে লক্ষ্মণ। ভীষণ একা একা লাগছে। ভীষণ অসহায় লাগছে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে।

নাহ্, দাঁড়িয়ে থাকা মানেই মাথাটাকে জবড়জং করে তোলা। লক্ষ্মণ ভেড়ির ওপর দিয়েই উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে। তিন-চারশ' হাত তফাতে ওদিকেও

জঙ্গল। নদী আর জঙ্গলের সীমারেখায় আট-দশ ফুট উঁচু ভেড়িটা কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে। এই ভেড়ি ধরে হাঁটতে হাঁটতেই পুরো দ্বীপটাকে একবার পাক খেয়ে ঘুরে আসা যায়। একটু পা চালিয়ে হাঁটা শুরু করে ও। আচ্ছা, ঈশানটাকে ওই জঙ্গলের ধারে গিয়ে যদি একা পাওয়া যায়! পেছন থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে ওর মাথায় একটা লাঠি বসিয়ে দেবে ও। ঈশান উল্টে পড়ে গেলেই ওকে টেনে হিঁচড়ে ঐ নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। একবার জলে ওকে ভাসিয়ে দিতে পারলে কেল্লাফতে, তখন আবার ভাল মানুষটি হয়ে ফিরে আসা যাবে কাঠুরে ডেরায়।

যদি টের পেয়ে যায় কাঠুরেরা! যদি সন্দেহ করে লক্ষ্মণই এমন কাজ করেছে, লক্ষ্মণ পালাবে। কে থাকতে চেয়েছে এই জঙ্গলে। লক্ষ্মণ একা হোক, গৌরীকে নিয়ে হোক, পালাবেই।

কোথায় পালাবে! ও কি আবার পাদরিপাড়ায় গিয়ে হাজির হবে! আর তখন ফাদার ওকে বিশ্বাস করলেও দুর্লভদা করবে না। হাজারটা প্রশ্নের মধ্যে পড়তে হবে ওকে। গৌরীকে নিয়ে যে লক্ষ্মণই পাদরিপাড়া থেকে গোপনে সরে পড়েছে, একথা এখন আর কারো অজানা থাকার কথা নয়। ও বোঝাতে পারবে না, গৌরী কি সাংঘাতিক। এখানে ও যে কটা দিন কাটিয়ে গেছে, সবার চোখে কী ভীষণ ফাঁকি দিয়ে সবাইকে ভুলিয়ে গেছে। এই পাদরিপাড়ায় ওরকম জঘন্য মেয়ে থাকলে পাদরিপাড়ারই সর্বনাশ।

কিন্তু কেউ বুঝবে না লক্ষ্মণের কথা। বরং লক্ষ্মণকেই অবিশ্বাস করে পাদরিপাড়া থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে, কোথায় যাবে ও!

আবার ঝিমুনি শুরু হয়ে যায় মাথার মধ্যে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ও লক্ষ্য করে জঙ্গলের গা ঘেঁষেই চলেছে ও। নদীর এদিকটা যেন আরো বেশি নিবিড়, থমথমে। জঙ্গলের ভিতর ঢুকলে গা ছড়ে যেতে পারে!

নদীর দিকে তাকাল। ঘোলা জলের স্রোতে কয়েক খণ্ড বড় বড় কাঠের টুকরো ভেসে যাচ্ছে। এদিককার কাঁকড়াগুলো আকারে বেশ বড় বড় মনে হল ওর। বড় বড় গর্ত খুঁড়ে রেখেছে ওরা। এই সব গর্ত থেকেই ফাটল হয় ভেড়িতে। গর্তের ভিতরে লাঠি ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে মাটির ঢেলা অনেকখানি সরিয়ে দেওয়া যায়।

হাত নিশপিশ করে ওঠে ওর। ভেড়িটাকে এখানে নরম করে রাখলে কেমন হয়। জোয়ারে জলের দাপট একটু বাড়লে গবগব করে জল ঢুকে পড়তে পারে। তার থেকে বাঁধে ভাঙন ধরতে পারে। ভাঙন প্রথমে ছোট, তাই থেকে বড়,

তারপর আরো বড় হয়ে উঠতে পারে। বাঁধ ভাঙার কথা প্রথমে যদি কেউ টের না পায়, বান ডাকতে পারে এই দ্বীপে। সব কিছু তখন তছনছ হয়ে যেতে পারে।

মাথায় শয়তানের চাকা ঘুরতে শুরু করে লক্ষ্মণের। অনেকক্ষণ ধরে গর্তগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ও। তারপর আবার ও হাঁটতে থাকে। জঙ্গলের আড়ালে কাছারিবাড়িটাকে আর দেখা যায় না। আরো বেশ খানিকটা এগোলে কাঠুরেদের কাঠ কাটা হৈ-চৈয়ের শব্দও আর শোনা যায় না। একটুক্ষণ কান পেতে অপেক্ষা করে ও না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন ও, ছাড়া আর কেউ নেই। এই পৃথিবীতে লক্ষ্মণই যেন একা এখন জীবিত মানুষ।

আরো খানিকটা ও থমকে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ ধরেই গাছটা ওর নজরে পড়েছিল। গাছের পাতা কি করে অমন কালো রঙের হতে পারে। মিশমিশে কালো পাতার ঝাপড়ান একটা গাছ। ও কি ভুল দেখছে! জগৎ-সংসারে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটতে পারে কে অত জানবে তার। গাছটার দিক থেকে ও নজর ফেরাতে পারল না, আর একটু এগিয়ে গেল। আর এমন সময় ওর ভ্রম কাটল। কালো কালো ওগুলো যে পাতা নয় ও চিনতে পারল। হাজার হাজার জল-কাক বসেছিল গাছটায়। কাকের রঙেই গাছটা অমন কালো দেখাচ্ছিল।

একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে গাছটার দিকে ছুঁড়ে মারল লক্ষ্মণ। আর কাকগুলি হঠাই একসঙ্গে গাছ থেকে লাফিয়ে উঠে গাছের সবুজ চেহারা ফিরিয়ে দিল।

কাকগুলি অমন করে লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণও ভয়ে গুটিয়ে এসেছিল। হৃৎপিণ্ডটা যেন ধড়াস করে লাফিয়ে উঠেছিল। থমকে দাঁড়াল লক্ষ্মণ। কাকগুলি উড়তে শুরু করেছে। উড়তে উড়তে নদীর জলে ছায়া ফেলে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে কাকগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে লক্ষ্মণ। পরে চোখ ফিরিয়ে এনে আবার গাছটার দিকে তাকায়। কী উজ্জ্বল সবুজ আভা বেরুচ্ছে গাছ থেকে! যেন নতুন করে আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে গাছটা।

লক্ষ্মণ দ্রুত পা চালিয়ে গাছটার কাছাকাছি আসে। ভেড়ির দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে গাছটা। কাছ থেকে তাকালে মনে হয়, প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করে বেঁচে আছে ও। কি গাছ ওটা। মসৃণ বড় বড় পাতা। না, চিনতে পারল না কি গাছ।

হঠাৎই ওর নজর পড়ল গাছটার গোড়ায়। গোড়ায় বিরাট একটা গর্ত। গর্তটা ভেড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে। ভেড়ির মাটি বেশ খানিকটা হাঁ হয়ে আছে।

এতবড় একটা গর্তকে এভাবে কিছুতেই জিইয়ে রাখা উচিত নয়। যে-কোনো দিন ভেড়ি অধম হয়ে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। রজনীদের চোখে পড়লে ওরা এখনি এটাকে বন্ধ করার জন্য ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে ছুটে আসবে।

লক্ষ্মণ বেশ খানিকক্ষণ গর্তটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বুকের ভিতর ঢিব-ঢিব করে ওঠে ওর। মনে হল, এতক্ষণ তো ও এরকম গর্তই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তবে কি ভগবানই ওকে প্রতিশোধ নেবার জন্য গর্তটা পাইয়ে দিলেন। সামান্য একটা কোদাল থাকলে এখনি ভেড়িটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে রাখতে পারে ও। জোয়ার এলেই আর দেখতে হবে না, সমস্ত দ্বীপটা ভাসিয়ে দিতে আর কতক্ষণ।

মাথায় শয়তানের চাকা ঘুরতে শুরু করে আবার। হাত-পা নিশপিশ করে ওঠে লক্ষ্মণের। গর্তট শুরু হয়েছে জঙ্গলের দিক থেকে। ফলে ওদিকে নেমে কাজটা হাসিল করে গাছের ডাল চাপা দিয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না। রজনীরা নদীর দিক দিয়ে নৌকো বেয়ে ভেড়ি দেখছে, এদিকে কি ঘটছে বুঝবে কি করে।

আর অপেক্ষা নয়। দু'লাফে নিচে জঙ্গলের দিকে নেমে এল লক্ষ্মণ। গাছের শেকড়গুলো আলগা হয়ে বাইরের দিকে ফুলে ফুলে আছে। জোরে জোরে বার-দুয়েক চাপ দিলেই গাছটা উল্টে পড়বে ভেড়ির দিকে। গাছের গায়ে একটু ঝাঁকি দিয়ে দেখে নিল লক্ষ্মণ।

কিন্তু আগেই গাছটাকে নিয়ে ও যুদ্ধ করতে চায় না। গর্তের কাছে এগিয়ে এসে বারকয়েক পা ছুঁড়ে লাথি মারল লক্ষ্মণ। মাটি বেশ কেঁপে উঠল। মাটির ওপর ও হামলে পড়ল। তারপর দু' হাত দিয়ে মাটি আঁচড়াতে শুরু করল। মাটির বড় বড় চাপ সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করল। নরম মাটি, ফলে, তেমন অসুবিধা নেই। কিন্তু শাবলের মতো কিছু একটা হাতে থাকলে কাজটা আরো সহজ হত। নিদেনপক্ষে একটা লাঠি।

লাঠির কথা মনে আসতেই ও উঠে দাঁড়ায়। একটা গাছের ডাল ভেঙে নেবার চেষ্টা করে। আশেপাশে অসংখ্য শূলো শেকড়। ধনুকের ফলার মতো ছুঁচলো হয়ে আছে। ওরকম একটা শক্ত শূলো পেলে খুব সুবিধে হত। কিন্তু খালি হাতে শূলো তুলে নেওয়া অসম্ভব। গাছের ডালই একটা মুচড়ে ভেঙে নিল। হ্যাঁ, এটাতেই কাজ দেবে।

লাঠিটাকে বাগিয়ে ধরে গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে লক্ষ্মণ বুঝতে পারে বেশ অনেকখানি ফাঁপা হয়ে আছে ভেড়ির নিচে। উত্তেজনা বাড়ে লক্ষ্মণের। শালা, এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারলে আর পায় কে।

গর্তের ভেতর দেহটাকে অনেকখানি ঢুকিয়ে দেয় লক্ষ্মণ। লাঠি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরো অনেকখানি ও আলগা করে ফেলে। জলে ভেজা নরম মাটি, তবু এত সহজেই যে কাজ হতে থাকবে ও আশা করেনি। আরো দ্রুত ও হাত চালায়। মনের যত রাগ আর জ্বালা এইভাবেই যেন ও ছড়িয়ে যাবে এই মাটিতে।

বেশ খানিকক্ষণ ও মাটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে আবার এক সময় ও উঠে আসে। দুটো-চারটে জোয়ারের জলের ধাক্কা লাগলেই আর দেখতে হবে না। কেমন এক উত্তেজনা আর তৃপ্তিতে ওর চোখ-মুখ ঝলসে ওঠে।

গাছটাকে এবার ধাক্কাতে শুরু করে লক্ষ্মণ। গাছটাকে দিয়েই গর্তটাকে চাপা দিয়ে রাখতে হবে। গাছটা গর্তের উপর পড়ে থাকলে কেউ টেরই পাবে না গর্তটাকে।

ধাক্কায় ধাক্কায় গাছটা শেকড়সুদ্ধ নড়তে থাকে। আরো একটু চাপ কষে ও গাছটাকে মাটির উপর আছড়ে ফেলে। ভেড়ির অনেকখানি অংশ ঢাকা পড়ে যায় এবার।

তারপর হাত ঝাড়া দিয়ে ভেড়ির উপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লক্ষ্মণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ও বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আবার লাফিয়ে নিচে নেমে পড়ল। রজনীদের নৌকো নাকি ওটা! হ্যাঁ, রজনীদেরই নৌকো। চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি ওর। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওরা পুরো দ্বীপটাকে পাক খেয়ে এল কি করে। ওকে কি ওরা দেখে ফেলল।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে লক্ষ্মণ।

ডিঙি থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠেছে, কে? কে ওখানে?

লক্ষ্মণের গা দিয়ে এই ঠাণ্ডাতেও ঘাম ঝরতে শুরু করে। উত্তর দেয় না লক্ষ্মণ; এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা কি উচিত হচ্ছে! এ যে ঈশানের গলা, চিনতে অসুবিধা হল না। ঈশানরা কি চিনে ফেলেছে ওকে। যদি চিনে থাকে, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা উচিত না। ওকে এখনই পালাতে হবে। কোনোভাবে একবার নিজের ডিঙিতে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। আর এখানে নয়। প্রাণে বাঁচতে হলে আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

কিন্তু জঙ্গলের ভিতর কোন দিকে পালাবে ও। ঈশানরা কি এদিকেই এগিয়ে আসছে। ওরা এখানে এসে ভেড়ির ওপর উঠে দাঁড়ালেই তো ওপড়ানো গাছটাকে দেখতে পাবে। তখন বিরাট গর্তটাও ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

আরো একটুক্ষণ অবস্থাটা বুঝবার জন্য লক্ষ্মণ ঝোপের আড়ালে কাঠ হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকে। নাহ্, একটু একটু করে সরে যাওয়াই ভাল। পা টিপে টিপে ও পেছতে শুরু করল। আর এ-সময় প্রচণ্ডভাবে ও চমকে উঠল। গুলির শব্দ। ওকে লক্ষ্য করেই কি গুলি ছুঁড়ল, বুঝতে পারল না লক্ষ্মণ। এমনও তো হতে পারে, নিজেদের ভয় কাটাবার জন্য ওরা গুলি ছুঁড়েছে। তবে কি ওরা সাংঘাতিক কোনো জন্তু-জানোয়ার দেখে গুলি ছুঁড়ছে, নাকি ওকেই দেখল! ওরা কি নৌকো থেকে এতক্ষণে ডাঙায় নেমে পড়ল! কি জানি, কিছুই বুঝতে পারল না লক্ষ্মণ।

নাহ্, এক্ষুনি ওর পালানো উচিত। আরো জঙ্গলের গভীরে ও ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু অসম্ভব কাদা। কাদা আর শূলো কাঁটা। এগোনো যায় না। এখনি ও কাদায় আছড়ে পড়তে পারে, আর তাহলে শূলোয় গেঁথে যাবে লক্ষ্মণ। বরং মাথা নিচু করে ভেড়ির পাশ ধরেই ওর ঘাটের দিকে পালানো উচিত। একবার ঘাটের দিকে পৌঁছতে পারলে নৌকোখানা পেয়ে যাবে ও।

ঝুঁকে ঝুঁকে ও এগোতে শুরু করে।

কিন্তু ততক্ষণে ভেড়ির ওপর উঠে পড়েছে ওরা। রজনীর গলা পাওয়া গেল, ঐ, ঐ, ঐ। ঐ পালাচ্ছে!

লক্ষ্মণ কি ধরা পড়ে গেল! তবে কি ওরা বুঝতে পেরেছে, লক্ষ্মণ এখানে বসে ভেড়িতে গর্ত খুঁড়ছিল! ওরা কি বুঝতে পেরেছে, ওদের সর্বনাশ করার জন্য এখানে এই জঙ্গলের দিকে এগিয়ে এসেছিল লক্ষ্মণ!

যা থাকে কপালে, লক্ষ্মণ ভেড়ির ওপর লাফিয়ে উঠে দৌড়তে শুরু করল।

—খবরদার, গুলি করব। পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল ঈশান।

গ্রাহ্য করল না লক্ষ্মণ। প্রাণপণে ছুটতে থাকল। আর, খানিকটা দূর এগিয়ে ও বুঝতে পারল, কাজটা ও ভাল করল না। অমনভাবে ছুটতে শুরু করায় ওকে আরো সন্দেহ করছে ওরা। কি দরকার ছিল দৌড়বার। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ভালমানুষটি সেজে গেলেই তো হত।

কিন্তু আর দাঁড়ানো যায় না। লক্ষ্য করল, ওর পেছন পেছন ওরাও ছুটতে শুরু করেছে। চেঁচাচ্ছে, পালাল, মার মার মার—

পেছনে থেকে যেন কুকুর তাড়া করেছে ওরা। একবার পিছন ফিরে দেখবার চেষ্টা করে লক্ষ্মণ। ওরে ব্বাপ্, ওগুলো কি! ঢেলা ছুঁড়ছে ওরা।

আর দাঁড়াবার উপায় নেই। হাতে একটা দা-কুড়াল থাকলে তেড়ে যাওয়া যেত, কিন্তু সে উপায় নেই।

ঈশান আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, ধর শালাকে, পালাল। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে ঈশান।

লক্ষ্মণ ঘুরে দাঁড়ায়, কি করেছি আমি যে ঢিল মারছ ?

—শালা তোকে কবর দেব। ভেড়িতে যে গর্ত করেছিস, সেখানে তোকে কবর দেব। আবার ঢিল ছুঁড়ে মারল ঈশান।

নাহ্ টের পেয়ে গেছে সবাই। আর দাঁড়ানো চলে না। যে-কোনো মুহূর্তে ঢিল এসে ওর মাথায় লাগবে। আবার ছুটতে শুরু করে লক্ষ্মণ। ততক্ষণে সারা তল্লাটে যেন জানাজানি হয়ে গেছে। জঙ্গলের দিক থেকে কাঠ কাটা ফেলে দা কুড়াল নিয়ে ছুটে আসছে সবাই। এতগুলো লোকের মুখ থেকে কি করে এখন প্রাণে বাঁচবে লক্ষ্মণ! চোখে আবার কেমন হলুদ দেখতে শুরু করে ও।

কাছারিবাড়ির কাছাকাছি এসেও ভেড়ির দিক থেকে নামতে সাহস হয় না লক্ষ্মণের। লক্ষ্য করল কাঠুরেদের হাত নেড়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে ঈশান। কি বোঝাচ্ছে ?

লক্ষ্মণও কাঠুরেদের পাল্টা চিৎকার করে বোঝাবার চেষ্টা করল, আমি না, আমি কিছুই জানি না। বিশ্বাস কর, আমি না।

কিন্তু কাঠুরেরা ততক্ষণে হা-হা করে আসরে নেমে পড়েছে। হাজার হাজার ঢিল উড়ে আসতে শুরু করল ওর দিকে।

হাত তুলে ঢিল থেকে বাঁচার চেষ্টা করল লক্ষ্মণ। মাথায় এসে মস্ত একটা মাটির ঢেলা আছড়ে পড়ল। ঘুরে পড়ল লক্ষ্মণ। মাটির ঢেলা না-অন্য কিছু! একটা দা কে যেন ছুঁড়ে দিয়েছে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করল।

হাজার হাজার ঢিল উড়ে আসছে। উহ্, চোখের ডিমের ওপর কি যেন একটা কেটে পড়ল। সবকিছু অন্ধকার হয়ে যেতে থাকল। হাতজোড় করে আকুতি শুরু করল লক্ষ্মণ। বাঁচাও বাঁচাও।

অথচ ওর ওই ক্ষীণ গলার শব্দ হারিয়ে গেল। দা কাটারি ঢিল যে যা পারছে ছুঁড়ে মারছে। হ্যাঁ—মারছেই।

কোনক্রমে উঠে আবার টলতে টলতে ছুটতে শুরু করল লক্ষ্মণ। ভেড়ি থেকে গড়িয়ে নদীর ঢালের দিকে পড়ে গেল। লোকগুলো খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। একদিকে নদী, বাকি তিন দিকে ঘিরে ধরেছে ওরা।

নদীর ঢালে হাঁটু ডোবানো কাদায় আছড়ে পড়ল লক্ষ্মণ। পিঠের ওপর কি যেন গেঁথে যাচ্ছে। হাঁটু ছুঁয়ে আগুনের মতো কি যেন একটা বেরিয়ে গেল।

শেষবারের মতো আবার উর্ধ্বে হাত তুলে আকুতি জানাল ও।

কিন্তু বৃষ্টির মতো ঢিল। বজ্রের চিৎকার। মুখের চোয়ালে কি যেন একটা আছড়ে পড়ে চোয়ালটাকে থেঁত্‌লে দিল।

লক্ষ্মণ আর দাঁড়াতে পারল না। সারা গা এখন রক্তে পেছল। কাদার মধ্যে গড়াতে গড়াতে আরো নিচের দিকে নেমে এল ও। দু' চোখের দৃষ্টিতে এখন জোনাকির মতো অসংখ্য আলোকণা। ওগুলো আলো, না রক্তকণা। আশ্চর্য, এত রক্ত ওর দেহে! এত পেছল এই রক্ত! হাত নাড়তে গিয়ে বুঝল, রক্তে ভেসে যাচ্ছে ও। রক্ত না জল! তবে কি ও জলের মধ্যে নেমে পড়েছে! এত নোনতা কেন! রক্তও কি নোনতা!

ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছে কিছুই রইল না আর। ঢিলের ঘায়ে এপাশে থেকে ওপাশে টলে পড়ছিল ও। জলের ওপর অল্প অল্প দোল খেতে শুরু করল লক্ষ্মণ। তারপর ধীরে ধীরে ওর চোখের ওপর থেকে জোনাকির আলোগুলো মুছে যেতে শুরু করল। জমাট একটা অন্ধকার যেন ওকে ওকে গ্রাস করে নিতে লাগল। তারপর ওর পেট বুক নাভিকুণ্ড কোমর, অবশেষে ওর চোখ মুখ নাক সব, সবকিছু তলিয়ে যেতে শুরু করল ওই অন্ধকারে।

নদীতে এখন ভাঁটা। লক্ষ্মণ বুঝতে পারল না, নদীর ভাঁটা এখন ওকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সাগরের দিকেই নিয়ে যাবার আয়োজন শুরু করেছে কিনা!

মারমুখী লোকগুলির সামনে ধীরে ধীরে জলের তলায় তলিয়ে গেল লক্ষ্মণ।

ত্রিশ

ভেড়ির ওপর সবাই তখন হামলে পড়েছে। কেউ কেউ ভেড়ি থেকে নেমে একেবারে জলের কাছাকাছি এক কোমর কাদায়। হাতে হাতে তখনো দা কুড়াল লাঠি। কিন্তু অস্ত্রগুলি ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে হাত থেকে খসে পড়তে শুরু করেছে। মুখে কথা না থাকলেও চোখে-চোখে তখনো সবার একই ভাষা: না, আমি না, আমি নই। আমি তোমাকে আঘাত করিনি যুবক।

সমস্ত পরিবেশটাই কেমন এক অবসাদে ঢলে পড়ল। পৃথিবীর সেই আদিমতম নারকীয় ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি দেখে সবাই কেমন হতবাক। প্রস্তর বৃষ্টি ঘটিয়ে একটা মানুষকে যদি মেরে ফেলা যায়, বিশ্বসংসারে কীইবা ক্ষতি, কীইবা লাভ? মুখগুলি থমথম করতে থাকে। এত সহজেই যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে, অংশীদার হয়েও কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এখন। অথচ যা ঘটল তা স্বপ্নও নয়। লোকটা রক্তাক্ত দেহে আঘাত এড়াতে এড়াতে নদীর জলে আশ্রয় নেবার জন্য ঢলে পড়ল। নদী তাকে তলিয়ে নিয়ে গেল পাতালে।

নদীরও বলিহারি যাই। নিরবধিকাল চন্দনের মতো ঘোলা জল নিয়ে ছুটতে ছুটতে সাগরের দিকে যাচ্ছে নদী। উদাসীন ভঙ্গি। পাপ নেই, পুণ্য নেই, নির্বিকার।

ঈশান জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। লোকটা ভেসে উঠছে না কেন? চারপাশে তাকাল। আশ্চর্য, তখনো ভেড়ি ধরে ছুটে আসছে লোক। হ্যাঁ, ওই তো, সকলেই।

কি হয়েছে? কোথায়? কোথায় গেল লোকটা?

কে একজন নদীর জলে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল, ওই জলে।

—কি ওই জলে? রজনীও বিশ্বাস করতে পারছিল না, নদীর ওই জলে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বিশ্বাসই করা যায় না, ঝাঁকে ঝাঁকে যেখানে কুমিরের বাস, সেখানে জেনেশুনে কেউ পা ছোঁয়াতে পারে। কুমিরের চোখ এড়িয়ে গেলেও কামটের কথা কে না জানে! নিঃশব্দে জলের তলায় টেনে নিয়ে যেতে পারে কামটে।

রজনী আরো এগিয়ে এল, কী আশ্চর্য! গেল কোথায় লোকটা?

ঈশান তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। বলল, আহাম্মকরা ওভাবেই মরে। ভেড়িতে গর্ত খুঁড়তে গিয়েছিল, বনবিবি ওকে ডুবিয়ে মেরেছে।

—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ধরতে পারলি না?

—তুমি ধরলেই পারতে। ঈশান দাঁত মুখ বিকৃত করে কাদা থেকে দু'পা উঠে এল।

আর এমন সময় সারা আকাশ কাঁপিয়ে কে যেন চিৎকার করে উঠল। হ্যাঁ, গৌরীরই গলা।

গৌরীর গা থেকে কাপড় খসে পড়েছিল। বিভ্রান্ত দৃষ্টি। ভেড়ির দিকে ছুটে এসে ওপরে উঠে দাঁড়াল, লক্ষ্মণদা? আমার লক্ষ্মণদা কোথায়?

ঈশান এগিয়ে এল গৌরীর কাছে। গৌরী—

—লক্ষ্মণদা কোথায়? পাল্টা চিৎকার করে উঠল গৌরী।

—গৌরী। ঈশান বোঝাবার চেষ্টা করল, ও আমাদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল গৌরী।

—কি করছে ও? ডুকরে কেঁদে উঠল গৌরী।

—ভেড়িতে গর্ত খুঁড়ছিল। আমরা এতগুলো লোক এখানে জলের তলায় ডুবে মরতাম। কী সাংঘাতিক অন্যায় করছিল ও।

—তাই বলে তোমরা ওকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেবে?

—আমরা খুন করিনি গৌরী। আমরা ওকে ধরবার জন্য পেছনে পেছনে ছুটেছিলাম। আমরা ওকে জলে নামতে বলিনি।

—আমার কী হবে এখন। গৌরী ভেড়ি থেকে কয়েক পা কাদার দিকে নেমে এল। তারপর আবার চিৎকার করে উঠল, লক্ষ্মণদা গো—

ঈশান আরো এগিয়ে এল গৌরীর দিকে। কোথাকার কোন ভূত সঙ্গে করে বেরিয়েছিলে শুনি। জেনে শুনে কেউ জলে ঝাঁপায়।

—আমার কী হবে? আমি কোথায় যাব? কাদার ওপর আছড়ে পড়ল গৌরী। ফুলে ফুলে উঠতে শুরু করল দেহটা।

রজনীও এগিয়ে এল, সাঁতার জানে না ও?

গৌরী উত্তর দিল না।

বাদার লোক সাঁতার জানে না বিশ্বাস করা যায় না। রজনী তবু সন্দেহ প্রকাশ করল, সাঁতার না জানলে জলে ঝাঁপাবে বিশ্বাস হয় না।

খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে মকবুলও এসে ভেড়িতে দাঁড়িয়েছে। মকবুলই প্রথম মনে করিয়ে দিল, জলেই যদি পড়ে থাকে খোঁজাখুঁজি করে দেখা উচিত। সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে লগি-লগা নিয়ে নেমে পড়লে হয় না?

—হবে না কেন? কিন্তু জলে কে নামবে?

—জলে কেউ নামবে না। নামাও উচিত না। রজনী বলল, ডিঙিতে চড়েই খুঁজে দেখ।

ঈশান চেঁচিয়ে উঠল, মাছ ধরার গুণ নিয়ে আয় জগন্নাথ। বড় নৌকায় বাঁশ আছে, নিয়ে আয়। হঠাৎ যেন সবার মধ্যে তৎপরতা চাড়া দিয়ে উঠল।

মাছ ধরার গুণ আনতে কাছারিবাড়ির দিকে ছুটে গেল জগন্নাথ।

গৌরী আবার চেঁচিয়ে উঠল, আমার কী হবে এখন! ওহ্ লক্ষ্মণদা গো—

রজনী বলল, আর দেরি করিস না ঈশান, যা, নৌকোয় ওঠ্। আমি আছি এখানে, তুই যা।

এখন মধ্য দুপুর। শীতের দুপুর বলেই রোদের তেজটা গায়ে লাগছে না।

রজনী মেয়েটার দিকে তাকায়। মেয়েটা ফুলে ফুলে কাঁদছে। কান্না অনেকটা সংক্রামক রোগের মতো। রজনীর খুবই খারাপ লাগতে থাকে। লক্ষ্মণটাকে এভাবে তেড়ে না গেলেই হত। অন্যায় যা ও করেছে তার জন্য আলাদা সাজা ওকে দেওয়া যেত। আসলে ঈশানই যত নষ্টের গোড়া। একটা না একটা গোলমাল ও বাধিয়ে বসবেই। মেয়েটাকে নিয়ে এখন আরো কি বিপাকে পড়তে হয়, কে জানে।

ওদিকে বড় বড় কয়েকটা বাঁশ যোগাড় হয়ে গেছে। মাছ ধরার গুণও চলে

এল। পাড়ে দাঁড়িয়েই কয়েকজন গুণ ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করে দিল। গুণের কাঁটা জলের তলদেশে গড়াতে গড়াতে আবার উঠে আসছে, ফাঁকা। কিছু নেই। বেমালুম যেন জলের সঙ্গে বিন্দু বিন্দু হয়ে মিশে গেছে লক্ষ্মণ।

গুণ টেনে যে লক্ষ্মণকে পাওয়া যাবে না তা আগেই জানা ছিল। তবু গুণ না টানলে মনের অস্বস্তিও থেকে যাবে। ওদিকে ডিঙি নৌকোয় চার-পাঁচজন উঠে পড়েছে। জলের তোড়ে নৌকো সামলানো দায়। রসিকলাল বৈঠা ধরল। বাঁশ হাতে ঈশান আর জগন্নাথ। জলে বাঁশ ডুবিয়ে ধরে রাখা দায়। এই মনে হয় কিছু বুঝি একটা ঠেকছে, কিন্তু না, কিছুই না।

একটা হাত-জাল পেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখা যেত। কিন্তু জাল বয়ে আনার কথা কারোরই মাথায় ছিল না। এই অরণ্যের দেশে জাল সঙ্গে রাখার কথা কেউই ভাবেনি আগে।

জগন্নাথ বলল, লোকটা এত অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যেতে পারে বল দেখি?

ঈশান বলল, শালার আয়ু ফুরিয়েছিল। শিবের সাধ্যি নেই ওকে বাঁচায়।

আবার বাঁশ খোঁচাতে শুরু করে ওরা। জলের টানে বাঁশের গোড়া ভেসে ভেসে ওঠে। অসম্ভব শক্তি দিয়ে মাটির মধ্যে গুঁজে গুঁজে দেখতে হয়।

রজনী লক্ষ্য করল, মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ যেন স্থির হয়ে আসছে। ঘোলাটে চোখ। মুখের ওপর আঁচল চেপে ধরা। জলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ও। রজনীর মনে হল, এই মেয়েটাই আসলে খুনী। লোকটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে চিরকালের মতো ওর সর্বনাশ করে দেওয়ার মূলে এই মেয়েটাই।

ঈশান অক্লান্ত লগি খুঁচিয়ে যাচ্ছে। নৌকোর গলুই আবার ঘুরিয়ে ধরল রসিক। ছইয়ের গায়ে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল ঈশান।

—ফালতু লগি খোঁচাচ্ছিস জগন্নাথ। ও নেই।

—নেই!

—জলের টানে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে।

অসম্ভব নয়। জগন্নাথ চুপ করে থাকে। ওর সারা গা জলে ভেজা। চকচক করছে। এতক্ষণ ধরে কেউ ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে না।

—মরে যদি যায়ও ভেসে ওঠা উচিত।

—জলে ডুবে গেলে অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে ওঠে না। কখনো কখনো দু-চার দিন সময় লেগে যায়।

—কামটেই টেনে নিয়ে গেছে তাহলে।

—নিতেও পারে। ঈশান আবার লগি নামায়।

জগন্নাথ বলল, লগিতে ধরা পড়বে না। যদি ধরা পড়ে ওদের গুণ টানাতেই ধরা পড়বে।

ঝপঝপ গুণ ছুঁড়ছিল ওরা। কিন্তু বৃথাই টান। পরিষ্কার গুণের কাঁটা উঠে আসছিল ডাঙায়।

জগন্নাথ এসময় সরাসরি অভিযোগ করল, তুই অমন করে কাটারিটা ওর দিকে না ছুঁড়লেও পারতিস ঈশান।

ঈশান চমকে ওঠে, আমি! না, আমি না।

—আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না ঈশান। তোর কাটারিটাই ওর মুখে লেগেছে।

ঈশান রুখে দাঁড়াল, বাজে কথা। আমি ছুঁড়িনি। কিন্তু হাত থেকে লগিটা ওর খসে গেল।

জগন্নাথও দমবার পাত্র নয়, অনেকেই অনেক কিছু ছুঁড়েছে কিন্তু তোর কাটারিই ওকে ঘায়েল করেছে। ও সামলাতে পারেনি।

ঈশান তেড়ে এল জগন্নাথের দিকে, ফের আমার নামে দোষ চাপাবি তো তোকেও হিসেব দিতে হবে জগন্নাথ।

রসিক মাঝখানে পড়ে সরিয়ে দিল দু'জনকে।

ঈশান বিড়বিড় করে উঠল, কেন শালা, লক্ষ্মণের জন্য দরদ দেখাচ্ছিস? ভেড়িতে গর্ত খুঁড়ছিল কে?

জগন্নাথ ভেড়ির দিকে তাকাল। যেন রজনীকেই ও এসময় পাশে খুঁজছিল। রজনী মেয়েটাকে আগলে গায় গায় হয়ে বসে আছে।

—শালা, ফন্দি এঁটেছিল, আমাদের নদীর জলে ডুবিয়ে মারবে। সেদিন যে বাঁধ ভাঙল, সেটাও ওরই কীর্তি, জানিস?

জগন্নাথ তাকিয়ে থাকে। উত্তর দিলেই ঝগড়া হবে। চুপ করে থাকাই ভাল।

রসিক নৌকোটাকে এবার তীরের দিকে ঘুরিয়ে আনে।

ঈশান আবার বিড়বিড় করে, শালা নিজের পাপে নিজে মরেছে। আমরা কেউ ওকে মারিনি।

ভেড়ির ওপর থোকা থোকা মানুষ। অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছে। গুণের টানে কিছু একটা ভেসে উঠছে না দেখে সবাই কেমন অস্থির হয়ে উঠছে।

জগন্নাথ ডিঙি থেকে নেমে পড়ল। এক হাঁটু কাদা। কাদা ডিঙিয়ে ও

ভেড়িতে মকবুলের কাছে চলে এল। নেমে পড়ল ঈশানও। এগিয়ে এল গৌরীর দিকে।

রজনী ফ্যালফ্যাল করে জলের দিকেই তাকিয়ে আছে। ঈশানকে পাশে পেয়ে শুধাল, পেলি না?

ঈশান বলল, কপালে থাকলে এখনো পাওয়া যেতে পারে, ওরা গুণ টানছে।

—আমার কী হবে ঈশানদা? আবার ডুকরে ওঠে গৌরী। লোকটা যে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে বেরিয়েছিল।

—খোঁজাখুঁজি তো হচ্ছে। ঈশানের আর কিছুই বলতে সাহস হয় না।

—লক্ষ্মণদা তো পাদরিপাড়া থেকে বেরুতে চায়নি। আমিই ওকে জোর করে বার করে এনেছি।

—একটা শয়তানকে তুমি যোগাড় করেছিলে। ওরকম মানুষ ঘরের চালেও আগুন লাগাতে পারে।

—তোমরা ওকে মারলে কেন? আমাদের তাড়িয়ে দিলে না কেন?

—আমরা মারিনি। নিজেই গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রতিবাদ করে ঈশান।

গৌরীর শরীরটা আবার ফুলে উঠল, তোমরা ওকে তাড়া করে এনে এই নদীর জলে ফেলে দাওনি বলতে চাও?

ঈশান কিছুটা থমকে যায়। সব সময় মাথা ঠিক রাখা যায় না। যদি ওর শয়তানী চোখে না দেখতাম, তাহলে এক কথা ছিল।

রজনী বলল, আমি তোদের আগেই বলেছিলাম ঈশান, ওদের তাড়িয়ে দে। কি দরকার বাপু ঝামেলায় যাওয়া।

ঈশান আর কথা বাড়ায় না।

—আর তোমাকেও বলিহারি মেয়ে। বারবার ঘুরে ফিরে আমাদেরই এখানে। আমরা আছি আমাদের জ্বালায়। তার মধ্যে আবার যত সব ঝামেলা ঘাড়ে চাপাতে এখানেই।

গৌরী আবার আঁচল গুঁজে ধরল মুখে। একা একটা অসহায় লোক পেয়ে তোমরা ওকে মেরে ফেললে? তোমরা খুনী।

মকবুলের গলা পাওয়া গেল, এবার উঠে এস রজনীভাই। ওখানে বসে থেকে লাভ নেই।

গৌরী জলের দিকে চোখ পেতে বসেই থাকে, না, আমি যাব না।

—লক্ষ্মণকে যদি পাওয়া যায়, এমনিতেই যাবে। ওখানে বসে কান্নাকাটি করে কিছু লাভ আছে?

ঈশান ধীরে ধীরে সরে এসে একজনের হাত থেকে গুণের দড়ি ছিনিয়ে নেয়, আমাকে দে।

রজনী বলল, ওঠ মেয়ে। যা হয়ে গেছে তা তো আর ফেরানো যাবে না, ওঠ এবার। আর ঝামেলা বাড়িয়ো না, ওঠ।

—না, আমি যাব না! রজনীর হাতটা ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল গৌরী।

—মিছিমিছি ঝামেলা করছ। ডেকে কাছারিবাড়ি নিয়ে যাচ্ছি এই তোমার ভাগ্য।

—আমি ঘোষবনে যাব। ফাদারের কাছে সব বলব।

রজনী কেমন গুটিয়ে গেল, লক্ষ্মণকে খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, কথাটা এই জঙ্গলের বাইরে গেলেই বিপদ। তখন রজনীকে নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে আসে ওর।

—তোমরা মানুষ খুন করেছ। আমি সবাইকে বলব।

রজনী অবস্থাটা এবার সামাল দেবার জন্য ধমকে উঠল, খবরদার, যা বলছি তাই কর। উঠে পড়।

রজনীর দিকে তাকায় গৌরী। তোমরা আমাকে ঘোষবনে না দিয়ে এলে, আমি একাই বেরুব। একাই চলে যাব।

গৌরী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

রজনী বলল, আমরা তোমাকে বেঁধে রাখব না। ঘোষবনেই দিয়ে আসব। এখন চলো।

—না, আমি যাব না। গৌরী ডিঙি নৌকোর দিকে ছুটে আসতেই রজনী খপ করে ওর হাতটাকে ধরে, কি পাগলামি হচ্ছে?

—আমি যাব, আমাকে ছাড়, ছেড়ে দাও।

রজনী গায়ের জোরে ওকে টেনে নিয়ে এল জেড়ির ওপর। বলেছি তো পৌঁছে দেব। লক্ষ্মণকে পাওয়া যায় কি না দেখতে হবে আগে।

গৌরী রজনীর দিকে তাকায়। বিহ্বল চাহনি। বুক-ফাটা কেমন এক কান্না গোমরাচ্ছে, অথচ কিছুতেই কাঁদতে পারছে না যেন।

রজনী বলল, আগে কাছারিতে চল, কে দোষ করেছে তার বিচার হবে, তারপর দেখা যাবে।

গৌরী চুপ করে শুনল।

—অন্যায় যে করেছে, তাকে শাস্তি আমরা দেবই। চল। গৌরীর হাত ধরে টানল রজনী।

গৌরী এবার শরীরটাকে শিথিল করে দিল। এগোতে শুরু করল রজনীর সঙ্গেই। দৃশ্যটা তাকিয়ে দেখার মতো। এই রজনীই দু'দিন আগে মেয়েটার নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠত। তাহলে কি মেয়েটা আজ রজনীকেও বশ করল।

ঈশানও গুণ টানা ভুলে গিয়ে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। ওরা ভেড়ি থেকে নেমে ধীরে ধীরে কাছারিবাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। গৌরীর উত্তেজনা না কমলে ওর কাছে আর এগোনো যাবে না।

ঠিক এরকম যে ঘটবে ঈশান স্বপ্নেও ভাবেনি। লোকটা নিমেষের মধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যাবে কে ভেবেছিল! এ অবস্থায় আবার গৌরীর মুখোমুখি হওয়া অসম্ভব। কি কুক্ষণেই যে বাদায় এসে পা দিয়েছিলাম। ক্ষোভে গজরাতে শুরু করে ঈশান।

চার-পাঁচজন লোক তখনো ছড়িয়েছিটিয়ে গুণ টেনে চলেছে নদীতে। জলের তলায় ধারেকাছে যদি লোকটা থাকত, ঠিক পাওয়া যেত। তবে কি কুমিরে বা কামটেই টেনে নিয়ে গেল? অথচ আজ সকালেও লোকটাকে হেঁটে চলে বেড়াতে দেখা গেছে। মানুষের জীবনই বুঝি এরকম!

আর ঠিক এতক্ষণ পরে নাটকের প্রায় শেষ অঙ্কে গেঁজেল শুকদেবটাকে দেখা গেল। রক্তাক্ত চোখ। এতক্ষণ কোথায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল, কে জানে। এখানে যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে বিন্দুমাত্র বোধহয় টের পায়নি ও।

—কি হয়েছে গো ঈশান?

ঈশান এক পলক তাকাল শুকদেবের দিকে। উত্তর করল না।

—কি হয়েছে বলবে তো? এই গ্যাখো, কেউ না বললে আমি বুঝব কি করে।

—তোকে বুঝতে হবে না। ঈশান পালটা চেঁচিয়ে ওঠে, কোদাল গাঁইতা নিয়ে কয়েকজন আমার সঙ্গে চল্ দেখি। ভেড়িতে যে ঘোঁগ বানিয়ে গেছে লোকটা, সেটা আগে বুজিয়ে আসি চল্।

মকবুল তখনো দাঁড়িয়ে ছিল ভেড়ির ওপর। যারা গুণ টানছিল তাদের উপদেশ দিল, তিন স্বরোর মুখ অবধি গুণ টানতে টানতে এগিয়ে যা তোরা। না পাওয়া গেলে আর কি করা যাবে।

ঈশান নিজেই একটা কোদাল তুলে নেয়। চল্, কে কে যাবি আমার সঙ্গে।

শুকদেব চেঁচিয়ে উঠল, কি হয়েছে বলবে তো? আমি কি মানুষ নই?

মকবুল বলল, তুই আমার কাছে আয় শুকদেব, আমি বলছি।

শুকদেব এগিয়ে আসে। বলো, তুমিই বলো।

—লক্ষ্মণকে কামটে টেনে নিয়ে গেছে জলের তলায়।

—কেন?

—কেন কি? যা, আরো গাঁজা টান্ গে যা। মাথায় তোর কিচ্ছু ঢুকবে না।

শুকদেব বলল, ডাঙার মানুষকে কামটে ধরে কি করে, সেটাই তো আমার প্রশ্ন গো?

ডাঙার মানুষ জলে পা দিলে কামটে ধরবে না। যা, রাত জেগেছিস এবার ঘুমিয়ে নে গে যা।

শুকদেব আবার কি একটা রসিকতা করে। কিন্তু যা ঘটেছে তা যে আদৌ রসিকতার নয় ওকে বোঝানো যাবে না। মকবুল আবার জলের ভাঁজে চোখ ফিরিয়ে আনল। ভাঁটার নদী। জল নামতে নামতে বেশ কিছুটা কাদার লেই জমেছে তীরে। এই ভাঁটায় নদী আরো শুকিয়ে এলে লোকটাকে যদি পাওয়া যায়।

মকবুল ভেড়ির ওপরই বসে পড়ে। ঈশান আট-দশজন লোক নিয়ে ঘোগ সারাইয়ের জন্য এগিয়ে গেল। কাদায় এতক্ষণ যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তারাও এক এক করে এদিক ওদিক সরে পড়ল।

আর ওদিকে গৌরীকে নিয়ে রজনী ততক্ষণে কাছারিঘরে ঢুকে পড়েছে।

—এই মেয়ে!

গৌরী তাকায়।

—চোখেমুখে একটু জল ছিটিয়ে নাও। মিছিমিছি কেঁদে লাভ নেই। এখানে বসে বিশ্রাম কর। তারপর দেখি কি করা যায়।

গৌরী কাছারিঘরের মেঝেতে বসে পড়ে। বুকের ভেতর পুঞ্জ পুঞ্জ কান্না। কোন অপরাধে এত বড় শাস্তি হল ওর। লক্ষ্মণদা কি সত্যি সত্যি সেদিন বাঁধ ভেঙে রেখেছিল! লক্ষ্মণদা কি সত্যি সত্যি আজও ভেড়ি ভাঙবার জন্য জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল! অসম্ভব, বিশ্বাস করতে পারে না গৌরী। লক্ষ্মণদাকে যতটুকু ও চেনে এ কাজ ও করতেই পারে না। তবে কি ঈশানই মিছিমিছি ওর নামে এত সব দোষ চাপিয়ে এখন সাধু সাজতে চাইছে। কিন্তু কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গৌরী। সেদিন রাতে অমন করে কাটারি তুলে

ওকে ভয় না দেখালেই হত। লক্ষ্মণদা কি সেই রাগেই লোকগুলির ওপর প্রতিশোধ তুলতে গিয়েছিল!

—লক্ষ্মণদা গো—আবার ডুকরে ওঠে গৌরী।

রঞ্জনী খাটে বসে তাকিয়ে ছিল গৌরীর দিকে। আবার একটা ধমকি ছাড়ল, কি হল! যা বললাম কানে গেল না? চোখেমুখে জল দিয়ে এলে না?

গৌরী নীরব। লক্ষ্মণদার সঙ্গে ও নৌকোয় কাটিয়েছে। লক্ষ্মণদা ছটফট করেছে, কিন্তু ভগবান সাক্ষী, লক্ষ্মণদা তো কখনো গায়ের জোর খাটায়নি। লক্ষ্মণদা যে নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসত গৌরীকে। গৌরী কেবল সময় চেয়েছিল, সময়। বিন্ধ্যাপুরী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিল গৌরী। ওদের বিয়ে হবে, কেউ জানবে না, এমন কিছু আর ভাগ্যের সঙ্গে জড়াতে চায়নি ও। হে ভগবান, আমার কি হল গো?

—কি হল? বসে বসে কেবল কাঁদলেই হবে? রঞ্জনী খাট থেকে নেমে আসে।

—তোমরা ওকে খুন করলে কেন? আমাদের জোর করে নৌকোয় তুলে ভাসিয়ে দিলে না কেন?

—কপালের লেখা কেউ এড়াতে পারে না। রঞ্জনী দার্শনিকের মতো সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। তোমরা খ্রীস্টানরা কি বিশ্বাস কর জানি না, তবে হিন্দুদের কর্মফল আছে। যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল পায়।

গৌরীর দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে এল। রঞ্জনীর কথা ওর কানে গেল কিনা বোঝা গেল না।

রঞ্জনী এবার ওর পাশটিতে উঠে এসে দাঁড়াল। তারপর ওর পিঠে আলতো করে হাত বিছিয়ে দিল। কি হল? উঠবে না?

ঝাঁকি খেয়ে গৌরী যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, কর্মফল কি?

রঞ্জনী ওকে কাছে টেনে নিল। যে যেরকম কাজ করে, তাকে সেরকম ফল পেতেই হয়।

গৌরী আবার সরাসরি প্রশ্ন করল, আমি কিকর্ম করেছি যে এমন ফল পাচ্ছি?

গৌরীকে হাত ধরে টেনে তোলে রঞ্জনী কর্মফল মাথা পেতে নিতে হয়। ওঠ।

একটা যেন আশ্রয় খুঁজছিল গৌরী। কান্নায় ভেঙে মাথা গুঁজে দিল রঞ্জনীর বুকে।

—আহ্, কী করে, কী করে। রঞ্জনী গৌরীর দেহটা নিয়ে বৃষ্টির মতো যেন গলে গলে যেতে থাকে। আর এমন সময় হঠাৎ ওর কি খেয়াল হওয়ায় পিছন ফিরে তাকিয়েই চমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় গৌরীকে।

রজনী দেখল, দরজায় দু' হাত তুলে যমরাজের মতো তাকিয়ে আছে শুকদেব। মারাত্মক চোখ।

কিন্তু হি হি করে হেসে উঠেছে, 'বনের মধ্যে বনবিবির কত রে ভাই খেলা—'

একত্রিশ

আলো ম্লান হয়ে এসেছিল। ম্লান হয়ে এসেছিল দিনের উত্তেজনা। নদীর জলে টাটকা মুঠো মুঠো রক্ত যেন বিছিয়ে দিয়েছিল সূর্য। ওপারে জঙ্গলের মাথায় দিনের শেষ দৃশ্যের মতো সূর্যটা এখনো ঝুলে আছে। অজস্র পাখি শূন্যে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ই বোঝা যায়, সুন্দরবন পাখিদেরই দেশ। সমস্ত আলো আর উত্তেজনা ফুরিয়ে যাওয়ার পর পাখিগুলো কোথায় যে আশ্রয় নেয় কে জানে!

ভেড়িতে এখন একটাই মাত্র মানুষ, ঈশান। পা ছড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসেছিল ঈশান। খালি গা। শুকনো নুনের চাক বেঁধে আছে সারা গায়ে। চকচক করছে ঘাড়-গর্দানের মাংস। উস্কোখুস্কো চুল। চোখদুটো হলদে হয়ে আছে। ঠিক এরকমটি যে হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি ও। অথচ কিছুতেই এড়াতে পারল না ঘটনাটা। মানুষ খুন করার দায়ে ওকেই কি সবাই দুষে বেড়াচ্ছে। অথচ লক্ষ্মণের দিকে ও একা তেড়ে যায়নি। ওর একার ক্ষমতা ছিল না লক্ষ্মণকে ডুবিয়ে মারার। দশজনের ক্রোধ একসঙ্গে উগরে পড়েছিল লক্ষ্মণের দিকে। লক্ষ্মণের মৃত্যুর জন্য কেউ যদি দায়ী থাকে তবে সে একা নয়, সবাই।

পরমুহূর্তেই ও অন্যভাবে চিন্তা করল, লক্ষ্মণের মৃত্যুর জন্য লক্ষ্মণই দায়ী। নিজের পাপে নিজেই মরেছে লক্ষ্মণ। হারামিটার সমস্ত কীর্তি ভগবান দেখেছেন, ভগবান-ই ওকে ডুবিয়ে মেরেছেন। লক্ষ্মণ যে গৌরীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তা কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক ঈশান বুঝেছিল। লোকটার চোখের দৃষ্টিই ছিল অন্য রকম। ঈশানের চোখে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পায়নি ও।

অথচ গৌরীকে এসব বোঝানো যাবে না। গৌরী বুঝবে না। ভেড়ির গর্তে মাটি ঢেলে ঢেলে বন্ধ করে ঈশান গৌরীর খোঁজে এসেছিল। গৌরীকে বোঝাবার জন্য ও এগিয়ে এসেছিল কাছারিঘরের দিকে। দেখল, গৌরী কাছারিঘরের মেঝেতে শোওয়া। ঘর ফাঁকা। রজনী হয়তো কুলি-ডেরায় কোথাও জমে বসেছে।

ঈশান দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, গৌরী।

কোনো উত্তর এল না।

মেঝেতে শুয়ে ছিল গৌরী। ঈশান আবার ডাকল।

গৌরী ধড়ফড় করে উঠে বসল। চোখেমুখে কেমন এক আতঙ্ক।

—তোমাকে আমি বিষ্ণাপুরী পৌঁছে দিয়ে আসব গৌরী। সত্যি বলছি, আমি তোমাকে ঠিক তোমার দেশের বাড়িতে পৌঁছে দেব।

গৌরী কিছু শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হল না ওর। শূন্য দৃষ্টি। গৌরী কি ঈশানকে চিনতে পারছে না।

ঈশান ঘরের ভিতর ঢুকল। গৌরীর কাছে এগিয়ে এল।

কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই গৌরীর। কোনো কালেই যেন ঈশানকে ও দেখে নি এমন ভঙ্গি।

ঈশান আবেগ মিশিয়ে ডাকল, গৌরী! কথা বলছ না কেন? আমাকে বিশ্বাস কর গৌরী, আমি মারিনি।

গৌরী এবারও কোনো কথা বলল না।

ঈশান আরো একটু ঘনিষ্ঠ হল, আমি ওকে মারতে চাইনি গৌরী। ও যখন ভেড়িতে গর্ত খুঁড়ে আমাদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, আমি কেবল বাধা দিতে চেয়েছিলাম।

গৌরী ডুকরে উঠল। সর্ব শরীর কান্নায় গুমরে উঠল ওর।

ঈশান বলল, ভগবানের নামে সত্যি কাটছি, আমি মারিনি। তুমি বিশ্বাস কর গৌরী, আমি মারিনি।

গৌরী ঠোঁট কামড়ে থরথর কাঁপতে শুরু করল। এ দৃশ্য প্রকাশ করা যায় না। ঈশান শূন্য চোখে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল গৌরীর দিকে। একটু কথা বললে হয়তো ও স্বস্তি পেত। কিন্তু কান্না ছাড়া আর কোনোভাবেই গৌরী যেন নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না এখন।

এমন সময় রজনীর গলা পেল ঈশান। রজনী ডাকছে, এই ঈশান, এদিকে আয়।

ঈশান দরজার দিকে তাকায়, রজনী একা নয়, সঙ্গে মকবুল।

—এদিকে আয়, শুনে যা।

ঈশান উঠে এল, কি?

—মেয়েটাকে একা থাকতে দে। একা থাকলে সামলে উঠবে। আয়, বাইরে আয় এখন।

ঈশান তাকিয়ে রইল।

মকবুল বলল, ভাল করে একবার কেঁদে নিতে পারলে কষ্টটা ওর কমে যাবে। ওকে এখন একলা থাকতে দেওয়াই ভাল।

ঈশান একবার ঘুরে তাকাল ঘরের দিকে। লক্ষ্মণের জন্য যে ওর এত শোক জমা হয়েছিল, কল্পনাতে আনতে পারে না ও। এমন হল কেন! লক্ষ্মণকে যদি ও এত ভালবেসে থাকে, কেন তবে নৌকো নিয়ে এ-ঘাটে এল! কেন তবে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য এত আগ্রহ ছিল গৌরীর!

রজনী বলল, সব সময় মাথা গরম করে কাজ করবি, এখন ফলভোগ করতে হবে সবাইকে। ভাগ্যিস এসব জায়গায় থানা-পুলিসের ভয় নেই, নইলে সব ব্যাটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেত।

ঈশানের আর তর্ক করতে ইচ্ছে হল না। রজনী কোনোদিনই ওকে ভাল চোখে দেখেনি। আজ তো আরো দেখবে না। কিন্তু ভগবান সাক্ষী, বিন্দুমাত্র দোষী নয় ঈশান। অন্যায় দেখেছে বলেই রুখে উঠেছিল ও।

ঈশান আবার ভেড়ির দিকে অলসভাবে হেঁটে এগিয়ে এল। কিছুই ভাল লাগছে না। গৌরীর সজল চোখদু'টা কেন দেখবার জন্য কাছারিঘরে গিয়েছিল ও? কেন? নিজেরই মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। দুপদাপ মাটিতে পা ছুঁড়ে অবশেষে ভেড়ির ওপর উঠে আসে ঈশান। হাত পা ছড়িয়ে ভেড়ির ওপর বসে পড়ে। দিনের আঁলো স্তিমিত। ঠাণ্ডা বাতাসে গা পিঠ কনকন করে উঠল ওর। কিন্তু ঠাণ্ডার জন্য বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। রোদ, বৃষ্টি, শীত কতটুকুই বা কাবু করতে পারে ওকে!

নদীতে ঘোলা জলের স্রোতে ভারি কাঠ ভেসে যাচ্ছে। ভাঁটা শেষ হয়ে এখন আবার শুরু হয়েছে জোয়ার। সূর্যটা ক্রমশই যেন ডুবে যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে। নেহাত সুন্দরবন বলেই এখানে এ সময় কাঁসরঘণ্টা শঙ্খ বাজার রেওয়াজ নেই। অথচ এ সময় কলকাতায় গলিতে গলিতে মন্দিরের সামনে ভক্তদের ভিড় বাড়ে। পথে পথে ট্রাম বাস, টাঙ্গা, রিকশা, গাড়ির পর গাড়ি। মানুষের পর মানুষ। কত নিশ্চিন্তে আছে মানুষগুলি। আর এই জঙ্গলের মধ্যে কি কুক্ষণেই যে এসে পড়েছিল ঈশানরা!

নদীর দিকে তাকিয়ে কি আশ্চর্য, কলকাতার কথাই মনে পড়ল ঈশানের। মনে পড়ল, ছোটকর্তা নরেন্দ্রনারায়ণের কথা। মনে পড়ল কামিনীর কথা।

কত ভাগ্য করে ওরা জন্মেছিলেন। আর ঈশানের ভাগ্যেই লেখা ছিল এই সব।

গৌরীর জন্য জীবন দিতে রাজি ছিল ঈশান, কিন্তু সব কিছু কেমন যেন বুদবুদের মতো উবে গেল। গৌরী হয়তো আর কোনদিন ঈশানের সঙ্গে কথাই বলবে না। লক্ষ্মণকে যদি এ মুহূর্তে আবার ফিরিয়ে আনা যেত, ঈশান ফিরিয়ে আনত। কিন্তু মৃত্যু যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে কিভাবে আর ফেরাবে ঈশান।

মনে হল, কেউ যেন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঈশান ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরায়। শুকদেব। আবার চোখ ফিরিয়ে নিল ও।

শুকদেব বলল, বুড়োবাসুকির রূপ দেখছিস বুঝি ঈশান! দেখ্, দেখ্, প্রাণ ভরে দেখ্।

ঈশান কথা বলে না। নদী বুড়োবাসুকির ওপর থেকে সূর্যের সমস্ত লাল রঙটুকু মুছে যাচ্ছে। পাতলা আঁধার দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

শুকদেব পাশটিতেই বসে পড়ল, ঈশানের দিকে তাকাল। তারপর একটা মাটির ঢেলা নদীর দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে বলল, নদী শালা সব খায়। জ্যান্ত খায়, মৃত খায়। বাসী খায়, পচা খায়, সর্বগ্রাসী।

ঈশান বলল, থামবি? ভাল লাগছে না।

—এই বাপু তোমাদের একটা দোষ। যা সত্যি তা শুনতে চাও না।

—যা সত্যি তা চোখেই দেখতে পায় সবাই, তোকে আর বলতে হবে না।

শুকদেব হাসে, নদী সেদিন সাপটাকে খেয়েছিল, আজ খেল লক্ষ্মণকে। একদিন তোকেও খাবে ঈশান। একদিন আমাকেও। আমরা শালা কেউ পার পাব না।

ঈশান আবার একবার শুকদেবের দিকে তাকায়, কেন মিছিমিছি বিরক্ত করছিস?

—বেশ তো, করব না। কিন্তু আমার একটা কথা শুনতে হবে।

—কি কথা?

—আকাশে এখন তিনতারা ফুটে উঠেছে। আর এখানে বসে থাকা ঠিক নয়।

—কেন? কি হবে?

—কি হবে জানিস না? ওই দূরে জঙ্গলের দিকে তাকা?

ইচ্ছে না থাকলেও তাকায় ঈশান। কি?

—চিনতে পারছিস না?

—কি ?

—জঙ্গল কেমন গাঁকগাঁক করে হাসছে। জানিস না, রাত্রি হলে জঙ্গল হেঁটে চলে বেড়াতে পারে ?

ঈশান দেখল, জঙ্গলের দিকে চাপচাপ অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য আলোর কণা। বুঝল, জোনাকির আলো চিনবার মতো অন্ধকার জমেছে ওদিকে।

—কাল আমরা জঙ্গলের মাচায় বসে কাটিয়েছি। জঙ্গলের কায়দা-কানুন সব দেখে এসেছি।

—কি দেখেছিস ?

—দেখেছি, জঙ্গল খেয়াল-খুশিমতো ছুটোছুটি করে। জঙ্গল তার কালো কালো হাত মেলে ধরে সারারাত আমাদের মাচাটা ঝাঁকিয়েছে।

—খুব গাঁজা খেয়েছিলি নিশ্চয়ই ?

শুকদেব বলল, বিশ্বাস না করলে কিছুই বলার নেই। ঠিক আছে, জঙ্গলের কথা নয় উড়িয়েই দিলাম, কিন্তু সামনের এই নদী।

—কি করেছে নদী ?

শুকদেব হা হা করে হাসে, নদীর দিকে তাকিয়ে দেখ্ তো চিনতে পারিস কি না ?

ঈশান দেখল, সমস্ত চরাচর জুড়ে ঘন অন্ধকার ঘিরে আসছে। আর তারই মাঝে সাদা মশারির মতো কুয়াশার চাদর নেমে এসে নদীটাকে যেন ঘিরে ধরেছে। কি আশ্চর্য। নদীর ওপার দেখা যাচ্ছে না। ওপাশের জঙ্গলও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। দিগন্ত ছড়ানো কেবল জল আর জল। সাংঘাতিক একটা চেহারা হয়েছে নদীর। তারই মাঝে কুচি কুচি ফসফরাসের আগুনগুলিকে এখন চেনা যাচ্ছে।

—কি দেখছিস ?

ঈশান বলল, চল্ ফিরি এবার।

আবার হাসে শুকদেব। তবু ভাল, বড়মিঞা আমাদের দিকে নজর দেয়নি এখনো। চল্।

দু'জনে উঠে দাঁড়াল। দেখল, কাঠের স্তূপে আগুন জ্বালাবার কাজে কয়েকজন লেগে পড়েছে। ওদিকে কাছারিবাড়িটা স্তব্ধ। কুলি-ডেরায় মানুষজন আছে কি নেই বুঝবার উপায় নেই। এত স্তব্ধতা সব কি আজ লক্ষ্মণের জন্য। লক্ষ্মণই কি জিতে গেল শেষপর্যন্ত।

ভেড়ি থেকে নেমে কাছারিবাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে ওরা।

শুকদেব বলল, ঈশান, একটা কথা বলব ?

—বল্ না। কত কথাই তো বলছিস।

—কাউকে ভালবাসতে নেই রে ঈশান, কষ্ট বাড়ে।

—কাউকেই আমি ভালবাসিনি।

শুকদেব ঈশানের পিঠে হাত রাখে, নিজেকেও ভালবাসতে নেই।

কেমন দুর্বোধ্য লাগে শুকদেবকে। ঈশান থমকে দাঁড়ায়।

শুকদেব বলল, ভালবাসলেই মায়া জন্মায়। মায়া মানুষের কষ্ট বাড়ায়।

—কি বলতে চাস পরিষ্কার করে বল্ ? আমি হেঁয়ালি বুঝি না।

শুকদেব বলল, গাঁজা খাবি ?

ঈশান বলল, না। আমি খাই না।

—খেলে কষ্ট কমে।

—তোর কমুক। তাতেই আমি খুশি। আমার কথা তোকে না ভাবলেও চলবে।

কাছারিবাড়ির উঠোনে এসে হাজির হল ওরা। ওদিকে ঘোঁট পাকিয়ে পচাই খেতে বসেছে কয়েকজন। মকবুল, রজনী আর জগন্নাথ কাছারিঘরের বারান্দায় বসে গল্প জুড়েছে। গৌরী কি এখনো ঘরের মেঝেতে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। চিৎকার করে কাঁদছে না কেন গৌরী, অন্তত ওর গলার স্বর শুনতে পেত ঈশান।

—খাবি না ? আবার প্রশ্ন করে শুকদেব।

ঈশান বলল, আমায় আর বিরক্ত করিস না শুকদেব। এমনিতেই আমার মেজাজ ঠিক নেই, খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে।

ঈশান সরে এল। আর এ সময় ওর হরিণটার কথা মনে পড়ল। ভেরার পেছন দিকে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছিল ওটাকে। সারাদিন হয়তো বাঁধাই রয়ে গেছে। হন্তদন্ত হয়ে ও ছুটে এল পেছন দিকে।

সামনেই মিষ্টি জলের গড়। গড়ের এপাশে ওপাশে অনেকদূর অবধি জঙ্গল সাফ করে ফেলা হয়েছে। গাছের গুঁড়িগুলো কোথাও কোথাও উঁচু হয়ে আছে। অন্ধকারে পা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ঈশান হরিণের কাছে এল। দেখল জবুথবু হয়ে বসে আছে হরিণটা। ঈশানের পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে তাকাল। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু মুখ থুবড়ে আবার পড়ে গেল।

ঈশান আবেগ মিশিয়ে ডাকল, সোনা, সোনামণি আমার, খুব কষ্ট দিয়েছি না রে ?

হরিণের গায়ে হাত রাখতেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল ঈশানের।

—খুব কষ্ট হচ্ছে তোর? এই সোনা, বল্ না?

হরিণের সর্বশরীরে অদ্ভুত এক কম্পন গড়াতে শুরু করে। এ কম্পন কি যন্ত্রণার, না আনন্দের ধরতে পারে না ঈশান। দিন দিন হরিণটা দুর্বলই হয়ে পড়ছে। পায়ের চোট খাওয়া অংশটা ফুলেফেঁপে বড় হয়ে উঠছে। বেশিক্ষণ আর উঠে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ও। মুখে কুটোটিও কাটতে চায় না। অথচ রাশি রাশি কেওড়াপাতার ডাল ভেঙে এনে জড় করে রাখে ঈশান। আজও ভোরের দিকে নতুন পাতা এনে চারপাশে ছড়িয়ে রেখে গিয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্য, সামান্য একটুও দাঁতে কেটেছে কিনা কে জানে।

—এই সোনা। কি হয়েছে, বল্ না? তোকে বেঁধে রেখেছি বলে মন খারাপ?

হরিণটাকে জড়িয়ে কোলে তুলে নেবার চেষ্টা করে ঈশান। ভেলভেটের মতো নরম গা। উষ্ণ। কিন্তু ঝলকে ঝলকে শিহরণ বইছে গা দিয়ে। গুলি বেঁধা পায়ের কাছে হাত রাখতেই প্রচণ্ড তাপ অনুভব করল ও। হরিণটা গা ঝাঁকি দিয়ে লাফিয়ে উঠল।

—ব্যথা বেড়েছে? এই, বল্ না?

অন্ধকারে হরিণের চোখের দৃষ্টি বোঝা গেল না। দূর থেকে দেখলে হয়তো চোখদুটোকে আগুনের গোলার মতো মনে হত। এখন বুনো ভাবটা যেন অনেক কেটে গেছে।

—আয়, ঘরে আয়। ঈশান ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরল। তারপর ডেরার দিকে এগোতে লাগল।

আবার একটু থমকে দাঁড়াল। বড় আপনজন বলে মনে হচ্ছে হরিণটাকে। হরিণের মতো আজ ঈশানও তো পঙ্গু, অসহায়। কেউ বুঝবে না ওদের দুঃখ, কেউ বুঝবে না। কেউ জানতে চাইবে না, কেন ঈশান অমন করে তেড়ে গেল লক্ষ্মণের দিকে। কেন, কিসের জন্য আজ এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল এই জঙ্গলে।

—সোনা! হরিণটার গায়ে মুখ ঘষল ঈশান। চোখদুটো ওর জলে ভিজে উঠল। তোকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে খুব কষ্ট দিলাম, না রে?

হরিণশিশু নির্বিকার।

—ঠিক আছে, জঙ্গলেই নিয়ে গিয়ে আবার তোকে ছেড়ে দিয়ে আসব। যাবি?

হরিণটা স্তব্ধ হয়ে বুকের সঙ্গে সেঁটে থাকে। ঈশান ওর মুখটাকে ঘুরিয়ে ধরল, এই, বল্ না রে, যাবি? তোকে আর আটকে রাখব না সোনা। তোর গলার শেকলটা এবার থেকে খুলে রাখব। কি রাজি তো?

আবার এগোতে শুরু করে ঈশান। ঘুরে এসে কুলি ডেরার উঠোনে দাঁড়ায়। মাতালদের কে কে যেন চেঁচাচ্ছে ওদিকে। ভেড়ির ওপর থোকায় থোকায় দু'-তিনটে আগুনের কুণ্ডলি জ্বলছে। অনেকটা শ্মশানের চিতার মতো। ধোঁয়ার কুণ্ডলি গড়াচ্ছে আকাশে।

ঈশান চোখ ফিরিয়ে নেয়। পুবদিকে চাঁদের গোলাটা এখন জঙ্গলের মাথায়। স্নিগ্ধ আলোয় যেন সমস্ত বনভূমি এখন পাগল হওয়ার অপেক্ষায়। আজও জঙ্গলের ভিতরে মাচায় রাত কাটাবার জন্য কেউ কেউ আগেভাগেই গিয়ে বসে আছে কি না কে জানে!

ঈশান নিজের ঘরের সামনে এসে হরিণটাকে কোল থেকে নামাল। চল্, ঘরে চল্। একা একা বাইরে থাকা উচিত হবে না আর। চল্।

হরিণটা আবার মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। জখমী পায়ে একেবারেই ক্ষমতা নেই। ঈশান তাকিয়ে থাকল। বেচারা। কেন যে তোকে ধরে এনে কষ্ট দিলাম! কেন যে—

হরিণ কি অভিশাপ দেয়! হরিণটার অভিশাপেই কি আজ এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ঈশান।

আর এ সময় সামান্য কিছু কোলাহল ওর কানে এল। ঘুরে দাঁড়াল ঈশান। ভেড়ির দিকে কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কি, কি ঘটেছে! দেখল, বেশ কয়েকজন লোক ছুটে ছুটে ভেড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আগুনের কুণ্ডলির পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

—কি হয়েছে? উঠোনে নেমে এল ঈশান। তবে কি লক্ষ্মণকে খুঁজে পেয়েছে ওরা। তবে কি—

সমস্ত শিরা উপশিরা আবার টান টান হয়ে উঠল। সমস্ত দেহে নতুন করে আবার রক্তস্রোত দোল খেয়ে উঠল। লক্ষ্মণকে কি সত্যি সত্যি পাওয়া গেল!

ছুটে ভেড়ির ওপর উঠে এল ঈশানও, কি? কি হয়েছে?

কে একজন আঙুল তুলে দেখাল, ঐ দেখ, ওরা এসে গেছে।

—কে এসে গেছে? ঈশান নদীর দিকে তাকাল, একটা নৌকোই এগোচ্ছে বলে মনে হল ওর। হ্যাঁ, নৌকোর মাঝিদের কে যেন লণ্ঠন দুলিয়ে দুলিয়ে ইঙ্গিত করছে, এসে গেছি।

ঈশান বুঝতে পারল না কারা ওরা।

রসিকলাল বলল, নিশি আর চৈতন্যরা কলকাতা থেকে ফিরে আসছে। ওই তো নৌকো।

এতক্ষণে স্পষ্ট হল ঘটনাটা। ঈশান শুধাল, দয়ালবাবু আসেনি?

কে কে আছে নৌকোয় এখান থেকে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু যেই আসুক, বনদেবীর পুজোর সব সরঞ্জাম নিয়েই আসবে। বনদেবীর পুজো এবার তাহলে হবেই।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় তাকিয়ে থাকে ঈশান। ওদিকে রজনী আর মকবুল, ওরা ভেড়ি থেকে নেমে জলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়েছে। অপেক্ষা, অধীর অপেক্ষা। নৌকোর লণ্ঠনটা দুলছে। আলোটা যেন কোন মন্ত্রবলে এখন বশ করে ফেলছে সবাইকে।

শোনা গেল, গেঁজেল শুকদেব গান ধরেছে গলা ছেড়ে।

লোকটার কাণ্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে।

বত্রিশ

নিশি আর চৈতন্যই প্রথমে ছুটপাট করে নেমে এল ডাঙায়। বেশ খুশি খুশি। যেন রাজ্য জয় করে ফিরছে।

ওদিকে নৌকোয় তখনও ধীরস্থির প্রসন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দয়াল ঘোষ, তারই একপাশে আরো দু-তিনজন অচেনা লোক, একজনকে দেখে পুরুত ঠাকুর বলেই অনুমান হয়। বয়সে ঝরে পড়া শরীর। পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়ার মতো একটা জামা। খালি পা। চোখদুটো অস্বাভাবিক বড়।

কিন্তু দয়াল ঘোষের দিকে তাকিয়ে রজনীর যেন বিস্ময় কাটতেই চায় না। একমুখ দাড়ি গোঁফ, ঘাড় বেয়ে চুলের ঢল নেমে এসেছে। আর পরনে আলখাল্লার মতো পোশাক। এই পোশাকে দয়াল ঘোষকে দেখতে হবে ভাবাই যায় না। মাস দুয়েকের মধ্যে একটা লোক অত পালটে যায় কি করে! অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে রজনী।

দয়াল ঘোষ অল্প হাসি ছড়িয়ে রেখেছিলেন চোখেমুখে। অন্ধকারে ভেড়ির ওপারে জঙ্গল কতটা পরিষ্কার হয়েছে বোঝা যায় না। বুঝবার জন্য তেমন যে একটা আকুতি আছে, তাও না। তবু রজনীর মনে হচ্ছিল, দয়াল ঘোষ প্রথমেই

হয়তো কাজের কিরিস্তি চাইবেন। রজনীকে অপদস্থ করার জন্য নির্ঘাত উনি পায়ে পায়ে চাল ছাড়বেন।

কিন্তু যতক্ষণ না এ ব্যাপারে কথা হয়, রজনীই বা কেন আগ বাড়িয়ে বলতে যাবে। রজনীর আপাতত উচিত, দয়াল ঘোষকে অভ্যর্থনা করা। রজনী আরো এগিয়ে এল জলের ধারে। ততক্ষণে নৌকো থেকে কাঠের সিঁড়ি লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল মাঝিরা। রজনীই খবরদারি করল, আরো টেনে দে। কাদায় নামবি নাকি তোরা।

কাঠের সিঁড়ি নামানো হল। দয়াল ঘোষ পা মেপে মেপে নেমে এলেন। নেমে এলো পুরোহিত কপিল ওঝা। নেমে এল একে একে সবাই।

রজনীই প্রথমে কথা বলল, ভাল আছেন দয়ালবাবু? আপনি আসায় আমরা কি যে খুশি, বলার নয়।

দয়াল ঘোষ হাসলেন। ঈশ্বরেরই ইচ্ছা রজনী, আবার চলে এলাম। সঙ্গে কপিল ওঝাকেও নিয়ে এলাম। পুজার সব কিছু আয়োজন কপিলই করে নেবে।

রজনী ঝুঁকে প্রণাম করল কপিলকে।

—ছোটকর্তা এলেন না? প্রশ্ন করে রজনী।

—আবাদ হয়ে গেলেই আসবেন। হয়তো বিষয়-আশয় দেখার জন্য এখানেই থেকে যেতে পারেন।

রজনী একবার ঢোক গিলল, আমরাও সেই রকমই চাই দয়ালবাবু। যাঁর সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলেই বেঁচে যাই।

দয়াল ঘোষের শান্ত দৃষ্টি। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, নির্বিকার। চারপাশে কাকে যেন খুঁজছিলেন, বললেন, ঈশান কোথায়? ঘাটে আসেনি?

ঈশান দাঁড়িয়েছিল ভেড়ির একপাশে। রজনী আঙুল তুলে দেখাল, ওই দাঁড়িয়ে আছে। আজ একটা অপকীর্তি করে বসেছে ও।

ঈশান বুঝল, ওকে নিয়েই কথা হচ্ছে। এগিয়ে টিপ করে দয়াল ঘোষের পায়ের ধুলো নিল।

—হা হা, করে কি, করে কি! দয়াল ঘোষ দু'পা পিছিয়ে এলেন।

ঈশান কেমন থমকে দাঁড়াল। প্রণাম নিতে বাধা কোথায়! লোকটা কি অন্য রকম হয়ে গেলেন নাকি! এর আগে কোনোদিন তো পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে এমন করে বাধা পায়নি কেউ!

—কি করেছে ঈশান? রজনীকেই প্রশ্ন করলেন দয়াল ঘোষ।

—আগে কাছারিঘরে চলুন দয়ালবাবু, বিশ্রাম করুন, সব বলছি।

—ঠিক আছে, চল। চল হে কপিল। আয় রে ঈশান, আয়।

ঈশানের কাঁধে একটা হাত রেখে দয়াল ঘোষ এগোতে শুরু করলেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতেই ঈশানকে প্রশ্ন করলেন, সে কোথায়? তাঁকে দেখছি না?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না ঈশান। কে হুজুর?

ভেড়িতে দয়ালবাবুকে যারা দেখতে এসেছিল, তারাও সবাই দল বেঁধে হাঁটতে শুরু করেছে পেছন পেছন।

দয়াল ঘোষ বললেন, আমি সবই জানি ঈশান। সব শুনেছি।

ঈশান কেমন চমকে উঠল, আজ্ঞে আমি মারিনি। বিশ্বাস করুন হুজুর, আমি নই, আমরা কেউ নই।

—কাকে মেরেছিস? থমকে দাঁড়ালেন দয়াল ঘোষ।

রজনী বলল, একটা লোক আজ জলে ডুবে মারা গেছে এখানে। আমরা অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে খুঁজে পাইনি।

—জলে ডুবে। কোথায়? নদীতে?

—হ্যাঁ দয়ালবাবু। নদীতেই। বোধহয় কুমির কামটে টেনে নিয়ে গেছে।

দয়াল ঘোষ কেমন বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকলেন, নদীতে নেমেছিল কেন?

ঈশান আগ বাড়িয়ে বলল, আজ্ঞে হুজুর, ওইদিকে ভেড়িতে গর্ত খুঁড়তে গিয়েছিল। আমরা দেখতে পেয়ে ওকে তাড়া করেছিলাম, আর ভয়ে ছুটে ও নদী সাঁতরে পালাতে গিয়েছিল।

—কে লোকটা? ভেড়িতে গর্ত খুঁড়ছিল কেন?

সব কিছুই কেমন দুর্বোধ্য লাগে দয়াল ঘোষের। আবাদে বাস করে কেউ ভেড়িতে গর্ত খোঁড়ে এমন কথা উনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

রজনী বলল, লোকটাকে আপনি চিনবেন না। বাইরের লোক দয়ালবাবু।

—সে আবার কি রকম?

—আসুন না, কাছারিবাড়িতে আসুন, সব বুঝতে পারবেন।

ঠাণ্ডাটা বেশ জমিয়ে পড়েছে। শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছিল কপিল ওঝা। পুঁটলির ভিতর থেকে একটা বহুকালের পুরনো শাল বার করে গায়ে জড়িয়ে নিল। এখানকার লোকের কথাবার্তা কিছুই ওর মগজে ঢুকছিল না। একবার শুধু বিড়বিড় করে উঠল, ও দয়ালবাবু, এ যে ভয়ানক শীতল স্থানে নিয়ে এলেন!

দয়াল ঘোষ ওঝার দিকে তাকালেন, জল আর জঙ্গল বলেই ঠাণ্ডাটা একটু বেশি। তা কিচ্ছু চিন্তা করো না, ওরা কম্বল দেবে, হাত পা সেঁকার জন্য হাঁড়িতে আগুন এনে দেবে। দিন দুয়েকের তো ব্যাপার।

সামনেই কাছারিবাড়ি। বাড়ির বারান্দায় একটা ডে লাইট জ্বলছে। হ্যাঁ, দয়াল ঘোষ যখন ওই ঘরে থাকতেন, তখনো এমনিই জ্বলত ওখানে। ওদিকে ডেরাগুলোর আশেপাশে দুজন-একজন লোক। দেখেই বুঝতে পারলেন, সবাই মত্ত। এখানে পচাই পান করা ছাড়া ক্লান্তি হরণের আর কিই বা পথ থাকতে পারে। ভ্রূক্ষেপ করলেন না। লোকগুলোর মধ্যে পুরনো দুজন-একজন চেনা মুখও পেয়ে গেলেন কিন্তু এখন আর কাউকে ডাকতে সাহস করলেন না।

কাছারিঘরের দিকে তাকালেন, ঘরটাকে নতুন করে তোলা হয়েছে দেখছি।

রজনী বলল, আগের ঘরটা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তাছাড়া আমরা এখানে এসে ও ঘরে বাঘ দেখেছি। সে এক সাংঘাতিক বিপদ গেছে আমাদের।

—শুনেছি।

বারান্দায় উঠে এল ওরা। রজনী বলল, দয়ালবাবু ঘরে কিন্তু একজন মেয়েমানুষ আছে।

—কে? গৌরী?

রজনী চমকে উঠল, আপনি জানেন?

—গৌরী ফিরে এসেছে আমি কলকাতাতেই শুনেছি। আর আমিও সেই দেবীমূর্তিকে দেখবার জন্যই ছুটে এসেছি।

রজনী কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আপনি এখনো ওকে বিশ্বাস করেন?

দয়াল ঘোষ মৃদু হাসলেন, তোরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিস। তোদের ক্ষমতা কি, দেবী আর মানবী আলাদা করে চিনবি? কোথায় গৌরী, আয় চোখ ভরে একবার দেখি।

দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল ওরা। একটা তেলের কুপি জ্বলছিল একপাশে। আবছা আবছা আলো। দয়াল ঘোষ সেই ক্ষীণ আলোতেই দেখতে পেলেন, মাটিতে একটি নারীমূর্তি—জবুথবু হয়ে শুয়ে আছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। আড়ালে পড়ে আছে।

দয়াল ঘোষ ডাকলেন, মা! মা গো—

কি আশ্চর্য! নিঃসাড়। কি হয়েছে? দয়াল ঘোষ রজনীর দিকে তাকালেন।

রজনী ফিসফিস করে বলল, বাইরে আসুন, বলছি।

কপিল ওঝার চোখমুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। বিড়বিড় করে বলল, আমাকে কোথায় শুতে দেবে বাপুরা, জায়গাটা দেখিয়ে দাও। এ ঠাণ্ডায় আমি জমে গেলাম।

রজনী বলল,আপনারা কি এ ঘরেই থাকবেন, না আলাদা বন্দোবস্ত করব ?

—এখানে শুনেছি জন্তু-জানোয়ারের ঝামেলা আছে, আমাকে আলাদা রেখে কি মেরে ফেলতে চাও ? কপিল ওঝার গলা ক্যাসক্যাস করে উঠল।

—আজ্ঞে না না, কি যে বলেন। বেশ তো, এ ঘরেই থাকবেন, একসঙ্গেই থাকবেন।

দয়াল ঘোষ বললেন, থাকাটা যা হোক করে হয়ে যাবে কিন্তু স্বপাকে খায় কপিল। নৌকোয় ওর রান্নার জিনিসপত্র রয়েছে। ওগুলো নামিয়ে এনে ওকে আলাদা একটু জায়গা করে দে আগে। ও বেচারিকে এমনিতেই নৌকোয় বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে।

রজনী বলল, আমি এখনই সব আনিয়ে দিচ্ছি, দয়ালবাবু। বারান্দার নিচে চোরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়েছিল ঈশান। দাঁড়িয়েছিল অনেকেই। রজনী ঈশানকেই নৌকো থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসার ইঙ্গিত করল।

ঈশান আবার ভেড়ির দিকে ছুটল।

দয়াল ঘোষ বললেন, বারান্দায় একটা কম্বল বিছিয়ে দে, বাস।

এমনিতেই একটা কম্বল বিছানো ছিল, রজনী সেটাকে ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে দিল। ওরা বসল।

এখানে দেখছ তো কি অবস্থা ! আচার-বিচার দেশ কাল পাত্র হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি। একটু জুত করে বস দেখি কপিল। কম্বল একটা গায়ে চাপাও।

কপিল বসল। কিন্তু পরিবেশ দেখে কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিল। পুজো করাবার জন্য কলকাতা থেকে ওকে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু এ কেমন ছন্নছাড়া দেশ রে বাবা। আগে জানলে কে রাজি হয়। মুখটা গোঁজ করে বসে কপিল।

দয়াল ঘোষ যত দেখছিলেন, ততই যেন রোমাঞ্চিত হচ্ছিলেন। এমনি অন্ধকার বারান্দায় ডে-লাইট জ্বালিয়ে কত দিন এখানে উনি কাটিয়ে গেছেন। সামনেই কুলি ডেরায় হৈচৈ চলবে গভীর রাত পর্যন্ত। দূরের ওই বাঘ-তাড়ানো আলোগুলি জ্বলতে জ্বলতে ভোরের দিকে ম্লান হয়ে আসবে। আরো দূরে ওই খাপছাড়া জঙ্গলের রহস্য কে বুঝতে পারে! জঙ্গলের দিকেই তো একদিন সেই উজ্জ্বল আলোকময়ী দেবীমূর্তিকে উনি দেখেছিলেন। বুকের ভেতর অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ অনুভব করতে শুরু করলেন দয়াল ঘোষ।

—গৌরীর কি হয়েছে রজনী ?

রজনী হাঁটু ভেঙে কম্বলের একপাশে বসল, আজ্ঞে দয়ালবাবু, মেয়েটা এবার এল সঙ্গে একজন চন্দনদার নিয়ে।

দয়াল ঘোষ শুধোলেন, চন্দনদার কি রকম ?

—আজ্ঞে দয়ালবাবু, লোকটার নাম লক্ষ্মণ। ওরা দুজনে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা এসে হাজির। মেয়েটাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম। কিন্তু লোকটা আমাদের অচেনা।

—কে লোকটা ?

—ওরা নাকি খ্রীস্টান। লোকটার মুখে শুনেছি মেয়েটা সেবার ভাসতে ভাসতে নাকি ঘোষবনে উঠেছিল। সেখানকার পাদরিপাড়ার সাহেবরা ওকে ধরে খেস্টান বানিয়ে দিয়েছে।

কপিল ওঝা ঘরের দরজায় চোখ পাতে। ঘরের মধ্যে যে মেয়েটা শুয়ে আছে ওটা খেস্টান, তাহলে তো বাপু হিন্দু-মুসলমান-খেস্টান সবই জুটে গেছে এখানে। এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন বলুন দেখি।

দয়াল ঘোষ হাসলেন, মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ কপিল, অসহায় নারীকে জোর করে ধরে কেউ যদি খ্রীস্টান বানিয়ে দেয় তাহলে কি সে খ্রীস্টান হয়ে যায়।

—আমি রামকৃষ্ণ নই দয়ালবাবু। যজমানী করে খাই। চোদ্দ জাত নিয়ে কারবার করলে আমাকে সমাজে একঘরে করবে। দোহাই আপনাদের, আমাকে একটু আলাদা ঘরে জায়গা করে দিন। না হয়, ওই নৌকোতেই আমি কাটিয়ে দেব।

দয়াল ঘোষ বললেন, তাই হবে। মিছিমিছি কেবল ব্যস্ত হচ্ছ। জাতধর্ম যাতে না যায় সেই ব্যবস্থাই করা হবে।

ততক্ষণে কপিল ওঝার বাসনপত্র বিছানা সব কিছু নিয়ে এসেছিল ঈশান। দয়াল ঘোষ বললেন, কুলি ডেরায় একটা ঘর খালি করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দে। আর খবরদার ও ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।

কপিল ওঝা উঠে দাঁড়ায়। চল, কোন ঘরে আমাকে দিচ্ছ দেখে নিই। বলতে বলতে কয়েকজনের সঙ্গে কুলি ডেরার দিকে এগিয়ে গেল।

দয়াল ঘোষ বললেন, আশপাশ থেকে পুরুত পেলি না ? এসব বুড়ো লোকদের টেনে আনার ঝামেলা অনেক। ভালয় ভালয় এখন কাজটুকু সারতে পারলে বাঁচা যায়।

দয়ালবাবুর কথা শোনার জন্য সবাই বেশ চাক বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। অনেককেই মুখ চেনা লাগছিল দয়াল ঘোষের। কিন্তু সবার কথা শোনার আগে সেই লক্ষ্মণের প্রসঙ্গেই উনি ফিরে এলেন।

—হ্যাঁ, সেই লক্ষ্মণ না কি নাম বললি, সে গৌরীকে নিয়ে এখানে এসে হাজির হল। তারপর?

রজনী বলল, তারপর যা হবার তাই হল আমাদের। একদিন বাঁধ ভাঙল। সে কি জলের তোড় দয়ালবাবু, চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। অনেক কষ্ট করে আবার বাঁধ মেরামত করলাম। কি রে জগন্নাথ বল্ না?

জগন্নাথ বলল, হ্যাঁ হুজুর, আমরা সময়মতো টের না পেলে বানের জলেই ভেসে যেতাম।

মকবুল বলল, আসলে ক'দিন ধরেই খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

—বৃষ্টি হলে ভেড়ি ভাঙবে না এমন কথা নয়, ঈশানের ধারণা ঐ লক্ষ্মণই নাকি ভেড়িতে মাটি কেটে রেখেছিল।

—কেন? অদ্ভুত চোখে তাকালেন দয়াল ঘোষ। মাটি কাটবে কেন?

এমন সময় ঈশানেরই গলা পাওয়া গেল, ও ভেবেছিল আমাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারবে হুজুর।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তাতে কি লাভ ওর?

ঈশান বলল, গৌরী ডাঙায় উঠেছে যে। খুব বৃষ্টি নামল সে দিন, নৌকোয় সব ভিজে একশা। আমরা ওকে ডাঙায় তুলে আলাদা একটা ঘর দিলাম। আর ও ভাবল, আমরা গৌরীকে ওর মুঠো থেকে কেড়ে নিলাম।

দয়ালবাবু নীরবে শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বললেন, লোকটা কে হয় ওর?

—আজ্ঞে, কেউ না হুজুর। ঈশান এগিয়ে এল, আপনি গৌরীকে জিজ্ঞেস করুন, কেউ নয়।

—কেউ নয়, অথচ—

—হ্যাঁ হুজুর। লোকটা গৌরীকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে এসেছে। মেয়েটার সর্বনাশ করত হুজুর।

—গৌরী এল কেন? ও তো আর ছোটটি নয়?

—মেয়েটাকে দেশের বাড়িতে মায়ের কাছে নিয়ে যাবে বলে ও লোভ দেখিয়েছিল। আসলে সব বাজে কথা। আমার কাছে লোকটা চালাকি লুকোতে পারেনি। ধরা পড়ে গিয়েছিল হুজুর।

—দেশ কোথায় গৌরীর?

রজনী বলল, আজ্ঞে বিষ্টুপুরী না কি যেন নাম বলছে। কোন থানা, কোন মৌজা কিছুই জানে না।

ঈশানকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। দয়াল ঘোষের কাছে এসব কথা বলতে পারায় কিছুটা যেন স্বস্তিও পাচ্ছিল ও। বলল, আজ ভোরে আমরা ভেড়ির চারপাশ ঠিক আছে কিনা দেখতে বেরিয়েছিলাম।

দয়াল ঘোষ তাকিয়ে থাকলেন।

—পশ্চিম দিকে এগিয়ে দেখি, লক্ষ্মণ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আবার ভেড়িতে গর্ত খুঁড়তে বসেছে।

দয়াল ঘোষ এবারও কথা বললেন না।

রজনীরাও সমর্থন করল, হ্যাঁ, দয়ালবাবু, ঘটনাটা সত্যি।

—আমি দেখতে পেলুম প্রথম। আর তাইতে আমার মাথায় রক্ত ছুটে এল। ওকে ধরবার জন্য পেছু তাড়া লাগালাম। একবার ধরতে পারলে হুজুর ওকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতাম। কিন্তু—

রজনী বলল, লোকটা নদী সাঁতারে পালাবে ভেবেছিল।

দয়ালবাবু শুধোলেন, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল? বারণ করলি না?

—ওর কপালে ওই ভাবেই মৃত্যু ছিল হুজুর।

দয়াল ঘোষ চমকে উঠলেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস, মৃত্যু যে কিভাবে আসে তা আমাদের সাধ্যি কি জানব।

—লোকটাকে আমরা নদীতে সারাদিন ধরে খুঁজেছি। কিন্তু—

ঈশান বলল, আর গৌরী সেই শোকেই ঘরের মধ্যে অমনভাবে পড়ে আছে। কথা বলছে না। কথা বললে যেন বুঝতেও পারছে না।

রজনী বলল, মাঝে মাঝে কেবল দেশে ফেরার কথা বলে ডুকরে উঠছে! যত বলি, কোন দেশ? কিভাবে যেতে হয় সেখানে? তা কিছুই জানে না।

দয়াল ঘোষ গুম হয়ে গেলেন। সকলের সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল। পরিবেশটা কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল।

ডে লাইটের চারপাশে পোকা ঘুরছে, আলোর গায়ে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা করছে পোকাগুলি। দয়াল ঘোষ চোখ ফিরিয়ে নিলেন, এ কি মরণখেলা ওদের! আলোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন বলেই কিনা কে জানে চোখে উজ্জ্বল হলুদ রং লেগে রইল অনেকক্ষণ। রঙের ঘোরটা কেটে যেতেই আবার কথা বললেন দয়াল ঘোষ, কোন দেশ?

—আজ্ঞে।

—কোন দেশে যাবে ও?

ঈশান বলল, বিদ্যাপুরী। বিদ্যাপুরী নাকি বহু প্রাচীন গ্রাম।

দয়াল ঘোষ চোখ বুজলেন, হ্যাঁ, বহু প্রাচীন। মানুষ সেখানে যায় আর আসে।

রজনী তাকিয়ে রইল। দয়ালবাবুও কি ঘোরের প্রলাপ বকতে শুরু করলেন নাকি! কে জানে বাবা, লোকটার মাথায় কখন যে কি হয়।

দয়াল ঘোষ চোখ খুললেন, তোরা কেউ বৃথা চেষ্টা করিস না ঈশান। ওর পথ ওই চিনে নেবে। সে পথ কি কেউ কাউকে চেনাতে পারে। তোরা বৃথা চেষ্টা করিস না কেউ।

এসব কথার কোনো মানে নেই। রজনী প্রসঙ্গ ঘোরাবার চেষ্টা করে, দয়ালবাবু, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। এবার আমাদের খাবার আনতে বলি ওদের।

দয়াল ঘোষ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেরি করে লাভ নেই। কাল সকালে সব একসঙ্গে বসে কথা হবে। সেই ভাল।

বলতে বলতে দয়াল ঘোষ উঠে দরজা পার হয়ে আবার ঘরে ঢুকলেন। আবছা আলোয় দেখলেন, মেয়েটা পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, সেই মুখ। সেই বিন্দু বিন্দু মায়ের দয়ার চিহ্নগুলো স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। কিন্তু সারা মুখে এখন প্রশান্তি। এমন মুখ দেবী ভগবতী ছাড়া আর কার হয়।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন দয়াল ঘোষ।

তেত্রিশ

গৌরী আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিল। সারাটি দিন আজ কুটোটিও দাঁতে কাটেনি। এক ফোঁটা জলও না। শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তাই দুর্বলতা নামতে শুরু করেছিল ওর। আর সেই দুর্বলতা থেকেই-মনে হচ্ছিল, দেহটা যেন অস্বাভাবিক হালকা হয়ে উঠেছে। যেন এখন ও ইচ্ছে মতো বাতাসেও ভেসে বেড়াতে পারে।

চোখ মেলে তাকালে মনে হয়, অসংখ্য বিন্দু বিন্দু আলোর কণা অসংখ্য হিজিবিজি দাগ। চোখ বুজে থেকেও রেহাই পাচ্ছিল না গৌরী। অজাগতিক কিছু দৃশ্যের ভিড়ে ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, অর্থহীন অপরিচিত কিছু মুখের মেলা, অবান্তর কিছু সংলাপ। কিছুতেই সেখানে খাপ খাওয়াতে পারছিল না গৌরী।

ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে ঝিম ধরে পড়ে রইল। পাশ ফিরল। একটা কুপি জ্বললেও সারা ঘরে রহস্যময় অন্ধকার। ঘরের বাইরে প্রখর আলোয় একটা

ডে-লাইট জ্বলছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দু-চারটি আলোর রেখা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন যেন ইচ্ছে করলে আলোর রেখাগুলি আশ্রয় করে ও উঠে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু না, একটুও নড়তে পারছে না গৌরী। সারা দেহে অসম্ভব ক্লান্তি।

মৃত্যুর পর কি হয় মানুষের? মানুষের আত্মা কি প্রিয়জনের মোহ কাটাতে না পেরে আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়? লক্ষ্মণদার আত্মাও কি এখন ঘরের এই পাশটিতে কোথাও গৌরীর জন্য অপেক্ষা করছে? গৌরীর দিকেই কি তাকিয়ে আছে লক্ষ্মণদা?

কেন, এমন হল কেন? বেচারি লক্ষ্মণদা তো কোনো অন্যায় করেনি। সারাক্ষণ কেবল কাছে পেতে চেয়েছিল গৌরীকে। আলাদা একটা সংসার গড়তে চেয়েছিল গৌরীকে নিয়ে। গৌরীও কি এরকম কিছু চায়নি! নিশ্চয়ই চেয়েছিল, লক্ষ্মণদা তা বুঝল না। কত করে লক্ষ্মণদাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে গৌরী, বিদ্যাপুরীতে ফিরে গিয়ে মাকে জানিয়েই সব কিছু করা যেত। মার চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিমাইয়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে যে অন্যায় করেছে ও লক্ষ্মণদাকে নিয়ে মার কাছে দাঁড়ালে হয়তো কিছুটা তার ঘোচানো যেত। লক্ষ্মণদা বুঝল না। গৌরীকে কেউ বোঝে না। কেউ না।

গতকাল রাতে কাটারি নিয়ে ভয় দেখাতে হয়েছিল লক্ষ্মণদাকে। লক্ষ্মণদা কি সেই রাগেই প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিল ভেড়ি কুপিয়ে! অসম্ভব, হতেই পারে না। ওসব ওদের বানানো কথা। লক্ষ্মণদাকে প্রথম থেকেই ওরা পছন্দ করেনি। কি দোষ করেছে লক্ষ্মণদা, যে অমনভাবে অতগুলো লোক ওকে একা পেয়ে মেরে জলে ভাসিয়ে দিল। সব পারে ওরা। খুনী আসামীরা সব পারে!

ঈশানের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই ঈশানই তো একদিন নৌকোতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গৌরীকে সেবা করেছিল। কেন, কেন গৌরীকে ও সেবা করতে এগিয়ে এসেছিল। ও তো খুনী! ও তো অনায়াসে মানুষ খুন করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে পারে। অথচ এই ঈশানকেই আবার একবার চোখ ভরে দেখার জন্য লক্ষ্মণদাকে নিয়ে গৌরী এখানে এসে হাজির হয়েছিল। ঈশানের ভেতরটা যে এত জঘন্য; কেন, কেন ও বুঝতে পারে নি আগে। বিন্দুমাত্র যদি টের পেত ও, কক্ষনো আসত না। এই জঙ্গলে সাধ করে কে আসে! ভুলেও নৌকো থামাত না ওরা।

পেটের ভেতর গুড়গুড় করে ঘুলিয়ে ওঠে। সারা গায়ে উথলে ওঠে বমির আবেগ। পাশ ফিরল গৌরী। উহ্ মাগো—ডুকরে উঠেই আবার স্থির হল।

বাইরে বারান্দায় লোকগুলির ফিসফিস গলার শব্দ কিছু কিছু কানে আসছে। কি বলাবলি করছে ওরা! কি ষড়যন্ত্র! গৌরীকেও কি ওরা ওইভাবে রামদা দিয়ে কুপিয়ে কেটে জলে ভাসিয়ে দেবে! দিক না, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে সেই ভাল। মৃত্যুর পর কি হয় মানুষের! গৌরীও কি তখন অশরীরী হয়ে আবার কাছে পেয়ে যাবে লক্ষ্মণদাকে।

লক্ষ্মণদা, আমি বুঝতে পারিনি লক্ষ্মণদা। এখানে এলে তোমার এ অবস্থা হবে আমি বুঝতে পারিনি। যদি বিন্দুমাত্র টের পেতাম লক্ষ্মণদা, বিশ্বাস কর, আমি এখানে আসার কথা বলতাম না। সব আমার ভাগ্য। আমার ভাগ্যের সঙ্গে কেন তুমি জড়াতে এলে লক্ষ্মণদা! পাদরিপাড়ায় বেশ তো নিশ্চিন্তে তুমি আশ্রমের ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ শেখাতে। কেন তুমি অমন করে আমায় ভালবাসলে! কেন তুমি এমন একটা হতভাগীর সঙ্গে নিজের ভাগ্যটাকে জড়াতে গেলে!

সমস্ত স্নায়ু কেমন অবশ হয়ে আসছে। মাথার ভেতর শূন্য মাঠ। অবারিত শূন্য মাঠে ঝিঁঝি ডাকছে। একটানা অবশ করা একটা শব্দ। আর মালার মতো অসংখ্য জোনাকির আলো। নিরুত্তাপ অসংখ্য আলোর কণা। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওই আলোর ফুলকির সঙ্গে গা ভাসিয়ে ছুটোছুটি করছে ওরা কারা!

মেয়েদুটোকে প্রথম দিকে চিনতে পারেনি গৌরী। চেনার জন্য তেমন একটা আগ্রহও বোধ করেনি। কিন্তু অমন করে ওরা বারবার এগিয়ে আসছে কেন গৌরীর দিকে।

—এই! গৌরী যেন এতক্ষণ পর চিনতে পারল চিন্ময়ীকে। ফ্রক পরা কুচুটে মেয়েটাই তো বেলা। মুখ ফিরিয়ে নিল বেলার দিক থেকে।

চিন্ময়ীর চোখে মজা দেখার হাসি। গৌরীর বুকের ভেতর জ্বালা করে উঠল। ওরা তো মজাই দেখবে এখন। হিংসুটে চিন্ময়ীর দিকে ফিরেও তাকাত না লক্ষ্মণদা। বেলার দিকেও না। ওরা সহ্য করবে কি করে।

গৌরী দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে শুধাল, মজা দেখতে এসেছিস? মর্, মর্, মরণ হয় না তোদের?

চিন্ময়ী আর বেলা খুঁতখুঁত করে হাসে, লক্ষ্মণদাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলি না? এবার আঁচল থেকে বার করে দেখা লক্ষ্মণদাকে, দেখি।

গৌরীর চোখে মুক্তার মতো জলের দানা। পালিয়ে এসেছি, বেশ করেছি। তোদের কি? তোদের দিকে তো ফিরেও তাকাত না লক্ষ্মণদা। তোদের গায়ে লাগে কেন?

গৌরীর আর ঝগড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কোথায় এ সময়ে ওরা অন্য কথা বলবে, তা নয়, পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া। পাদরিপাড়ার আশ্রমে একটাও যদি ভাল মেয়ে থাকে! সব হিংসুটে। কারো একটু ভাল হোক অমনি ওদের গা জ্বলবে।

অথচ দুর্লভদার কথা ওর মনে পড়ে, কুন্তিদির কথা। ওরকম মানুষ ক'জন হয়! ওদের জন্যই তো জীবন বেঁচেছিল ওর। অমন অসুস্থ রুগীকে কে কোলের উপর টেনে নিয়ে সেবা করে। আর ফাদার, ওরকম মানুষ একটাও দেখেনি গৌরী। অমন লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, অমন প্রসন্ন হাসি চোখেমুখে, একবার তাকালে আর চোখই ফেরানো যায় না।

ফাদারের কাছে আবার ফিরে যাওয়া যায় না! ফাদারের কাছে কোনো কথা লুকিয়ে রাখতে নেই। সমস্ত কথা এক এক করে বলে ফেলে নিজেকে হালকা করে ফেলা যায় না! ফাদার তো ক্ষমা ছাড়া আর কিছুই জানেন না, ফাদার নিশ্চয়ই ওকে ক্ষমা করবেন। ফাদার নিশ্চয়ই এখানকার জংলিগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য পুলিস ডাকবেন। লক্ষ্মণদাকে আজ যারা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করল তাদের এক এক করে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করবেন।

গৌরী অস্ফুটে ককিয়ে উঠল, ফাদার। দেখে যাও গো ফাদার, আমি এখানে একা। মার কাছে আমার আর ফিরে যাওয়া হল না ফাদার।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল গৌরী। পাদরিপাড়ায় পাশ দিয়ে নদী, গীর্জা, আশ্রম, ধানের ক্ষেত, ছোট ছোট সাজানো-গোছানো বাড়ি, সব কিছু ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ও মা, ওই তো ফাদার। সাদা আলখাল্লা গায়ে ওই তো ফাদার দুর্লভদার সঙ্গে কথা বলছে। কি বলাবলি করছে ওরা। তবে কি গৌরীর কথা ওরা জেনে গেছে! গৌরীকে সাহায্য করার জন্য ওরা ছুটে এসেছে!

গৌরী আবার অস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, দুর্লভদা—দুর্লভদা গো। আমি বিদ্যাপুরী যাব। তোমার পায়ে পড়ি দুর্লভদা আমাকে একটিবার বিদ্যা-পুরীতে মার কাছে নিয়ে চল। শুধু একটিবার।

ফাদারের চোখে প্রসন্ন হাসি। ফাদার প্রার্থনা সভায় যেমন করে সবাইকে বোঝান, তেমনি করে যেন কিছু বলতে চাইছেন গৌরীকে। কি বোঝাতে চাইছেন ফাদার।

দুর্লভদা আরো এগিয়ে এল গৌরীর কাছে, ওঠ। উঠে কিছু খেয়ে নাও। আগে শরীর, পরে তো শোক দুঃখ, আনন্দ উল্লাস। গৌরী কথা শোন।

গৌরী দেখল, দুর্লভদার হাতে কিছু খাবার। পাতায় ঢাকা। আর এক হাতে এক ঘটি জল।

ফাদারের দিকে চোখ পাতল গৌরী। সেই প্রসন্ন দীপ্তিময়ী হাসি।

ফাদার আরো এগিয়ে এলেন। ও কি, ওরই পাশটিতে যে উবু হয়ে বসলেন! ওর চুলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করলেন।

দু'চোখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে উঠল গৌরী।

—কেঁদ না মা। কাঁদতে নেই। ওঠ।

গৌরীর দেহটা কান্নায় উথলে উঠল, এরকম হল কেন, কেন, কেন? লক্ষ্মণদা তো কোনো দোষ করেনি।

—দোষ গুণের বিচার কি মানুষ করতে পারে?

—পারে না? গৌরী থমকে গেল।

—না, পারে না। পারলে মানুষ দুটোই করত না। দোষগুলোকে এড়িয়ে চলত। আসলে কর্মফল। বিধির লিখন। জন্মের সময়ে ছমছমে প্রদীপের আলোয় বিধাতাপুরুষ যা লিখে দেবেন, তাই বয়ে বেড়াতে হবে আজীবন। ওর জন্য দুঃখ করতে নেই।

দুর্লভদা খাবারের ঠোঙাটা ওর সামনে এগিয়ে ধরল। খেয়ে নাও, ওঠ।

—আমাকে বিদ্যাপুরীতে নিয়ে যাবে বল?

ফাদার হাসলেন, বিদ্যাপুরী যাব বলেই তো আমরা সারাজীবন ছুটোছুটি করে মরছি মা। কেউ যে পথ চিনি না।

বিদ্যাপুরীতে আমার মার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে না?

—আমাদেরই বরং হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল গৌরী। শুনেছি সব দুঃখকষ্টের ওখানেই শেষ।

গৌরী মুখ থেকে আঁচল সরাল। একি, ফাদার আর দুর্লভদা কোথায়। এরা কারা।

—ওঠ মা, ওঠ, কিছু খেয়ে নাও। নইলে এরপর আরো কষ্ট বাড়বে।

গৌরী স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে, রজনীকে চিনতে পারে, কিন্তু এ লোকটা কে? এ কি কোনো সন্ন্যাসী। একেই কি এতক্ষণ ফাদার হিসাবে ভুল করছিলাম। দু'চোখে কেমন মায়া। কত যত্ন করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে লোকটা।

গৌরী আবার ডুকরে উঠল, বাবা! বড় কষ্ট আমার।

—ধুর বোকা, ছেলের সঙ্গে বুঝি ওরকম করে কথা বলতে হয়! কলকাতা

থেকে ছুটে এসেছি মায়ের মুখ দেখব বলে। কোথায় মা হয়ে আমাকেই সান্ত্বনা দেবে, তা না।

গৌরীর সারা অঙ্গে রোমাঞ্চ খেলে গেল। কি বলতে চায় লোকটা? কেমন যেন রহস্যময়। আগ্রহে ও তাকিয়েই থাকে।

—ওঠ মা, আগে কিছু খেয়ে নাও। আর এই ঠাণ্ডায় স্যাতসেঁতে মাটিতে কি কেউ শুয়ে থাকে! ওঠ, উঠে ওই খড় বিছানো বিছানায়, ওই যে ও দিকে।

গৌরী দেখল, ঘরেরই এক কোণে পুরু করে খড় বিছিয়ে তার উপর একটা কম্বল পেতে দেওয়া হয়েছে।

রজনী খাবার পাত্রটা এগিয়ে ধরে।

গৌরীর শিথিল দেহে কেমন যেন একটা প্রশান্তি নেমে এল। ওকে এখনো দেখাশোনা করার কেউ আছে তাহলে! বিশ্বাসই করতে পারছে না, এই জঙ্গলের মধ্যেও মানুষ আছে!

দয়াল ঘোষ তুলে ধরলেন গৌরীকে। খেয়ে নাও মা। আগে সুস্থ হও। তারপর—

—তারপর কি?

—তারপর সব শুনব। আজ না হয় কাল শুনব। কেমন করে এই চৌধুরীর আবাদে তুমি ভেসে এলে মা সব শুনব।

গৌরী খাবার মুখে তুলল, বিদ্যাপুরী থেকে কি কুক্ষণেই যে আমি মাকে ছেড়ে পালিয়ে এলাম!

রজনী জলের ঘটি এগিয়ে দিল, তুমি তাহলে খেস্টান হওয়ার আগে হিন্দু ছিলে?

—ওসব কথা থাক রজনী। তুমি খেয়ে নাও মা। আগে শরীরটাকে সুস্থ কর। ওসব কথা বলার অনেক সময় আছে।

বুকের ভেতরটা আবার উথলে উঠল গৌরীর। আমি কি যে ছিলাম আর কি যে হয়েছি কিছুই বুঝতে পারি না বাবা। সব কেমন অগোছাল হয়ে গেছে আমার।

—গোছানো তো কারো থাকে না মা। ভগবানের নিয়ম, থাকতে নেই! তুমি খেয়ে নাও।

গৌরী আকণ্ঠ ভরে জল খেল। তারপর ধীরে ধীরে আবার চোখ বুজল। মানুষের রহস্য কতটুকু বোঝার ক্ষমতা রাখে ও। মানুষ খুন করে; যে হাতে খুন করে সেই হাতই আবার এগিয়ে এসে মরা-মানুষকে বাঁচাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে। গৌরীর ক্ষমতা কি অত বোঝে!

চৌত্রিশ

সোনার কলসী উপুড় করে ঢেলে দেওয়া রোদ উঠল একটু বেলায়। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ কুয়াশার দাপট কিছুটা কম। পাতলা কুয়াশা আর সোনাগলা রোদে মাখামাখি হয়ে অপূর্ব আকার ধারণ করল চারপাশ।

কাক ভোরেই অনেকের ওঠার অভ্যেস, আবার অনেকে বেশ বেলা অবধি ঘুমোয়। আজও ঘুমিয়ে থাকবে সাধ্যি কি! রজনী একটা লাঠি বাগিয়ে সবাইকে খুঁচিয়ে তুলল, ওঠ, ওঠ বলছি। নবাবগিরি পরে করিস, এখন উঠে তৈরি হয়ে নে।

—উহ, বড্ড জ্বালায় গো!

—জ্বালায় মানে, কাউকে কিছু বলি না বলে সব পেয়ে বসেছিস। আজ থেকে আমি সব বেটার কাজের হিসেব নেব। ওঠ্ আগে।

—কি ব্যাপার বল তো? উঠে বসল জগন্নাথ।

—কিচ্ছু ব্যাপার না। উঠে তৈরি হয়ে ফিরিঙ্গি দেউলের কাছে চলে যা।

—কেন? কি হবে?

—ফিরিঙ্গি দেউলের চারপাশ পরিষ্কার ঝকঝকে করে ফেলতে হবে। ওখানেই পুজো হবে বনদেবীর। দয়ালবাবুর ইচ্ছে ওখানেই হোক।

—জঙ্গলের মধ্যে কেন? এদিকেও তো করলে হয়?

—তোর কথামতো তো কাজ হবে না জগন্নাথ। যা বলছি শোন্, ঝটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়্।

রজনী এক এক করে প্রায় সবাইকে টেনে তুলল। শুকদেবের ঘরে ঢুকে দেখল শুকদেব শুয়ে শুয়েই দাঁত বার করে হাসছে।

—হাসছিস! রজনী কেমন ঘাবড়ে গেল।

—হাসব না তো কি। বনবিবির পুজো হবে, পুজোর জন্য কোত্থেকে এক মড়া পুরুত ধরে এনেছ, তাই হাসছি।

—মড়া পুরুত! কেন কি করেছে?

—বেটা বলে কিনা বার জাতের জায়গায় নাকি ওকে ধরে আনা হয়েছে। স্বপাকে খাবে।

—খাক না, তোর কি?

—যেমন পুজো তার তেমন পুরুত না হলে চলে না রজনী ভাই। ও বেটাকে তাড়াও দেখি।

রজনী ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল, তোর জিভ ছিঁড়ে নেবেন ছোটকর্তা। জানিস ওকে কে পাঠিয়েছে ? তা ছাড়া জীবনভর পুজো করে এল কপিল ওঝা, তুই ওকে পুজো শেখাবি ?

—আমি শেখাব কেন ? হি হি—

—তাহলে ওঠ্। উঠে ফিরিঙ্গি দেউলের কাছে চলে যা।

—তা না হয় গেলাম। কিন্তু বনদেবীর পুজো হবে, মূর্তি কই ? মূর্তি এনেছ ?

রজনী বলল, মূর্তি ছাড়াই পুজো হবে।

—আর মুরগী ? মুরগী ছাড়বে না পুজোয় ?

বনদেবীর পুজোয় মুরগী চাই-ই। রজনী বলল, ওসব কপিল ওঝা যা বলবে তাই হবে। তুই ওঠ্।

—শিরনি খাওয়াবে না ?

রজনী এবার লাঠি তুলে ধরে, তুই উঠবি কিনা বল্ ?

শুকদেব হাই কেটে উঠে বসে।

রজনী বলল, কলকাতা থেকে পুরুত আনানো হয়েছে। পুজো কিভাবে করতে হবে না হবে সে-ই বুঝবে। ও ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

—বেশ, ঘামাব না। তবে বেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভীষণ হাসি পায়। ওর চেহারা মনে পড়লেই হাসির গ্যাস ওঠে।

—বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস শুকু ? তোর মতো তো সবাই রাজপুত্তুর নয়।

আবার হি হি করে হেসে উঠল শুকদেব। হাসতে হাসতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

—কি হল ?

শুকদেব বলল, উঠছি রে বাবা, উঠছি। তবে বলে রাখি, বনবিবির নামে মুরগী ছাড়া না হলে কিন্তু আমি নেই।

—থাকবি থাক, না থাকবি, যা।

রজনী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কাছারিঘরের দরজাটা ভেজানো, দয়াল ঘোষ মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে নদীর ধারেই ওদের দেখা গিয়েছিল। হয়তো এখনো ওরা নদীর ধারেই লক্ষ্মণকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রজনী একবার ভেড়ির দিকে তাকাল, কাউকে চোখে পড়ল না। ওদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে। সবুজ গাছপালা শিশিরে যেন স্নান করে উঠেছে।

স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন সকাল। কে বলবে গতকাল অমন হুজ্জুত গেছে এখানে। লক্ষ্মণটাকে জলে ডুবিয়ে মারা হল, কি আসে যায় তাতে সুন্দরবনের। যেন কিছুই ঘটেনি, কিংবা যা ঘটেছে তা এতই নগণ্য যে ওর জন্য বিন্দুমাত্র দাগ পড়ে না। বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত লাগল রজনীর। ক্ষণিকের মধ্যেই আবার নিজেকে ও তৈরি করে নিল। দেখল, গুদামঘর থেকে দড়ি-দড়া দা-কুড়াল নিয়ে অনেকেই বেরিয়ে এসে রোদে পিঠ দিয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

রজনী এগিয়ে এল, যা বাপু আর দাঁড়িয়ে থাকিস না—ঝটপট গিয়ে বড় বড় গাছগুলোকে আগে নামিয়ে ফেল্। চারপাশে হাত পঞ্চাশেক পরিষ্কার করলেই চলবে। তোরা যা, আমি আসছি।

এমন সময় কপিল ওঝার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হতেই অবাক হয়ে তাকাল রজনী। বেঁটে চৈতন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। হয়তো আরো কেউ কেউ ভেতরে রয়েছে, বোঝা গেল না।

—এই চৈতন্য! ডাকল রজনী। কি করছিলি ওখানে?

চৈতন্য এগিয়ে এল। কিছু না, কপিলবাবার গল্প শুনছিলাম।

—গল্প শুনছিলি? কৌতুকে তাকাল রজনী। কি গল্প?

—যাও না, গেলেই শুনতে পাবে।

আর কে আছে ওখানে?

—ঈশান আছে, নিশি আছে।

রজনী কৌতূহল দমাতে পারল না। পায় পায় এগিয়ে এল ঘরের দিকে। দরজাটা পুরোপুরি মেলে ধরে ঘরের ভিতরে তাকাল।

বুড়ো কপিল ওঝা পুরু খড়ের গদিতে কম্বল বিছিয়ে এখনো আরাম করে শুয়ে আলস্য কাটাচ্ছে। কোমরের দিকে বসে গা টিপছে ঈশান। নিশি বুড়োর মাথায় গভীর মনোনিবেশে কি যেন খুঁটছে।

—কে?

উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা কপিল ওঝা নিমেষেই দেহটা বাঁক ফিরিয়ে দরজার দিকে চোখ পাতল।

—আজ্ঞে আমি। রজনী ঘরে ঢুকল।

—কি চাই?

ঘরের একপাশে হাঁটু ভাঁজ করে বসল রজনী, আজ্ঞে কিছু না। জানতে এলাম আপনার কোনো কষ্ট হয়নি তো রাতে?

কপিল হাসল, দয়ালবাবু ওঠেনি?

—উঠে নদীর ধারে গেছে।

—আর সেই খেস্টান মাগীটা ?

রজনী ঈশানের দিকে তাকায়।

—আজ্ঞে, দয়ালবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে।

—মাগীটাকে ভালই যোগাড় করেছ তোমরা ? কোথেকে আনলে হে ?

রজনী স্তব্ধ হয়ে থাকে, কপিল ওঝা যে অমন ঠোঁট কাটা কথা বলবে ভাবতে পারে না রজনী। মনে মনে মজাই পায়।

নিশি বলল, আজ্ঞে আমি একটা কথা বলব ?

—বল।

—মেয়েটা ডাইনী না ভগবতী সেটাই কেউ বুঝতে পারছি না। ও ডাইনীও হতে পারে ভগবতীও হতে পারে।

—কি রকম ?

—দয়ালবাবু বলেন, মেয়েটা নাকি সাক্ষাৎ দেবী ভগবতী। আমরা চিনতে পারছি না। আমরা নাকি অন্ধ।

—বটে, বলে বুঝি !

—আর এই রজনীভাই বলে, ও নাকি সাক্ষাৎ অপদেবী। মানুষের রূপ ধরে রয়েছে।

—কেন ? অপদেবী কেন ?

রজনী উৎসাহ পেল, বলল, আজ্ঞে ও এখানে এসেই আমাদের হাজার রকম বিপদ বাড়িয়ে দিয়েছে। সেবার এসেছিল নৌকোয় একা একা ভাসতে ভাসতে, এসে আমাদের সবাইকে এখান থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছিল। সে কি ভীষণ অবস্থা গেছে আমাদের। বল না নিশি, তোরাও তো দেখেছিস। আপনাকে ঠিক বলে বোঝাতে পারব না কপিল ঠাকুর, আমাদের এমনিতেই বিপদের শেষ নেই, তার উপর আবার—

ঈশান কোনো প্রতিবাদ করে না, সমর্থনও না। অনেকক্ষণ ও অনড় হয়ে বসেছিল। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার কপিল ঠাকুরের কোমর টেপায় মনোযোগ দিল।

—উহ্ হু হু—, মারিস না বুড়োকে।

ঈশান লজ্জা পায়। ধীরে ধীরে হাত বুলোতে শুরু করে আবার।

—দেবী কি অপদেবী পরীক্ষা করে নিলেই হয়।

রজনীর চোখদুটো উৎসাহে যেন বেরিয়ে এল, কি ভাবে ?

—মেয়েটা রোদে দাঁড়ালে ছায়া পড়ে কি না লক্ষ্য করেছিল?

রজনী নিশির দিকে তাকায়, এই সহজ পরীক্ষাটা তো করা হয়নি! মেয়েটার ছায়া পড়ে কিনা মিলিয়ে তো দেখা হয়নি।

—ছায়া যদি না পড়ে তাহলে আর বলতে হবে না, কি ও। তা ছাড়া আরো পরীক্ষা আছে, জ্বলন্ত কাঠকয়লার আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে বল না একদিন, পায়ের নিচে যদি ফোস্কা না পড়ে বুঝবি কি ও। তা ছাড়া আরো আছে, মেয়েটাকে বাজিয়ে নিতে কতক্ষণ।

রজনী ঝুঁকে এল, আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে বললেই হাঁটবে কেন?

—আপনি আরো সোজা কিছু বলুন কপিল ঠাকুর, আমরা আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

কপিল উঠে বসে, ভূত-প্রেত নিয়ে কারবার করতে করতেই চুল পেকে গেল, আর ওসব ভাল লাগে না, শরীরেও সয় না।

—আপনি যা করতে বলবেন, আমরা তাই করব। বলুন ঠাকুর। আপনার পায়ে পড়ি, বলুন।

—ঠিক আছে, মেয়েটাকে আজ ভাল করে একবার দেখে নিই। যদি খারাপ কিছু লক্ষণ পাই, চোখে চোখ পাতলেই তা ধরা পড়বে। আগে দেখে নিই, পরে যা হোক একটা ব্যবস্থা ঠিক করা যাবে। যা এখন।

কপিল ঠাকুরের পায়ের ধুলো মাথায় ছোঁয়াল রজনী, তারপর উঠে দাঁড়াল। আপনার মুখ চেয়ে থাকব ঠাকুর, আমাদের বাঁচান। দয়ালবাবু কী দেখে যে মেয়েটিকে অত প্রশ্রয় দিচ্ছে কে জানে!

উঠে দাঁড়ায় ঈশানও। নিশিও।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রজনী। বাইরে ফুটফুটে রোদ। দেখল, কাঠুরেদের অনেকেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ওপাশে মকবুল আর রসিকলাল। ওরা জঙ্গলের মাচায় রাত কাটাতে গিয়েছিল, সবে ফিরেছে। সারারাত ঠাণ্ডা খেয়েছে। চোখগুলো লাল।

—কি হল? কি হয়েছে? প্রশ্ন করতে করতে এগিয়ে আসে রজনী।

মকবুল বলল, পিঠের হাড় টনটন করছে গো। সারা রাত বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছি।

—বড়ে মিঞা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান। রসিক দাঁত বার করে হাসে। ও শালা টের পেয়ে গেছে আমরা ওকে মারবার জন্য গাছে বসে রাত কাটাই।

—কিছুই চোখে পড়ল না?

মকবুল হাসে; কিচ্ছু না। একটা ইঁদুরও না। আসলে নিচে একটা টোপ না রাখলে গাছে বসে ফালতু ফালতু কষ্ট পাওয়া।

রজনী বলল, টোপ রাখলেই তো হয়। বললাম ল্যাংড়া হরিণটাকে এক ফাঁকে বেঁধে রেখে আয়। তা শুনবি না।

মকবুল কিছুটা বিরক্ত হয়, তুমি যত ফালতু ঝামেলা বাধাতে চাও রজনীভাই। ওর গায়ে হাত লাগালে আবার মারদাঙ্গা বাধবে।

—বাধাচ্ছি! দেখ না, এতদিন যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেছি এবার।

মকবুল আর রসিক কেমন কৌতুকে তাকায়, কী পেয়েছ? কী?

—সময় হলেই দেখতে পাবি। যা এখন, বিশ্রাম কর। একটু ঘুমিয়ে নে গে যা।

রজনী সরে যাচ্ছিল, মকবুল আর রসিক পিছু ধরল, কী বল না গো? কী পেয়েছ?

রজনী এক মুহূর্ত কি ভাবল, তারপর বলল, কাউকে যদি না বলিস তো বলতে পারি।

—আম বলব! আমি কখনো বলি কিছু?

—বেশ, তবে শোন। আমি যা বলতাম তাই হয়েছে। কপিল ঠাকুরও গৌরীকে সন্দেহের চোখে দেখছে। কপিল ঠাকুর তুকতাক করে পরীক্ষা করে নেবে মেয়েটা আসলে কি!

মকবুল কেমন থ হয়ে গেল।

—মেয়েটার ছায়া পড়ে কিনা আমাদের লক্ষ্য রাখতে বলেছে।

—সেটা কী আবার?

—ছায়া বুঝিস না? এই যে তুই রোদে দাঁড়িয়ে আছিস, তোর ছায়া পড়েনি?

মকবুল নিজের ছায়ার দিকে তাকায়। রোদে দাঁড়ালে ছায়া তো পড়বেই।

—না, সব ক্ষেত্রে পড়ে না।

মকবুল বলল, পাগলের রাজ্যে আর এক পাগল জুটেছে তাহলে!

—পাগল বলছিস?

—এ ছাড়া আর কি বলব বল! দয়ালবাবু জানেন?

রজনী বলল, জানবে এবার। যা বিশ্রাম কর গে। আমি ফিরিঙ্গি দেউলে যাচ্ছি।

—কেন? ওখানে কেন?

—দয়ালবাবু বলেছেন, ওখানেই পুজোর ভাল জায়গা। সবাইকে তাই ওখানেই কাজে পাঠিয়েছি। আজকের মধ্যে যদি পরিষ্কার করে ফেলা যায়, কালই পুজো। বেলাবেলি পুজোটা সেরেই আমরা চলে আসব।

মকবুল এমন সময় চোখের ইশারা করে রজনীকে। ওদিকে দেখ।

রজনী ঘুরে তাকায়, কী ?

—ঈশান।

রজনী দেখল, একা ঈশান। কপিল ওঝার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। কেমন থমথমে মুখ। ইচ্ছে করেই যেন রজনীদের দিকে তাকায় না ঈশান। কাঠুরে ডেরার পেছন দিকে হনহন করে চলে যায়।

রজনী বলল, খুব ছেঁচা খেয়েছে হারামজাদা। কপিল ওঝা ওকে খুব করে শুনিয়ে দিয়েছে।

কেন, কেন ? প্রশ্ন করে মকবুল।

কেন কি, দেবে না ? ও মেয়েকে যে দেখবে সেই ও কথা বলবে।

—কী বলছে কপিল ওঝা ?

—কী আবার বলবে। সন্দেহ করছে।

—কী সন্দেহ ?

—এই দেখ, সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ। যা বিশ্রাম কর গে যা। রজনী সরে এল। তারপর গুদাম ঘরের দিকে কয়েকজনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, এই, তোরা কী করছিস ওখানে ? যাবি না ?

মকবুল আর রসিক হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নতুন কোনো একটা গোলমালের আভাস যেন ভেসে উঠছে ওদের চোখের ওপর।

পঁয়ত্রিশ

নদীতে এখন ভাঁটা। বুড়োবাসুকি এখন পেটে পিঠে সমান। চন্দনঘোলা জল সবেগে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে। ভেড়ি থেকে ঢালে মোলায়েম কাদার দিকে তাকালে চোখ জুড়োয়। বড় পরিচিত দৃশ্য এই নদী আর জঙ্গল। এর আগে যখন দয়ালবাবু এখানে থাকতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই নদীর পারে এসে কাটিয়ে দিতেন। আজও উনি নদীর আকর্ষণেই ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে উঠে এসেছেন এখানে। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন গৌরীকে। মেয়েটাকে পাশে পেয়ে বড়

রোমাঞ্চ অনুভব করছিলেন উনি। মাত্র মাস দুয়েক আগের ঘটনা, এই গৌরীকে সেদিন ভাসমান নৌকোর ভিতর দেখে ওঁর চোখের আবরণ খুলে গিয়েছিল। এই গৌরীই দয়ালবাবুর জীবনে মস্ত বড় একটা ঘটনা।

বহুক্ষণ ওরা ভেড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছে। গতকাল হারিয়ে যাওয়া লক্ষ্মণকে ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে নদীর জলে। না, বিন্দুমাত্র চিহ্ন রেখে যায়নি লক্ষ্মণ। অবশেষে অবসন্ন দেহে ওরা ভেড়িরই একটা নিরাপদ জায়গা বেছে বসে পড়েছিল।

গৌরীর চোখে আকুতির শেষ নেই। কেন, এমন হল কেন? বারবার একটাই প্রশ্ন গৌরীর, এমন হল কেন? লক্ষ্মণ কি তবে নদী সাঁতরে ওপারেই চলে গেল! ওপারেও তো গভীর বন। ওই বনের মধ্যে একা একা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে লক্ষ্মণ। নাকি নদীই ওকে অকূলে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এমন হল কেন?

দয়াল ঘোষও সান্ত্বনা দিতে কসুর করেন না। বললেন, মানুষ মায়ার জীব। মায়ায় জড়িয়ে থাকি বলেই আমাদের এত কষ্ট। কিন্তু মা, মায়ার আবরণ যদি একবার সরিয়ে ফেলা যায়, দেখবে সব ফাঁকি! জগৎ সংসারে কেবল ইট কাঠ পাথর মাটি ছাড়া আর কিছুই নেই।

কেমন দুর্বোধ্য লাগে কথাগুলো। তবু নির্ভর করার মতো একটা মানুষকেই যেন এ মুহূর্তে হাতের কাছে পেয়েছে গৌরী। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলে, তাহলে কী বাবা লক্ষ্মণকে আর পাওয়া যাবে না কখনো? ও কী সত্যি সত্যি সবাইকে ছেড়ে চিরকালের মতো হারিয়ে গেল?

দয়াল ঘোষ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, চিরকাল তো কেউ সঙ্গে থাকার জন্য আসে না। আসে কী? যার যখন কাজ ফুরোয় সে-ই তো জাল ছিঁড়ে চিরকালের মতো হারিয়ে যায়।

—কোথায় যায়?

দয়াল ঘোষ নদীর দিকে চোখ পাতলেন, অনন্ত সমুদ্রে একটা নৌকো ভেসে চলেছে জল কেটে। কে তাতে উঠছে, কে তা থেকে আবার নেমে যাচ্ছে, আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য কি মা তার হিসেব দেব। যেই উঠুক যেই নামুক তার জন্য দুঃখ করতে নেই।

গৌরী স্তব্ধ হয়ে থাকে। সামনে অনন্ত নদী। নির্বিকার তার জলস্রোত। এখনো কি এই জলস্রোতে সেই নৌকোটি ভেসে চলেছে! তন্ত্রমন্ত্র সাধনভজন জানা না থাকলে কি তাকে দেখা যায় না! তার দাঁড় টানার শব্দও কি কানে আসে না।

—মা!

গৌরী চমকে উঠল। বড় বিশুদ্ধ এই মা ডাক। দয়াল ঘোষের দিকে তাকাল গৌরী।

—আমিও বড় অসহায় মা।

গৌরী দেখল, প্রবীণ দয়াল ঘোষের চোখদুটো করুণা-কাতর। কি এক অতৃপ্ত আকৃতি ছড়িয়ে পড়েছে ওই চোখে। কি যেন দয়াল ঘোষও খুঁজে বেড়াচ্ছেন ওই চোখের দৃষ্টি দিয়ে। গৌরী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

—বড় অসহায় মা। মাস দুয়েক ধরে কেবল তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কখনো কখনো চকিতে দেখা দিয়েই আবার সে হারিয়ে যায়। তাঁকে পেয়ে পেয়েও কাছে পাওয়া হয় না আমার।

—কে বাবা? কাকে? কাকে খুঁজছেন?

দয়াল ঘোষ সস্নেহে হাত রাখলেন গৌরীর মাথায়, সে এক জ্যোতির্ময় দীপ্তি যার কেন্দ্রে রয়েছে এই জগৎ। অথচ আমরা বুঝি না, বুঝতে পারি না। মায়ার ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে কেউ বেরুতে পারি না।

গৌরীর সারা গায়ে কি রকম কাঁটা দিয়ে উঠল। আর্তস্বরে বলল, আমার ভয় করছে বাবা। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

দয়াল ঘোষও যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। গৌরীর মাথার ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন। তারপর কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। দয়াল ঘোষ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, আমারও ভয় কাটে না মা। মনে হয়, বৃথাই এই জীবনটাকে বোঝার মতো কাঁধে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি। আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে কেবল ছটফট করছি।

এক ঝাঁক পাখি নদীর ঢালে ছায়া ফেলে উড়ে গেল। গৌরী কিছুটা আনমনা হয়ে গেল। পরক্ষণেই বুঝল, পিঠের ওপর মোলায়েম রোদের স্পর্শ লাগছে। যেন উত্তাপের আবরণ দিয়ে কেউ ওকে জড়িয়ে ধরছে। নদীর উপর দিয়ে পাখিগুলো উড়তে উড়তে ওপারে বনের দিকে চলে গেল।

—আমার কী হবে বাবা? আমি কী সত্যি সত্যি আর ফিরে যেতে পারব না মায়ের কাছে?

দয়াল ঘোষ আবার একবার গৌরীর দিকে তাকালেন, সবই তার ইচ্ছা মা। তিনি চাইলেই আবার আমরা ফিরে যেতে পারি।

গৌরী তাকিয়ে থাকে।

—আমরা সব সময় বড় অধৈর্য হই, অথচ ধৈর্য আর একাগ্রতা না থাকলে কি পাওয়া যায়!

—একাগ্রতা কী ?

দয়াল ঘোষ উৎসাহ পেলেন, মনটাকে একটা স্থির বিন্দুতে বাঁধতে পারাই একাগ্রতা। একটা পরীক্ষা করবে মা ?

গৌরী উত্তেজিতভাবে নড়ে বসল, কী পরীক্ষা ?

মনটাকে চালনা করবার ছোট্ট একটা পরীক্ষা। বেশ তো, পাদুটো গুটিয়ে আসন করে বোস।

গৌরী শাড়ির আঁচলে পা ঢেকে আসন কেটে বসল। দয়াল ঘোষ আবার গৌরীর মাথায় একটা হাত তুলে এনে ব্রহ্মতালুতে আলতো করে ছোঁয়ালেন।

সারা গা ঝাঁকি দিয়ে উঠল গৌরীর।

—চোখদুটি এবার বন্ধ কর মা। যতক্ষণ না বলি, খুলো না।

গৌরী উৎসাহে চোখ বন্ধ করল।

—চোখ বন্ধ রেখে এবার কয়েক মুহূর্ত নিজেকে কল্পনা করার চেষ্টা কর।

গৌরী নিজেকেই, নিজের হাত পা মাথা বুক পেট উপলব্ধি করার চেষ্টা করল। কিন্তু কেমন একটা তরল অন্ধকার ছাড়া কিছুই নেই। চারপাশে হিজিবিজি অসংখ্য আলোর অস্থির দাগ আর তরল অন্ধকার।

—নিজেকে পেয়েছ ?

গৌরীর চোখের সামনে বিভিন্ন সব জ্যামিতিক চিহ্ন ভিড় করে এসে দাঁড়াতে থাকে।

—কী ভাসছে এখন চোখের সামনে ?

—গৌরী অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, কৈ, কিছু না তো।

—কিছুই না ? ভাল করে দেখ, সত্যি সত্যি কী কিছু না ?

গৌরী চোখ বন্ধ রেখেই অনুভব করার চেষ্টা করে, কি দেখছে ও। নদী বয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই তো নদী বয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ছুটো পাখির ছায়া গড়িয়ে যাচ্ছে। ঘন ঝোপঝাড় জঙ্গল চোখের সামনে ভেসে উঠছে। গৌরী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, নদী বয়ে যাচ্ছে—

—আর কিছু দেখছ না ?

—জঙ্গল।

—আর ?

—পাখি উড়ছে।

—আর ?

—আবার ঝোপ ঝাড় জঙ্গল।

—আর ?

—নদী।

—আর ?

অন্ধকার আর জল।

দয়াল ঘোষ এবার মন্ত্র উচ্চারণ করার মতো বললেন, অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে।

ঋষির মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গৌরীও আবৃত্তি করল, অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে।

গৌরীর মনে হল, ওর সমস্ত অনুভূতি এখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ব্রহ্মতালু থেকে। দয়াল ঘোষই ওখানে আলতো করে হাত বিছিয়ে রেখে যেন সব কিছু চালনা করছেন। হাত পা নাড়ার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল গৌরী। দেহটা ক্রমশই যেন অবশ হয়ে আসছে।

অন্ধকারে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, অসংখ্য হিজিবিজি আলোর চিহ্ন। অস্থিরভাবে সেই অন্ধকারের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে চিহ্নগুলি।

গৌরী প্রলাপ বকার মতো বলল, গহীন অন্ধকার। আর সেই মহাশূন্যে নক্ষত্রমালার মধ্যে আমি একা।

—নিজেকে তুমি চিনতে পারছ মা ?

গৌরী নিজের পূর্ণ অবয়ব যেন দেখতে পাচ্ছিল। নিজেকে পুরোপুরি চিনতে পারছিল। ধীরে ধীরে বলল, মহাশূন্যে আমি একা।

—অন্ধকারের কোন গহ্বর থেকে এসেছ তুমি ? আবার সেই আদিম অন্ধকারে ফিরে যেতে ইচ্ছে জাগে না ?

গৌরী কথা বলল না, চোখের সামনে যুবতী নারীমূর্তিটা বয়স হারিয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে। গৌরী দেখল, কিশোরী গৌরীতে ফিরে এসেছে সেই যুবতী।

—অন্ধকারের কোন গহ্বর থেকে এসেছ মা ? ভেবে দেখ।

এ কি, এ যে সেই বিত্তাপুরী গ্রামের পদ্মপুকুর। মা, ওই তো ওর মা। পুকুরঘাটে একগাদা বাসন নিয়ে বসেছে ওর মা।

—আরো, আরো পিছিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় না তোমার ?

গৌরী কিশোরীত্ব হারিয়ে পিছিয়ে এল শৈশবে। শিশু গৌরী, মায়ের বুক আঁকড়ে ককিয়ে উঠল।

তারপর আছড়ে পড়ল মাতৃজঠরে। নিঃসীম অন্ধকার ঘিরে আশ্চর্য এক উষ্ণতার আমেজ।

দেখল মা ছাড়া আর কিছুই নেই। মায়ের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে হারিয়ে গেল গৌরী। কিন্তু এই কি ওর মা, মহিলাটিও ধাপে ধাপে অতীতের দিকে ফিরে চলেছে। যুবতী থেকে কিশোরী, কিশোরী থেকে শৈশবে···নাহ্ আর চিনতে পারছে না গৌরী, শৈশব থেকে—

হঠাৎ ওর অনুভূতির কেন্দ্রটি যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চমকে চিৎকার করে উঠল গৌরী।

দয়ালবাবু ওকে এক হাতে ধরে আবার বসিয়ে দিলেন।

—ওরা আসছে. তাই আমি হাতটাকে তোমার মাথার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম।

গৌরীর চোখ জড়ানো আতঙ্ক। ভয়ে ভয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাল গৌরী। দেখল, দুজন মানুষ টলতে টলতে ভেড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। একজন ঈশান, অন্যজনকে চিনতে পারল না ও। বৃদ্ধ লোকটার সারা গায়ে কম্বল জড়ানো।

দয়ালবাবু বললেন, কপিল ওঝা। বনদেবীর পুজো করবে বলে আমার সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছে।

ঈশান আর লোকটা ভেড়ির দিকে ওদের লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছিল। দয়াল ঘোষ বললেন, এতক্ষণ যা দেখেছ কাউকে যেন কিছু বলো না মা।

—কেন?

—তোমার দেখার এখনো শেষ হয়নি।

গৌরী কথা বলল না। দেহের সমস্ত অণু-পরমাণু এখনো যেন শিরশির করে কাঁপছে। কি দেখলাম এতক্ষণ! এ কী স্বপ্ন না আর কিছু?

কপিল ওঝা ভেড়ির উপর উঠে এসে ধূর্তচোখে গৌরীকে একবার দেখে নিল, কী ব্যাপার মশাই, আমাকে একা রেখে আপনারা বুঝি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন?

দয়াল ঘোষ মৃদু হাসলেন, তা নয়, তুমি ঘুমুচ্ছিলে দেখে আর ডাকাডাকি করিনি। তা ছাড়া নতুন জায়গায় তোমার রাতে ভাল ঘুম হয়েছে কিনা তাও জানি না।

—তা তো বটেই। ঘুম কি আর হয়! সারা রাত মশাই ভয়ে বাঁচি না, যা সব গপ্প শুনলাম এদের মুখে!

—কী গল্প?

কপিল বলল, রাতে নাকি বাড়ির উঠোনে বাঘ বসে থাকে। কাঠুরেদের নাকি কিছুদিন আগেও বাঘে খেয়েছে।

দয়াল ঘোষ বললেন, তোমাকে খাবে না। বাঘ লোক চেনে।

কপিল বুঝল, দয়াল ঘোষ কিছু একটা ইঙ্গিত করতে চাইছেন। কেমন খারাপ লাগে ওর।

—গায়ে যার ছিটেফোঁটা মাংস নেই, তার হাড় চিবোবার রুচি বাঘেরও হয় না। কথাটা বলেই হেসে উঠলেন দয়াল ঘোষ। কপিলকেও বিষণ্ণচোখে কেমন হাসির সমর্থন জানাতে হল।

—তা যাক, বাঘে খাক আর নাই খাক, কলকাতায় আমায় কবে ফিরিয়ে দেবেন বলুন তো? এখানে দিন কয়েক থাকতে হলে প্রাণবায়ু নিয়ে আর ফিরতে পারব না দয়ালবাবু।

—সে কী হে? এই তো সবে এলে। কোনো অসুবিধে হচ্ছে?

—অসুবিধা না হলেও এত অনাচার চোখে দেখা যায় না।

—কী অনাচার?

—অনাচার নয়! কি বলতে গিয়ে যেন থেমে গেল কপিল।

—কী হয়েছে বল না? কেউ অসম্মান করেছে?

—না না, তা নয়। কপিল ওঝা চোখের ইশারায় গৌরীর দিকে নজর টানল দয়াল ঘোষের।

—এর নাম গৌরী। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এর উপাসনা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

—মেয়েটা না খেস্টান?

—হিন্দু খ্রীস্টান মুসলমান সবই এক কপিল। সবারই জন্ম সেই একটাই উৎস থেকে।

—ওসব দয়ালবাবু কেতাবের কথা, আচার নিষ্ঠা আলাদা জিনিস।

দয়াল ঘোষ হাসলেন, থাক, ও প্রসঙ্গ থাক। তুমি তোমার পুজোর সব কিছু আয়োজন করে নাও, কালই পুজো হবে। কী রে ঈশান, তুই দূরে বসে কেন? এদিকে আয়।

ঈশান আড়ষ্ট হয়ে একটু তফাতে গিয়ে ভেড়ির ওপর বসেছিল। সারারাত ঘুম হয়নি ঈশানেরও। চোখমুখ শুকনো। সারা গায়ে খড়ি উঠে খসেখসে হয়ে আছে। ধীরে ধীরে উঠে এল। এক পলক গৌরীর দিকে তাকাল। গৌরী কি এখনো ঈশানের ওপর থেকে রাগ কমিয়ে ওকে ক্ষমা করতে পারেনি।

—আপনার সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত কথা ছিল দয়ালবাবু।

দয়াল ঘোষ কৌতুকে তাকালেন,'কী কথা?

—একটু এদিকে আসুন।

দয়াল ঘোষ উঠে দাঁড়ালেন, এখানেও বলতে পারতে। অসুবিধা ছিল না।

—না, একান্তই আমার আপনার কথা।

—বেশ। বল। দয়াল ঘোষ দু' পা সরে কপিল ওঝার কাছাকাছি চলে এলেন।

কপিল ওঝাও আর একটু তফাতে সরে এসে ধীরে ধীরে বলল, চারপাশের লক্ষণ কিন্তু আমার ভাল লাগছে না।

—কেন, কী হয়েছে?

—মেয়েটাকে নিয়ে কারো কারো মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ দানা বেঁধেছে।

—আমি জানি।

—আমাকে এসে ধরছে সবাই।

—কেন? তোমাকে কেন? তুমি কী করবে?

—আমাকে দিয়ে ওষুধ করাতে চায়।

দয়াল ঘোষ এক পলক তাকিয়ে থাকলেন। ঘটনাটা অনেক দূর গড়িয়েছে বুঝতে অসুবিধা হল না। বললেন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় কপিল। আমার কথা শোন, ওসব মারাত্মক জিনিস নিয়ে খেলা করতে না যাওয়াই ভাল।

কপিল গম্ভীর হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, মেয়েটা কিন্তু সুলক্ষণযুক্ত নয়।

—কী প্রমাণ পেয়েছ শুনি?

—প্রমাণ আপনি সবই জানেন।

—হ্যাঁ, আমি যা জানি তাতে গৌরী ভগবতীর অংশ। তোমাকে বার বার নিষেধ করছি কপিল, আগুনে হাত রাখতে যেও না। পুড়ে যাবে। আর তা ছাড়া তোমাকে এখানে আনা হয়েছে পুজো করাতে, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাতে। সেটুকু করেই তুমি বিদায় হতে পার।

—আমি তো তাই চাই দয়ালবাবু, আমি কেন গায়ে পড়ে এখানকার ব্যাপারে মাথা গলাতে যাব। যার যা সেই বুঝুক, আমি তো তাই চাই। কিন্তু—

—কোনো কিন্তুটিন্তু নেই। যাও, নিজের পুজোর জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরী হয়ে নাও। কাল সকালেই যাতে পুজোয় বসতে পার সে চেষ্টাই কর গে যাও।

দয়াল ঘোষ হনহন করে আবার গৌরীর কাছে ফিরে এলেন, এস মা, ওঠ, আমরা কিরিঙ্গি দেউলের কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি চল।

গৌরী অবসন্ন দেহে উঠে দাঁড়াল।

—কিরে ঈশান, যাবি নাকি? তুই অত মরে আছিস কেন?

ঈশানও উঠে দাঁড়ায়। অনেক কথাই যেন জমে আছে ওর বুকের মধ্যে—অথচ বলার উপায় নেই। আর সে সব কথা শুনবেই বা কে। দয়াল ঘোষ ডাকতেই ঈশান উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল, যাব দয়ালবাবু। আমিও সঙ্গে যাব।

কপিল ওঝা একবার কাছারিবাড়ির দিকে তাকাল। দুটি-একটি লোক রয়েছে ওখানে। আর সবাই জঙ্গল সাফাইয়ের কাজে বেরিয়েছে। এ অবস্থায় একমাত্র ঈশানই ছিল ওর সম্বল। রজনী ওর দেখাশোনার কাজে ঈশানকেই রেখে গিয়েছিল, সেই ঈশানও জঙ্গলে যাবে শুনে কপিল বলল, ঈশানকেও যদি নিয়ে যান, আমি কী একা থাকব?

—বেশ তো, তুমিও চল, পুজোর জায়গাটা দেখে আসবে।

কপিল উৎসাহ পায়, তাই চলুন। ঘুরেই আসি একবার।

ভেড়ি থেকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে এসে ওরা জঙ্গলে ঢুকল। স্যাঁতসেঁতে কাদা আর শূলো জড়ানো জঙ্গল। কিছুটা ঢোকার পরই কপিল বলল, ও দয়ালবাবু, এ যে সাক্ষাৎ শূলে চড়াবার ব্যবস্থা। সর্বনেশে জঙ্গল মশাই।

দয়ালবাবু বললেন, একটু হাঁটাহাঁটি করে বুঝে নাও, কত কষ্ট করে ওরা এখানে কাজ করে। জঙ্গল যা হোক এর মধ্যে আবার বাঘ সাপও আক্রমণ করে বসতে পারে।

—ওরে বাবা, বেঘোরেই বুঝি প্রাণটা দেবার জন্য এসেছিলাম গো। ও দয়ালবাবু, একটু ধীরে হাঁটুন না।

—কেন, বাঘের মুখ থেকে বাঁচবার ওষুধ জানা নেই! এত ওষুধ করার ক্ষমতা তোমার?

—এই দেখুন আপনাকে দেখছি কোনো কথাই বলা যাবে না আর। ওষুধের কথা বলেছি বলেই করতে যাচ্ছি নাকি! ও দয়ালবাবু, দোহাই আপনার ভুল বুঝবেন না। আমি যে ভাল বুঝে কেন আপনাকে বলতে গিয়েছিলাম, আমারই ঘাট হয়েছে। ঠিক আছে, আর কখনো তাহলে ঘরে আগুন লাগলেও কিছু বলতে আসব না।

নরম নোনা মাটিতে অসংখ্য সূচের মতো কাঁটা বিছানো, সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও ঝোপ এত ঘন যে বাঘ ঘাপটি মেরে বসে থাকলেও বোঝার উপায় নেই। লতানো ডাল দেখলেই মনে হয়, সাপ। গা ঝাঁকি দিয়ে ওঠে কপিল ওঝার। এই বয়সে কি এসব পোষায়! ও ঈশান, একটু কাছে কাছে থাক না বাবা।

ঈশান কপিল ওঝারই পাশাপাশি চলছিল, বলল, আপনি হাঁটুন না। আর খানিকটা এগোলেই ভাল জায়গা পাবেন।

গৌরীর শাড়িতেও কাঁটা আটকে যাচ্ছিল। হাঁটুর কাছাকাছি কাপড় তুলে বকের মতো পা ফেলে হাঁটতে হচ্ছিল ওকে। পাশে পাশে রয়েছেন দয়ালবাবু, এর চেয়ে বড় ভরসা আপাতত যেন কিছুই নেই।

গৌরী সুযোগ বুঝে বলল, আমাকে আপনি ছেড়ে যাবেন না বাবা। আমি আপনার সেবা করব, আমাকে আপনি—

—ওসব কথা এখন নয়। দয়াল ঘোষ দেখলেন, কপিল আর ঈশান বেশ একটু পিছনে পড়েছে। বললেন, একটা শুধু কথা বলি মা, জল কখনো পাত্র ছাড়া থাকতে পারে না। জল যদি হয় ঈশ্বর, পাত্রটা হবে তার আধার।

গৌরী বুঝতে পারল না। দয়াল ঘোষের অনেক কথাই গৌরী বুঝতে পারে না। জিজ্ঞাসুচোখে তাকিয়ে থাকে।

দয়াল ঘোষ বললেন, জল যদি হয় সেই মহাশক্তি, তাকে পাবার জন্যও একটা পাত্র দরকার। তুমি হবে সেই আধার।

—আমি বুঝতে পারছি না বাবা।

—তোমার মাঝেই সেই মহাশক্তিকে একদিন আমি প্রতিষ্ঠা করব। কিন্তু এখন আর ওসব কথা নয়। শুধু এটুকু জেনে রাখ, তোমাকে আমি মহাতীর্থ কাশীতে নিয়ে যাব।

—কাশী!

দয়াল ঘোষ বললেন, কাশীতে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি দীক্ষা দেব। দেখ, সাধনায় আমরা সফল হবই।

দূর থেকে কাঠ কাটার শব্দ ভেসে আসছিল। দয়াল ঘোষ বুঝলেন ফিরিঙ্গি দেউলের কাছাকাছিই আসা গেছে। বললেন, যা বললাম, কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে।

গৌরী ফিসফিস করে বলল, না বাবা, জীবন থাকতে আমি বলব না। কাউকে না।

পেছন থেকে কপিল ওঝার গলা পাওয়া গেল, আর্ত ডাক, ও দয়ালবাবু, কোথায় গেলেন আপনারা? বুড়োটাকে শেষ না করা পর্যন্ত বুঝি শান্তি নেই আপনার?

দয়াল ঘোষ দাঁড়ালেন, আসুন, ধীরে ধীরে আসুন। আর সামান্য একটু এগোলেই ফিরিঙ্গি দেউল, চলে আসুন। দাঁড়িয়ে দেখলেন, গাছপালার ফাঁক দিয়ে

পিচকারীর মতো রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। মধ্যদিনে বনভূমির যে এত রূপ কে বর্ণনা করতে পারে তার।

ছত্রিশ

ফিরিঙ্গি দেউলের ইটের স্তূপের চারপাশে জমজমাট আসর বসল। গতকাল এখানে সারা দিন সাফাই হয়েছে। বড় গাছে খুব একটা হাত না লাগিয়ে ঝোপ জঙ্গল যতদূর পারা গেছে পরিষ্কার করা হয়েছে। এক দিনে এর চেয়ে বেশি পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। স্তূপের চারপাশের কয়েকটা বড় গাছকে নামিয়ে ফেলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দেউল থেকে হাত পঁচিশ-ত্রিশেক দূরে ডাঁই করে জমিয়ে রাখা হয়েছিল জঙ্গল। সেই জঙ্গলে গতকাল বিকেলেই কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সকালের দিকে দেখা গেল স্তূপীকৃত ছাই। ছাই সরালে ভিতরে তার টকটকে আগুন। ফিরিঙ্গি দেউলে এসে সেই ছাই আর আগুন নিয়ে মেতে উঠল শুকদেব। নতুন করে ডালপাতা ছুঁড়ে দিয়ে আবার আগুন উসকে তুলল। শুকদেবের দেখাদেখি আরো কয়েকজন গিয়ে ওখানে বহ্নি উৎসবে মেতে উঠল। কিন্তু আগুন যত, ধোঁয়া তার দশগুণ। বেশিক্ষণ ধোঁয়ার মধ্যে ছুটোপাটি করা যায় না, চোখ নাক বন্ধ হয়ে আসে। শুকদেবের গ্রাহ্য নেই। ধোঁয়ার মধ্যেই ডুব দিয়ে আগুন খোঁচায়, হা হা করে চেঁচায়, লাফায়…জয় বনদেবী মাগো…জয় ব্যাঘ্রবাহিনী ভগবতী মা…

কপিল ওঝার পুজোয় বসতে বসতে মধ্যাহ্নপুর গড়িয়ে গেল। বেদির সামনে বসানো হয়েছে ঘট। ঘটের গায় চন্দন আর সিঁদুর দিয়ে একটা মূর্তি আঁকা। ঘটের ওপর শিষসমেত ডাব বসানো। কপিল ওঝা নৈবেদ্য হিসেবে বাসনে সাজিয়ে নিয়েছে আটা, কলা, গুড়। আটা দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কলকাতা থেকে ছোটকর্তাই তা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক হাঁড়ি মধু যোগাড় হয়েছিল, মধুর হাঁড়িটাকে একপাশে বিড়ের উপর বসিয়ে রাখা হয়েছে। আর এক পাশে রয়েছে চামর, ধূপদানি, প্রদীপ। পুজোর তদারকি করছিল রজনী। স্নানটান সেরে ধোয়া কাপড়ে খালি গায়ে কপিল ওঝার জোগালি হয়েছে ও। ধূপদানিতে ধূপ জেলে দিল, পঞ্চপ্রদীপে ঘি ঢেলে পলতেয় আগুন জ্বালাল। কপিল ওঝা নিজের কপালে রক্ততিলক এঁকে আসনে আয়েশ করে বসল।

কাঁসর ঘন্টা কিছুই নেই। নেই শঙ্খ। নেই ঢাক ঢোল করতাল। ঢোল একটা

ধাও বা ছিল, তার এখন এমন অবস্থা যে ওটার ওপর একটা পিঁড়ি পেতে দিলে ভাল একটা টুল হতে পারে।

বাজনা নেই ঠিক, কিন্তু কেরোসিন তেলের ফাঁকা দুটো টিন নিয়ে এসেছিল জগন্নাথ। সে দুটোকেই এখন প্রাণপণে পেটানো হচ্ছিল। ওতেই ঢাকের তাকুর তাকুর বোল তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। ওই বোলের সঙ্গে সঙ্গেই নাচ জুড়েছিল কয়েকজন।

গলগল করে জঙ্গল পোড়ার ধোঁয়া গ্রাস করে নিচ্ছিল চারপাশ। খানিকটা দূরে বড় একটা গাছের গুঁড়িতে আয়েশ করে বসে পড়েছিলেন দয়াল ঘোষ। পাশে গৌরী। দুজনেই নিঃশব্দ।

গৌরী অপলক তাকিয়ে ছিল কপিল ওঝার সামনে বসানো ঘটের দিকে। চোখদুটো শান্ত। প্রচণ্ড ঝড় বাদলের পর আকাশ যেমন শান্ত হয়, অনেকটা সেরকম। মাঝখানে কেবল একটা দিনের অবসর গেছে, এরই মাঝে আমূল পালটে গেছে গৌরী। কি হতে পারত, আর কি হল। গৌরী এখন যে কোনো অবস্থার জন্য যেন তৈরি। অদৃষ্টে যদি বিষ্ণাপুরী যাওয়া থাকে, একদিন তা হবেই। যদি না থাকে তাহলেও যেন ক্ষতি নেই। ভগবানের ইচ্ছা থাকলে মায়ের সঙ্গে একদিন না একদিন আবার দেখা হবেই। মিছিমিছি ছটফট করে লাভ নেই। মনটাকে শান্ত সংযত করে নিয়েছে গৌরী। আপাতত দয়াল ঘোষের সঙ্গে কাশী যাওয়াই স্থির করে ফেলেছে ও। দয়াল ঘোষের কথামতোই সমস্ত ব্যাপারটাকে ও গোপনে বুকের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে।

চারপাশে নাচ, চিৎকার আর ছুটোছুটি। কেউ কেউ আকণ্ঠ মদ খেয়েছে বলে মনে হল দয়াল ঘোষের। কি আসে যায় তাতে। মানুষের বাসনার কি শেষ আছে! যেভাবে পারে তা পূরণ করে, বিন্দুমাত্র এসব নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চান না দয়াল ঘোষ।

একবার গৌরীর দিকে তাকালেন। সাক্ষাৎ জগন্ময়ী মা। সাধনায় সিদ্ধি পেতে এমন আধার হাতের কাছে পাওয়া ভাগ্যের দরকার। গৌরী যে এত সহজেই ওঁর কথায় রাজি হয়ে যাবে এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারেন না দয়াল ঘোষ। বুকের ভিতর তৃপ্তিতে উথলে ওঠে ওঁর।

খানিকটা দূরে এক সময় ঠোঁটকাটা বেঁটে চৈতন্যকে দেখা গেল। চৈতন্য নিশিকে ডেকে নিয়ে জঙ্গলের ধারে চলে যাচ্ছে।

—এই, একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করেছিস ?

নিশি কেমন হকচকিয়ে গেল, কী ?

—দয়াল ঘোষ কেমন বাগিয়ে নিয়েছে মেয়েটাকে ?

নিশির বুকের ভেতর ঢিবঢিব করে উঠল, তুই কি বল তো। মানুষের মধ্যে কেবল ওসবই তুই খুঁজে বেড়াস।

হাসে চৈতন্য। চোখের সামনে একজন বসে বসে ওরকম মজা লুটবে আর তা বলতে গেলে বুঝি দোষ ?

—এসব কথা কারো কানে গেলে তোর পিঠের চামড়া তুলে নেবে।

চৈতন্য নির্বিকার। আমাদের চামড়ার দাম নেই। তবে দয়াল ঘোষ যে কি, তা তোকে আমি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতেই বলেছিলাম।

—কী বলেছিলি ?

—মনে নেই সেই যে আমাদের দুজনকে কালী দেখাতে চেয়েছিল।

নিশিকান্তর এসব দেবদেবী নিয়ে রসিকতা ভাল লাগে না। কি জানি বাবা, কখন আবার দোষ লেগে যাবে। এমনিতেই তো পাপের অন্ত নেই, তার উপর আবার—

চৈতন্য হাসল, আসলে শালা আমরাই কচু। সোনাগাজি থেকে লুৎফা আমাদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু—

—নিয়ে এলেই পারতিস। কেউ তোকে মানা করে নি।

—তুই তখন অত বেঁকে বসলি।

—আমি তোকে বাধা দিইনি। আমার নিজের ওসব দরকার নেই বলেছিলাম।

চৈতন্য খুঁতখুঁত করে হাসে। মৌজ করে লুৎফার ঘরে রাত কাটিয়েছিলি আমার সঙ্গে মনে নেই।

—তখন আর কোনো উপায় ছিল না। অত রাত্তে আমি একা বেরিয়ে পথ হারিয়ে ফেলতাম, তাই।

—বটে, এখন খুব ধম্মপুত্তুর সাজছিস।

নিশি বলল, বেশ তো, তোর যখন এত্ত সাধ, এবার গিয়ে ওকে নিয়ে আয়।

—সেটি হচ্ছে না বাবা। আনলে সবাই একসঙ্গে আনব।

এমন সময় কখন যে ওদের পিছনে চোরের মতো পা টিপে টিপে রসিকলাল এসে দাঁড়িয়েছিল ওরা টের পায়নি। রসিকের গলা পেতেই ওরা চমকে উঠল।

রসিক চৈতন্যের ঘাড়ে যেন বাঘের থাবা তুলে দিয়েছে, কী রে, কী আনবি ?

চৈতন্য পানসে চোখে হাসে, হাসতে হাসতে বলে, কিছু না।

—কেন বাবা চেপে যাচ্ছিস, আমাকে বল না, কাউকে বলব না।

চৈতন্য ততক্ষণে যেন আবার ভরসা ফিরে পেয়েছে, হাসতে হাসতে বলল, ডাঁসা মেয়ে বুঝিস ? তাই আনবার কথা বলছিলাম।

—সেটা আবার কী ?

—ওরে শালা মেয়ে, বুঝিস না ? তবে যা, আঙুল চোষ গে যা।

নিশিকান্ত হাওয়া বুঝে সরে পড়ল।

—কী বল না চৈতন্য ? কেন লুকোচ্ছিস বল না ?

—যাব্ বাবা ! বললাম তো মাগী আনব। ওই দেখ না, কেমন মানিকজোড়টি হয়ে বসে আছে। দয়ালবাবুর দিকে আঙুল তুলে দেখায় ও।

রসিক কেমন ঘাবড়ে গেল। আর যাই হোক, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোক দয়াল ঘোষ সম্পর্কে এ মন্তব্য করবে না। হেসে সহজ হওয়ার জন্য বলল, যাহ্, কী বলছিস ? চল, ওখানে দীননাথ গান জুড়েছে, শুনে আসি।

চৈতন্য বলল, তাই চল। সেই ভাল।

দীননাথ ছোট্ট একটা আসর বসিয়ে ফেলেছিল গানের। জগন্নাথ ওর গানের সঙ্গে তাল দিয়ে টিনে বোল তোলার চেষ্টা করছিল।

ভিড়ের একপাশে বসে পড়ল রসিক। দীননাথ কি গাইছিল বোঝা যাচ্ছিল না, জমছিলও না। হঠাৎ একটু থেমে গলা তুলে নতুন গান ধরল—

হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল

পার কর আমারে—

চৈতন্য দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, গানের মধ্যে হাইহাই করে উঠল, এই সেরেছে, এ গান বুঝি এখন গায়।

—কেন, গান গাওয়া নিয়ে কথা। তা যে গানই হোক না।

চৈতন্য বলল, যারা এক পা ঘাটে দিয়ে বসে আছে, তারাই এ গান গায়। তুমি দীননাথ অন্য গান গাও।

মকবুলও গান শোনার জন্য একপাশে জমিয়ে বসেছিল, বলল, বেশ তো কাছারিবাড়িতে একদিন যেটা গেয়েছিলে, সেই গানটাই গাও।

হ্যাঁ, একদিন গেয়েছিল দীননাথ। সঙ্গে সেদিন ঢ্যাপঢ্যাপ করে ঢোল বাজিয়েছিল জগন্নাথ, সব মনে পড়ে গেল ওর।

দীননাথ বলল, বেশ, গাইছি। খানিকক্ষণ গুনগুন করে আবার গান ধরল—

আহা কি দিয়ে পুজিব তোমায় !

কি দিয়ে পুজিব রাঙা চরণ তোমার

গগনেতে জ্বলিতেছে দীপ উপচার।

কে যেন মুখ দিয়ে একতারা বাজাল, টুং টুং, টুং টুং—

মকবুল বাহবা দিয়ে উঠল, বাহ্‌, বাহ্‌, প্রাণ ঢেলে গাও।

উৎসাহ পেয়ে দীননাথ আবার গেয়ে ওঠে—

তুলসী দিয়ে পুজিব যে
আছে কি উপায়
কাঠি পোকায় দিবারাত্রি
কুরে কুরে খায়।

তাল ঠুকে ঠুকে জগন্নাথ লাফিয়ে ওঠে, আহা কুরে কুরে খায়।

দাউদাউ করে আবার আগুন জ্বলে উঠেছে, ওদিকে। ধোঁয়া কিছুটা কম। লকলকে আগুনের তাণ্ডব দেখে শুকদেবের উত্তেজনা যেন চরমে উঠছে। আগুনে লাঠি খুঁচিয়ে ফুলঝুরি ওড়াতে শুরু করল, হা হা···জয় বনদেবী, জয় ব্যাঘ্রবাহিনী ভগবতী মা···

—এই শুকদেব, কী করছিস? এদিকে আয়। নিশিকান্ত এগিয়ে গিয়েছিল শুকদেবের কাছে। শুকদেব গ্রাহ্যই করল না।

—এই শুকদেব! এই পাগলা!

শুকদেব একবার ঘাড় ফিরে তাকাল, জয় বনদেবী মাগো জয় ব্যাঘ্রবাহিনী ভগবতী মা।

—আগুনে শেষ পর্যন্ত পুড়ে মরবি রে, এদিকে আয়।

শুকদেব হাসে, আমি একা মরব না, সবাইকে নিয়ে মরব।

নিশি বলল, মরার আগে একটু যদি গাঁজা খেতে চায তো আয়।

গাঁজা। শুকদেব সম্বিৎ ফিরে পেল। কোথায় গাঁজা?

—আয় না। এদিকে এলে তো পাবি। শুকদেবকে একটা ঝোপের আড়ালে টেনে নিয়ে এল নিশি। জমজমাট গাঁজার আড্ডা বসেছে ওখানে। মদ খেয়ে কে একজন চুর হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আহা স্বর্গরাজ্য যেন।

শুকদেব গাঁজার বন্ধুদের সঙ্গে মিশে যেতে যেতে গান ধরল—

বনের মধ্যে বনবিবির
কত রে ভাই খেলা—

ওদিকে আর একপাশে কয়েকজন আবার লাঠি খেলা ছোরা খেলায় মেতেছে।

ছোরা খেলায় ছোরা নেই, হাতের মুঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই দু'জন কাঠুরে কটাকট ব্যাকরণ মেনে ছোরা চালাচ্ছে, শির, দামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার···হা হা···

কিন্তু লাঠি খেলায় লাঠির অভাব নেই। এক হাতে বাঁই বাঁই করে লাঠি-

ঘোরাতে শুরু করেছে একজন। লাঠিটা এমন জোরে ঘুরতে শুরু করল যেন বিরাট একটা কদম ফুল ফুটে উঠছে।

ওদিকে কপিল ওঝা একবার কুতকুতে চোখে পিছন ফিরে তাকিয়ে নিল, কই হে জয়ধ্বনি দাও—সব যে ঝিমিয়ে পড়লে।

রজনীরা চেঁচিয়ে উঠল, জয় মা বনদেবী মাগো!

আকাশ চিরে চিৎকার উঠল, জয়।

—জয় মা বনমাতা গো!

—জয়।

—জয় জয় বনদেবী দুর্গা গো!

—জয়।

টগবগ করে সমস্ত বনভূমি উথলে উঠল সেই চিৎকারে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। শীতের সূর্য এমনিতেই নিস্তেজ। জঙ্গলের ভিতরে আরো স্যাতসেঁতে অবস্থা। তবু রক্ষে, আগুনের তাপে জায়গাটা বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। কাঠুরদের উত্তেজনায়ও ভাঁটা নেই। পুজো তো আর রোজ রোজ হবে না, আজকের একটা দিনের ব্যাপার, যতটা লাগাম ছাড়া যায় ততই যেন বাহাদুরী। প্রসাদ তৈরি করতে বসেছিল রজনী। সিন্নী মাখছিল গামলায় দুহাত ডুবিয়ে। গাছের পাতায় কাঠি গেঁথে গেঁথে ঠোঙা বানানো হচ্ছিল। সবাই কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত। একমাত্র সারাদিনের জন্য একবারও ঈশানকে ধারেকাছে দেখা যায়নি। ঈশান এল কি এল না তার জন্য কারো মাথা ঘামাবারও সময় ছিল না। ঈশান নাবালক নয়, নিজের ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা ওর আছে। তাই হয়তো ওর কথা কারো মনেই পড়েনি।

ফিরিঙ্গি দেউল থেকে আরো শ'দুয়েক হাত জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেলে তখন পাওয়া যেত ঈশানকে। দেউল থেকে চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ মাঝে মাঝে কানে পৌঁছচ্ছিল ঈশানের। চমকে চমকে উঠছিল ঈশান। ওর সামনে তখন তিনকুমারীর জল কানায় কানায় পূর্ণ। বুড়োবাসুকির শাখা নদী এই তিন তিনকুমারী, সরু একটা খালের মতো ঢুকে পড়েছে জঙ্গলের ভিতর। নদীর ওপারের জঙ্গল আরো ভয়াবহ।

ঈশানের তখন এই নদীর ধার ছেড়ে উঠে আসারও উপায় ছিল না। আহত হরিণের বাচ্চাটাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে এসেছিল ঈশান। গত দু'দিন ধরে

বাচ্চাটা কুটোটিও দাঁতে কাটেনি। পায়ের জখমটাকে কিছুতেই বাগে আনা গেল না। সারা গায়ে সেই যন্ত্রণাই গড়িয়ে যাচ্ছে এখন।

হরিণের চোখের দিকে আর তাকানো যায় না। ঈশানের বুঝতে অসুবিধা হয় না, মৃত্যুর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে ও। আহা রে, বুকের ভেতর যন্ত্রণায় টনটন করে ওঠে ঈশানের। কি অন্যায় করেছিল বেচারি যে ওকে অমন করে গুলির ঘায়ে ঘায়েল করে নিয়ে আসতে হল!

হরিণের গায়ে মাছি বসছিল। ঈশান একটা গাছের ডাল দিয়ে মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছিল মাঝে মাঝে।

—এই সোনা, খুব কষ্ট হচ্ছে? এই, কথা বল না?

হরিণের সজল চোখে অভিমান ছাড়া যেন কিছুই নেই। যদি কথা বলতে পারত:ও, ঈশান যেন স্বস্তি পেত। জন্তুটার গায়ে আবার হাত বুলিয়ে দিল ঈশান, আহা রে, এমন জানলে কে তোকে অত কষ্ট করে দল থেকে ছিনিয়ে আনত বল! এর চেয়ে বেচারি যদি এখনই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে ঈশান। চোখের সামনে এমন কষ্ট আর দেখা যায় না। হে ভগবান, হরিণটাকে ধরে এনে আমি যে পাপ করেছি তার কি ক্ষমা নেই গো। বেচারির অভিশাপেই কি আজ আমারও এই অবস্থা হল। ওকে কষ্ট দেওয়ার জন্যই কি গৌরীকে হারাতে হল। কেন, কেন গৌরী অমন ভুল বুঝল! কেন গৌরী বুঝল না, ঈশান সারাক্ষণ গৌরীরই মঙ্গল চায়!

হরিণের ঠোঁটে আলতো করে এক আঁজলা জল তুলে দিল ঈশান। নরম কাদামাটির ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল ওকে। মাঝে মাঝে গলার কাছটা নড়ে নড়ে উঠছিল। জল খাবি, খা। কিন্তু না, দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেল জল। নোনা জল বলেই কি মুখে নিতে চাইল না হরিণটা! বুঝতে পারল না ঈশান.

—এই সোনা! আর তোকে কষ্ট দেব না রে। তুই যদি ভাল হয়ে উঠিস, তোকে এবার এই বনের ভিতরই ছেড়ে দেব। আর তোকে বেঁধে রাখব না। আসলে কি জানিস, ইচ্ছে করে তোকে আমি কষ্ট দিতে চাইনি কখনো। কি যেন সব হয়ে গেল! ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত অন্তত আমাকে তুই বুঝতে পারবি। বন্ধুর মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। আমার আর কে আছে বল, কেউ নেই। আমার মতো একা এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

আবেগে আর অভিমানে ঈশানের চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে আসে। কান্না চাপতে ঠোঁট কামড়ে ধরে ও। তারপরই আবার নিজেকে সামলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকায়। মনে হয়, কেমন যেন এই দুঃসময়েও নির্বিকার হয়ে আছে

বনভূমি। চোখের সামনেই এ রকম একটা মৃত্যু এগিয়ে আসছে অথচ বিন্দু-মাত্র চাঞ্চল্য নেই কারো। কি আসে যায়, বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ায় যেন কিছুই যায় আসে না কারো।

আবার চোখ ফিরিয়ে আনে হরিণের দিকে। মখমলের মতো গা। হাত বাড়িয়ে সেই মখমলের ওপর একটু বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করে ও। আলতো করে হরিণের গায় হাতটা পেতে ধরতেই টের পায়, চামড়ার ওপর যেন কুরকুর করে ঢেউ খেয়ে যাচ্ছে। এ কি যন্ত্রণার ঢেউ, না আর কিছু।

হাতটাকে সরাতে ইচ্ছে করে না। মৃদুভাবে গায়ের ওপর বোলাতে শুরু করে ঈশান। আর এমন সময় আবার ও চমকে ওঠে, আবার সেই বন কাঁপানো চিৎকার, জয় বনদেবী মাগো, জয় ব্যাঘ্রবাহিনী মা!

হাতটা সরিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে ফিরিঙ্গি দেউলের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে ও। কিন্তু জঙ্গলের আড়াল থেকে কিছুই চোখে পড়ে না। মাত্র শ' দুয়েক হাত তফাতে আসর জমিয়ে উল্লাসে মাতামাতি করছে ওরা। মাঝে মাঝে দীননাথদের গান ভেসে আসছিল কানে। যত না গান তার চে চেঁচামেচিই বেশি। কপিল ঠাকুর কেমন করে পুজো করল বনদেবীকে, দেখা হল না ঈশানের। দেখা হোক আর নাই হোক, মনে মনে বারবার প্রার্থনা রাখল ও বনদেবীর কাছে, হে বনদেবী মা, হরিণটাকে বাঁচিয়ে দাও মা। ও ভাল হয়ে গেলে কথা দিচ্ছি, আবার ওকে জঙ্গলের ভেতরেই ছেড়ে দেব। জঙ্গলের জীব, জঙ্গলেই ওকে মানায়।

কিন্তু পরমুহূর্তেই কেমন অদ্ভুত লাগে ওর। চৌধুরী রাজাদের এই দ্বীপ, এই জঙ্গল, একে উৎখাত করার জন্যই তো এই পুজোর আয়োজন। জঙ্গল যদি উৎখাতই হয়ে যবে, সোনামণি এই হরিণ কোথায় থাকবে তাহলে। কেমন করে বেঁচে থাকবে ও। হে বনদেবী মা, এ কেমন খেলা তোর!

চৌধুরী রাজাদের এই বনভূমি একদিন উৎখাত হয়ে চাষবাস শুরু হয়ে যাবে। তেমন দিনের কথা ভাবতেও কেমন অদ্ভুত লাগে ঈশানের। রাজাদের ঢালাও নির্দেশ দেওয়া আছে, যে যতটা জমি সাফ করবে, তাকে ততটাই দিয়ে দেওয়া হবে। যদি আরো বেশি চাও, তাও নিতে পার। তবে জমি নিয়ে ফেলে রাখা চলবে না, চাষবাস করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ঈশানেরও অধিকার থাকবে এখানকার জমির। কিন্তু কেমন অদ্ভুত লাগে 'অধিকার' শব্দটা। চাষবাস শুরু করতে হলে এখনো বছর দশেক এখানে লড়াই চালাতে হবে। সে কি কম কথা! গাছ না হয় কাটা হল, কিন্তু মাটির নিচে এর

লক্ষ লক্ষ শিকড়, সেগুলো ওঠানো কি সহজ কথা। তাছাড়া নুন মেশান এই মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে কবে মিঠে হবে, তবে না চাষ! ততদিনে কে থাকবে আর কে থাকবে না, তাই বা ঠিক কি।

হ্যাঁ, রজনীটা এখানেই পড়ে থাকবে। রজনী, মকবুল, দীননাথ, চৈতন্য… ওরা সবাই জমি সাফ করে ঘরবাড়ি বানাবার নেশায় পড়েছে। পড়ুক গে, ঈশানের কে আছে যে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবে ও। গৌরী ওকে যদি ভুল না বুঝত, গৌরীর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল ও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ঈশান। কি ভেবে ও এগোতে গিয়েছিল আর কিইবা হয়ে গেল শেষপর্যন্ত। কোথা থেকে লক্ষ্মণটা যে ধূমকেতুর মতো উদয় হয়ে আবার হারিয়ে গেল, ওকেও একেবারে পথে বসিয়ে গেল। এখন ও একা, সত্যি সত্যি একা।

আবার হরিণটার দিকে চোখ পাতে ঈশান। কড়ির মতো সাদা চোখ দুটো কেমন মিয়োন। গলাটা লম্বা হয়ে কাদার উপর এলিয়ে রয়েছে। মুখের কষ বেয়ে ফেনা বুজবুজ করছে। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে একটু একটু করে নডছে সেই ফেনা। যন্ত্রণায় যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। দেখা যায় না, এ দৃশ্য দেখা যায় না।

বনদেবী মাগো, তুমি তো সব জানো, সব দেখতে পাও, ওকে ভাল করে দাও মা। আমি না হয় তোমার নামে মুরগী এনে উড়িয়ে দেব এই জঙ্গলে, আমি আর কিই বা দিতে পারি, ওকে ভাল করে দাও মা।

হরিণের পা দুটো হঠাৎ ঝাঁক খেয়ে উঠল। চমকে উঠেছিল ঈশান। পরমুহূর্তেই আবার ঝুঁকে পড়ে ওর গায়ের ওপর হাত রাখল।

—এই, বল না, খুব কষ্ট হচ্ছে?

হরিণটা আবার নিস্পন্দ হয়ে যায়। কেমন যেন চোখের পাতাদুটো ওর বুজে আসতে থাকে। ঝুঁকে পড়ে ঈশান। ঘাড়ে গলায় একটু একটু করে হাত বুলিয়ে দেয়। গলার কাছে তিরতির করে কাঁপছে। যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে এখনো বেঁচে আছে ও। গলার কাছটা এখনো কেমন গরম।

একটা ওঝা বা কবরেজ জোগাড় করতে পারলে হত। কবরেজ অসম্ভব। ওঝা বলতে হাতের কাছেই কপিল ওঝা আছে, কিন্তু পুজোর পাট ফেলে রেখে ও কি আসতে চাইবে। হেসেই উড়িয়ে দেবে হয়তো। একটা সামান্য হরিণকে বাঁচাবার জন্য ওঝা ডাকতে এসেছে ঈশান, এ কথা শুনলেই হেসে উড়িয়ে দেবে সবাই। হৈ হৈ করে উঠবে রজনী। এমনিতেই রজনী ওকে ভাল চোখে

দেখে না, তার উপর হরিণের কথা শুনলে হা হা করে উঠবে।

হরিণের সারা গা আবার কেমন যেন থরথর করে কেঁপে উঠল।

—কি রে? কি? কি হল?

হরিণের মাথাটা কাদায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। আরো এক গাদা ফেনা উগরে ফেলল ও। চোখের পাতাদুটো আবার মেলে ধরেছে, কি যেন চাইছে?

—কি রে জল খাবি? জল?

হয়তো জলের জন্যই অমন ছটফট করে উঠেছে ও।

ঈশান উঠে দাঁড়ায়। সামনেই তিনকুমারীর জল বয়ে চলেছে। চন্দনের মতো ঘোলা। আঁজলা ভরে জল তুলে আনে ঈশান। কিন্তু মাথাটা যেমনভাবে ও কাদার ওপর পেতে রেখেছে, তাতে ওর মুখে জল ঢেলে দেওয়া অসম্ভব। তবু মুখের কাছে জল এনে ধীরে ধীরে ও গড়িয়ে দেয়।

কিন্তু জল খাওয়া তো দূরের কথা, হরিণের চোখের পাতাদুটো আবার বুজে আসে। মাছি ছেঁকে ধরছে ওর গায়ে। দু' হাত নেড়ে মাছি তাড়ায় ঈশান।

—তুই যদি মরে যাস সোনা, আমি আর কি নিয়ে বাঁচব বল, আমিও চলে যাব। যেদিকে দু' চোখ যাবে, সে দিকেই চলে যাব। কি হবে এই জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ করে! কি হবে আমার বাড়ি আর চাষের জমি নিয়ে। কার জন্য বাড়ি বাঁধব এখানে! কার জন্য মাঠে মাঠে চাষ করব! পিয়ালির সেই মুড়আলি যদি বেঁচে থাকে, ওর কাছেই চলে যাব। ওর কাছেই রাত জেগে দুঃখের কথা বলব একদিন।

—ধুস, কি সব কথা মাথায় এসে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে বল দেখি! কবেকার সে মুড়িআলি আজও কি সে বেঁচে আছে! আর যদি থাকেই, সে কি এত দিনে অথর্ব হয়ে যায়নি! সে কি আবার চিনতে পারবে আমাকে!

সেদিনকার সেই গৌরীই আমাকে চিনল না। মায়ের দয়া নিয়ে যখন এ ঘাটে এসে পৌছল সেদিনকার সেই রাত্রিটার কথা গৌরী ভুলে যেতে পারে, আমি ভুলি কি করে।

আজ না হয় লক্ষ্মণের শোকে ও পাগল, কিন্তু সে দিন কোথায় ছিল সেই লক্ষ্মণ! জগৎ সংসার আর মানুষ বড় অদ্ভুত জায়গা। কাকে দোষ দেই! চৌধুরীদের আবাদ করতে এসে কি কম দেখা হল।

—নাহ্ জলের জন্যই বোধ হয় ও অমন করছে। ঈশান দেখল, সমস্ত গা কেমন থরথর করে আবার কেঁপে উঠল হরিণটার। মাথাটা একটু ওপর দিকে ওঠাবার চেষ্টা করছে। চোখদুটো আবার কেমন বিস্ফারিত হয়ে উঠছে।

জলের জন্যই কি। আবার জল আনবার জন্য এগিয়ে গেল ঈশান। আঁজলা ভরে কতটুকুই বা জল তোলা যায়। একটা পাত্র পেলে সুবিধে হত। কিন্তু কোথায় পাত্র! আঁজলা ভরেই জল তুলে নিয়ে ও এগিয়ে আসে, এই খা! জল এনেছি খা।

জলটা ওর ঠোঁটে তুলে ধরল ঈশান। কিন্তু চোখদুটো অমন হয়ে আছে কেন! হরিণ মরে গেলে কি চোখের রঙ অমন হয়!

হাত থেকে জলটুকু গলে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়ে ঈশান। হরিণের জিভটা ততক্ষণে দাঁতের ফাঁক দিয়ে অল্প একটু বেরিয়ে পড়েছে। নিস্পন্দ হয়ে পড়েছে ওর গলার কাঁপুনিটা। ঈশান স্বজনশোকে আছড়ে পড়ল হরিণটার গায়। কান্না, সমুদ্রপ্রমাণ কান্নায় ও উথলে উঠল।

সূর্যটা কখন যে লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছিল বনের ডালে পাতায়, তা আর দেখা হল না ঈশানের। একপাল সাদা বক সূর্যের সেই লাল রঙ গায় মেখে পতপত করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।